বনফুল-রচনাসংগ্রহ

বনফুল

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কৈফিয়ৎ

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বনফুল একক ও অনন্য। হয়তো সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই তাই—তবু বনফুল সম্বন্ধে কথাটা যেন আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য। কল্পনার অভিনবত্বে, বিষয়বস্তুর মৌলিকতায় এবং আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে—সত্যিই তাঁর তুলনা মেলা শক্ত। তাঁর মত আঙ্গিক নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কেউ করেছেন কিনা—এবং সে পরীক্ষায় এমন সর্বতোভাবে গৌরবের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর রচনাসংগ্রহের এই নমুনা-খণ্ড প্রকাশকালে তাঁর ঐ অনন্যসাধারণ মনীষার সামান্য পরিচয় হিসেবেই প্রথম তিনটি বই আমরা বেছে নিয়েছি—রাত্রি, অগ্নি ও মৃগয়া। এতে তাঁর শক্তির সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণ একটি খণ্ডে এর চেয়ে বেশী সংখ্যক বই দেওয়াও—প্রধানত সম্ভাব্য মূল্যের কথা চিন্তা করেই—প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এ বিষয়ে পাঠকসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। ইতি—

প্রকাশক

সূচী

রাত্রি

উৎসর্গ

সাহিত্য-প্রাণ কবি সমালোচক

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

রাত্রির কথা লিখতে বসেছি।

এখন কিন্তু বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহর, রোদের তাতে প্রকৃতি পুড়ে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে, সকাল থেকে ক্রমাগত আত্মসম্বরণ ক'রে ক'রে প্রকৃতি যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আর পারছে না, অন্তরের পুঞ্জীভূত উত্তাপ চতুর্দিক চৌচির ক'রে দিয়ে এইবার ফেটে বেরোয় বুঝি। নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ নিষ্ঠুর উত্তাপ। একটা তৃষ্ণার্ত কাক অশ্বত্থগাছের ডালে হাঁ ক'রে ব'সে আছে, গলার কাছটা কাঁপছে তার। বুড়ো অশ্বত্থগাছটার সর্বাঙ্গে কচি পাতার সমারোহ, নীরবে একটা সবুজ অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে যেন। ঠাকুরবাড়ির গেটটার পাশে সারি সারি গোটা-তিনেক কলসী নিয়ে কইলু ব'সে আছে—ফতুয়া-পরা ন্যাড়া-মাথা কইলু, কলসী থেকে জল নিয়ে তৃষ্ণার্ত পথিকদের বিনামূল্যে দান করছে দৈনিক চার আনা মজুরির পরিবর্তে। কার পুণ্য হচ্ছে, কে জানে! অদূরে বুড়ো মুচীটাও ব'সে আছে আশেপাশে নানাজাতীয় ছিন্ন পাদুকা ও পাদুকা-সংস্কারের সরঞ্জাম নিয়ে। বুড়োর লক্ষ্য পথিকদের পায়ের ওপর, মাঝে মাঝে নিজের দিকে কারও কারও দৃষ্টিও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে সে—'জুতিঠো হুজুর।' কেউ তার কথায় কর্ণপাত করছে না; এই রোদে দাঁড়িয়ে জুতো সারাবে কে! বুড়ো কিন্তু নিরস্ত হচ্ছে না, সুযোগ পেলেই অনুরোধ করছে। তার মানসপটে মুখে বসন্তর-দাগ জাঁদরেল মুচিনীটার মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে বোধ হয়, বিকেলে সে আসবে, পাই-পয়সার হিসেব নেবে এবং উপার্জন কম হ'লে কারণে অকারণে রণ-রঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করবে। আর্তনাদ করতে করতে একটা মোটর ছুটে চ'লে গেল, ধুলো উড়ল। তার পেছনে একটা জীর্ণ টমটম, ঘোড়াটা জীর্ণতর, চারজন মোটা লোককে আর যেন বেচারা টানতে পারছে না, গাড়োয়ান ঘন ঘন চাবুক চালাচ্ছে। ঘন ঘন হর্ন দিতে দিতে আর একটা মোটর বেরিয়ে গেল, আবার একরাশ ধুলো উড়ল। 'ঠাণ্ডা মালাই-বরো-ফ'—ভীষণদর্শন একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে, তার পেছনে একজন কুলী, তার মাথায় লাল শালু দিয়ে মোড়া মালাই-বরফের হাঁড়ি। পিচের রাস্তা গরম হয়ে নরম হয়ে এসেছে।

কুলীটার পায়ের চামড়া শক্ত, ফাটা-ফাটা, হয়তো গরম লাগছে না। ঠাণ্ডা মালাই-বরফ ব'য়ে বেড়াবার জন্যে ক'পয়সা পাবে ও, কে জানে! অশ্বত্থগাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ব'সে রাত্রির কথা লিখছি, মনে ক'রে ক'রে ভেবে ভেবে লিখছি। এই দারুণ দ্বিপ্রহরের পটভূমিকায় নিবিড় রাত্রির স্মৃতি অস্পষ্ট, রহস্যময়।

খট-খট-খট-খট-খট-খট।

মদগর্বিত পদবিক্ষেপে একদল পুলিস-বাহিনী রাস্তা প্রকম্পিত ক'রে চ'লে গেল। ওদের খাকী সাজ আর লাল পাগড়ি আশ্চর্য রকম মানিয়েছে উদ্ধত দ্বিপ্রহরের নিদারুণ এই···

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অশ্বত্থগাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে। ওই পুলিস-বাহিনীর একটি পুলিসকে চিনতে পেরে আমারও হাসি পাচ্ছে। কালই আভূমি নত হয়ে ও সেলাম করছিল ট্যাঁস-ফিরিঙ্গী এক গার্ড-সাহেবকে আকবরনগর স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে, আমি দেখেছিলাম। খট-খট-খট-খট-খট-খট—মদগর্বিত পদধ্বনি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। বুড়ো মুচীটা সভয়ে চেয়ে রইল, জলসত্র-পরিচালক কইলু একজন তৃষ্ণার্ত পথিকের আঁজলায় জল ঢালতে ঢালতে অন্যমনস্ক হয়ে মাটিতেই ঢেলে দিলে খানিকটা জল।

এই বিক্ষেপ-বিক্ষোভ-উত্তাপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে ব'সেই লিখতে হচ্ছে রাত্রির কথা। তিমিরময়ী নক্ষত্রখচিত রাত্রি। নক্ষত্র অগণিত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদও উঠেছিল মধ্যরাত্রে। ঝড়ও উঠেছিল। আমি সবটা দেখি নি, দেখলেও হয়তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। না, আমি সবটা দেখি নি, দেখতে পারি নি; অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জেগে উঠলাম, দেখলাম, প্রভাত হয়েছে।

২

জীবনের যে অনিবার্য ঘটনাগুলিকে অপছন্দ করি আমি, আশ্চর্যের বিষয়, সেই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিরই সহায়তায় তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেদিন। সেদিন কি বার ছিল, কি মাস ছিল, কি তিথি ছিল, কিছুই মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। শুধু মনে আছে, দগদগে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের ডোরা-কাটা শতরঞ্চিটা প্ল্যাট্‌ফর্মে পেতে তার ওপর বেকুবের মত

বসেছিলাম আমি। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অস্বস্তি আরও প্রবল হয়ে উঠল, যখন একজন কুলী এসে মাথার ওপর একটা আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। অস্পষ্ট আর কিছু রইল না। শতরঞ্জি শতকণ্ঠে আত্মপ্রচার করতে লাগল, আমার প্রকাণ্ড কালো তোরঙ্গটার ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আমার নামটা অগোচর রইল না আর কারও।

স্ত্রীবিহীন পুরুষকে চাকরের ওপর নির্ভর করতে হয়—সে-ই সখী, সচিব, গৃহিণী সব—বিশেষত আমার মত কাছাখোলা লোককে, যার নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাওয়ার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। সেই চাকর যদি আবার আমার গোকুলচন্দ্রের মত যুগপৎ রসবোধলেশহীন, কর্মঠ, বিশ্বাসী এবং স্নেহশীল হয়, তা হ'লে এই রঙচঙে শতরঞ্জির ওপর বেকুবের মত বসে অস্বস্তি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ট্রেন ছাড়বার মিনিট-দশেক আগে হন্তদন্ত গোকুল এই শতরঞ্জিটা কিনে স্টেশনে দিয়ে গেল আমাকে, সকাতরে অনুরোধ ক'রে গেল, বিছানাটা যেন না খুলি, এই শতরঞ্জিটা পেতেই যেন চালিয়ে দিই ভ্রমণকালীন শোয়া-বসাটা। গোকুল জানে, বিছানায় টুকিটাকি নানা রকম জিনিস আছে, খুললেই একটা না একটা হারিয়ে যাবে। গোকুলকে অমান্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু ভগবান গোকুলকে আর একটু যদি—রসিক নয়, কম বেরসিক ক'রে সৃষ্টি করতেন, কি ক্ষতি হ'ত তাতে তাঁর? আশ্চর্য কাণ্ড, পয়সা দিয়ে শতরঞ্জিবেশী এই প্রলাপটা কিনে নিয়ে এসেছে ও সজ্ঞানে, স্বচ্ছন্দে! কিছুদিন পূর্বে এই বেখাপ্পা রকম বড় কালো রঙের তোরঙ্গটাও এই গোকুলই কিনেছিল, সাদা রঙ দিয়ে নাম গোকুলই লিখিয়েছে। শুধু তোরঙ্গে নয়, আমার সমস্ত জিনিসে—বাসন-কোসন জামা-কাপড়, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, গেঞ্জি, লুঙ্গি, সমস্ত জিনিসে আমার নাম লেখা এবং সমস্তই আমার হিতৈষী গোকুলের কীর্তি। গোকুল আমাকে নিয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত। আমি যেন সমস্ত জিনিস হারিয়ে ফেলতে উদ্যত, নাম-টাম লিখে গোকুল কোনক্রমে সামলে-সুমলে রেখেছে সব যেন।

ওয়েটিং-রুমের পাশে অন্ধকার এক কোণে রঙিন শতরঞ্জিটার ওপর চুপ করে চোখ বুজে পড়ে ছিলাম আমার আষ্টেপৃষ্ঠে মজবুত ক'রে বাঁধা বিছানার বাণ্ডিলটায় হেলান দিয়ে। অদূরে একটা এঞ্জিন শব্দ করছিল—শ্ শ্ শ্ শ্। চোখ বুজে শুয়ে একটা গল্পের প্লট ভাবছিলাম। একটু নমুনা দিই।—

…চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকার। অরণ্যসমাকুল উপত্যকার সমস্ত সৌন্দর্য

অমাবস্যার অন্ধকারে অবলুপ্তপ্রায়। নির্মেঘ আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছায়াপথ প্রসারিত। সুবিশাল বৃশ্চিকরাশি বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্নের মত চিরন্তন প্রশ্নের রহস্য লইয়া অন্ধকার শূন্যে জ্বলিতেছে। দূরসন্নিবদ্ধ দেবদারুশীর্ষে অনুরাধা, তাহার ঈষৎ নিম্নে জ্যেষ্ঠা, এবং শূলপাণি-পর্বতের অগ্রভাগে মূলা নক্ষত্র দেদীপ্যমান। নক্ষত্রের মৃদু আলোকে অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ, ঘনসন্নিবদ্ধ বনশ্রেণী পর্বতগাত্রে পুঞ্জীভূত মেঘবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। শূলপাণি ও পার্বতীর মধ্যস্থিত বনসমাচ্ছন্ন এই উপত্যকায় বৌদ্ধ কাপালিক রক্তভিক্ষু সঙ্গোপনে বাস করেন। উপত্যকা শ্বাপদসঙ্কুল, গভীর নিবিড় রাত্রেও নীরব নহে। নিকটে দূরে বন্য পশুর সাবধান-সঞ্চরণ-শব্দ, অজগর-নিষ্পিষ্ট অসহায় পশুর অবরুদ্ধ আর্তনাদের মত একটা প্রচ্ছন্ন ধ্বনি, জটিল শাখা-প্রশাখাময় বৃক্ষশীর্ষে নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন···

ঘর্ঘর ক'রে একটা শব্দ হ'ল, চোখ খুলে দেখলাম, ঠিক মাথার ওপরে যে বাতিটা টাঙানো ছিল, একটা কুলী হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা নাবাচ্ছে। একটু পরেই আলো জ্ব'লে উঠল এবং আমাকে কেন্দ্র ক'রে গোকুলের কীর্তি সকলের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল। রঙিন শতরঞ্জি, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উঠে বসলাম, এবং টাইম-টেবলটা নিয়ে আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতাটার ওপর অকারণে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। ওতেই নিমগ্ন হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং—স্টেশনের ভেতর ঘণ্টা বাজল। কে একজন আপ-ডাউন ভাষায় আর এক স্টেশনের সঙ্গে কথা হইতে লাগলেন। কথা শেষ হয়ে গেল। এঞ্জিনের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেন জানি না, আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতা থেকে চোখ তুলে হঠাৎ আমি ডান দিকে ফিরে চাইলাম, মনে হ'ল, কে যেন আমায় ঘাড় ধ'রে ফিরিয়ে দিলে। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না, তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজার ফাঁক দিয়ে কালো কুচকুচে একজোড়া চোখ আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে। আর কিছু নয়, কেবল একজোড়া চোখ।

রাত্রি।

আমার রঙিন শতরঞ্জি এবং নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে লজ্জিত হয়ে ওঠবার পূর্বেই, বেশ মনে পড়ছে, বংশী এসে ঢুকল ওয়েটিং-রুমে এক ঠোঙা খাবার এবং এক কুঁজো জল নিয়ে। তারপর কয়েক

মিনিট কি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। এইটুকু শুধু মনে আছে, এঞ্জিনের সোঁ-সোঁ শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল, এবং আমি সহসা আবার প্রাণপণে সেই অন্ধকার উপত্যকায় নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধুনন অনুসরণ ক'রে সেই বৌদ্ধ কাপালিকের অলৌকিক কাহিনীটা গ'ড়ে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম।

আপনিই কি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার ?

প্রশ্ন করলে বংশী, কিন্তু ঈষদুন্মুক্ত দরজার অন্তরালে শাড়ির টকটকে লাল পাড়ের ঝলক চোখে পড়ল। বুঝলাম, বংশী প্রশ্নকারক নয়, প্রশ্নবাহক।

কি রকম যেন বেকায়দায় প'ড়ে গেলাম।

'ঘনশ্যাম' নামটা এ যুগের সভ্য-সমাজে অচল, যে রগরগে শতরঞ্চিটার ওপর ব'সে আছি সেটা অচল, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা অচল, এবং সর্বাপেক্ষা অচল আমার ব্রণ-লাঞ্ছিত-মুখ-সর্বস্ব এই রোগা লম্বা চেহারাটা। বাইরের এই জিনিসগুলোর সঙ্গে আমার অন্তর্লোকের সুন্দর সাহিত্য-সাধনাকে বিজড়িত করতে বরাবরই আমি একটু সঙ্কুচিত হই। তবু সম্ভবত 'বিখ্যাত' শব্দটার মোহে অভিভূত হয়ে বংশীকে সত্য কথাই বললাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপনি ডাক্তারি করতে করতে কি ক'রে লেখেন এত ?

বুঝলাম, এ প্রশ্নটি বংশীর মস্তিষ্ক থেকে স্বতঃ উৎসারিত হ'ল। একটু মুচকি হাসলাম। আমার মুচকি হাসির অন্তরালে কি পরিমাণ উষ্মা নিহিত ছিল, তা দেখতে পেলে বংশী একটু বিব্রত হ'ত। অনেকেই এ প্রশ্ন করে। কিন্তু কি মূর্খের মত প্রশ্ন! এ যেন অনেকটা 'আপনি ডাক্তারি করতে করতে নিশ্বাস নেন কি করে'-জাতীয় প্রশ্ন। অনেকেই দেখেছি আলাপ শুরু করেন প্রশ্ন দিয়ে। দু-চারটে সাধারণ প্রশ্নের পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রকম ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন বর্ষিত হতে থাকে। 'মাসে কত টাকা উপায় করেন'—এ প্রশ্ন তো অনেকের মুখেই শুনেছি। 'প্র্যাক্টিস কেমন হচ্ছে', 'লেখা থেকে দু-পয়সা হচ্ছে কি না'—এত বার এত লোকের কাছে শুনেছি যে, গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এক জাতীয় সাহিত্যিক প্রষ্টা আছেন, তাঁদের প্রশ্নগুলো বেশ জটিল ধরনের। 'ছোটগল্প কি ক'রে লিখতে হয়', 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তফাৎ কোথায়' 'সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর কবি কি না', 'বাংলা সাহিত্যে কোন্ কবি ব্রাউনিঙের মত', 'জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবিই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কি না'—দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়।

বংশী শতরঞ্চিতে উপবেশন ক'রে তৃতীয় প্রশ্নটা করলে এবং আত্মপ্রকাশ করলে।

আচ্ছা, আজকাল চারিদিকে 'ফ্রয়েড ফ্রয়েড' খুব শুনি, লোকটা কে বলুন তো ?

আমি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলাম, ডিটেক্‌টিভ।

শিস দেবার ভঙ্গীতে মুখটা কুঁচকে বিস্মিত বংশী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারলে না, ভেতর থেকে ডাক এল।

বংশীদা, শুনুন।

মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে—যেন আকাশের ওপার থেকে—কথাগুলো ভেসে এল। রাত্রির সম্পর্কে বরাবরই, এমন কি শেষ পর্যন্ত, আমার এই দূরত্ববোধক অনুভূতিটা ঘোচে নি।

উঠে চ'লে গেল বংশী।

আমি ব'সে রইলাম চুপ ক'রে। এঞ্জিনের সোঁ-সোঁ শব্দটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিছু একটা করবার জন্যেই সম্ভবত স্টেশনের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। ঘড়ি চলছে না। সংস্কৃত ভাষায় গল্পের যে প্লটটা ভাবছিলাম, সেটাই আবার ভাববার চেষ্টা করলাম। চোখ বুজে আবার ঠেস দিয়ে শুলাম বিছানার বাণ্ডিলটায়। শূলপাণি এবং পার্বতী পর্বতের মধ্যস্থিত উপত্যকার সে ছবিটা আর কিন্তু মনের মধ্যে তেমন ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠল না। বংশী মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল, আর সেই কালো কুচকুচে চোখ দুটো, সেই লাল পাড়ের ঝলকানি। তখন ভাবি নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওই শ্বাপদসঙ্কুল অন্ধকার উপত্যকার সঙ্গে কালো কুচকুচে চোখ দুটো, লাল পাড়ের ঝলকানি আর বংশীর অতি নিবিড় যোগ ছিল। না থাকলে ঠিক সেই সময় রক্তভিক্ষু নামে একটি কাপালিকের কথা আমার মনে হবে কেন ? সেই অন্ধকার উপত্যকায় শূলপাণি-পর্বতের গুহায় রক্তভিক্ষু নামে যে বৌদ্ধ কাপালিককে আমি ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করেছিলাম, সে যদিও আর কোনদিন আমার লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করবে না, সে যদিও হারিয়ে গেল, তবু কিন্তু ঠিক সেই সময় সে আমার কল্পনাতেই বা মূর্ত হয়েছিল কেন, যদি না—

স্বর্ণেন্দু ব'লে কাউকে চেনেন আপনি ?

চোখ খুলে উঠে বসলাম।

বংশী আবার এসেছে।

স্বর্ণেন্দু ?

হ্যাঁ, স্বর্ণেন্দু রায়, স্কটিশে আপনার সঙ্গে—

আর বলতে হ'ল না, যবনিকা উঠে গেল, চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বর্ণেন্দুর মুখখানা। কালো রোগা লাজুক স্বর্ণেন্দু। 'সোনার চাঁদ' ব'লে রাগাতাম তাকে আমরা।

খুব চিনি। কেউ হয় নাকি স্বর্ণেন্দু আপনার ?

আমার পিসতুতো দাদা।

ও

সোনাদা এসে পড়বেন এখুনি দিল্লী এক্সপ্রেসে। আমরা সবাই মধুপুর যাচ্ছি।

বেড়াতে ?

না, চেঞ্জে। পিসেমশায়ের অসুখ।

কি হয়েছে ?

ডাক্তারী কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলাম না।

পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাতের শ্লীল অশ্লীল নানা রকম কারণ মাথার মধ্যে ভিড় ক'রে এল। আশ্চর্য আমাদের মন !

কতদিন থেকে ?

এক বছর হবে। কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না একেবারে।

কোথায় রয়েছেন তিনি, ওয়েটিং-রুমে ?

হ্যাঁ, আসুন না, দেখবেন ?

খুব সম্ভবত একজন লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যেই, (ইংরেজীতে যাকে বলে 'কাঁধ-ঘষাঘষি') বংশী আমাকে ভেতরে যেতে বললে।

না থাক্, হয়তো ঘুমুচ্ছেন এখন।

ঘুমুবেন কি, ঘুমই হয় না তাঁর, দিনরাত জেগে আছেন।

অচেতন নয়, সচেতন মনেরই প্রত্যক্ষলোকে কালো কুচকুচে চোখ দুটো নির্নিমেষে চেয়েছিল ! আকর্ষণ করছিল, বিকর্ষণও করছিল। স্বর্ণেন্দুর কে হয় ও ?...হয়তো দু মিনিট কেটেছিল, হয়তো দু' ঘণ্টা, ঘড়ির দিক থেকে ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন। এইকুটু শুধু মনে আছে, অনেকক্ষণ

লেগেছিল কুণ্ঠাটা কাটতে—বেশ কিছুক্ষণ। চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। চোখের দৃষ্টিতে সাজপোশাকবর্জিত আসল মানুষটিকে চেনা যায়—মনের গহনলোকে সঙ্গোপনে যে মানুষটি বাস করে তাকে, সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত আসল সত্তাটিকে। সাজে পোশাকে আলাপে ব্যবহারে সভ্য-জগতের সব মানুষই প্রায় এক ছাঁদের। চোখের দৃষ্টিই মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে এখনও। চোখের দৃষ্টিই মুখশ্রীর প্রাণ। অদ্ভুত ওই কালো চোখ দুটি! বিশিষ্ট! হয়তো ওর সঙ্গে জীবনে কখনও পরিচয় ঘটত না। আমার বর্ণবহুল শতরঞ্চি, ডাক্তার ঘনশ্যাম রায় নাম-লেখা তোরঙ্গ, ডাক্তারি-সাহিত্যিকতার আপাত-অদ্ভুতত্ব নিয়ে আলোচনা—অর্থাৎ যে জিনিসগুলো আমি অপছন্দ করি, সেই জিনিসগুলিরই আকস্মিক সমন্বয় না ঘটলে সেদিন, কিংবা কোনদিনই হয়তো, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটত না আমার। তার কথাগুলো—প্রায় বছর দুয়েক আগে শোনা কথাগুলো, মনে পড়ছে আমার।

আপনার ওই শতরঞ্চিটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল আমার, তারপর দেখলাম নাম-লেখা তোরঙ্গটা। নামটা দেখেই মনে পড়ল, দাদার এই নামেরই তো একজন ডাক্তার লেখক বন্ধু আছেন। বংশীদাকে বললাম—

আশ্চর্য রকম ছোকরা এই বংশী, অর্থাৎ আশ্চর্য রকম লোক-ঠকানো চেহারা ওর। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, চালাক-চতুর বেশ। চেহারাতে এমন একটা লালিত্য আছে অর্থাৎ সেই ধরনের লালিত্য আছে, যা আজকালকার মেয়েদের পছন্দ। বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক নয়, বেশ রোগা-রোগা, পাঞ্জাবি-পরলে-বেশ-মানায়-গোছ চেহারা। মুখে যে হাসিটা সর্বদাই চিকমিক করছে, আপাতদৃষ্টিতে হঠাৎ সেটা বুদ্ধির দীপ্তি ব'লে ভুল হবার সম্ভাবনা। প্রতি কথাতেই সমঝদার-মার্কা হাসি। সেই হাসির অন্তঃসারশূন্যতা কিন্তু নিমেষে বোঝা যায় চোখ দুটোর পানে চাইলে। সর্বদা চঞ্চল চোখ দুটোর দৃষ্টি ছটফট করছে—যেন নিজেকে ঢাকবার জন্যে, ধরা পড়ার ভয়ে, কিন্তু পারছে না। নির্বোধ, ভীরু, লোলুপ, চঞ্চল দৃষ্টি।

আসুন না, দেখবেন?

আবার অনুরোধ করলে বংশী।

চলুন।

৩

আলোটা উসকে দাও, ঘনশ্যামবাবু এসেছেন।

আলোটা উজ্জ্বলতর হতেই অনিবার্যভাবে তাকেই প্রথমে দেখলাম, যদিও সে কোণের দিকে ব'সে ছিল। আলোটা উসকে দিলে চাকরটা।

বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না। অক্ষমতা নয়। রঙচঙে কথার আতসবাজি ছুটিয়ে, শব্দের ঝঙ্কারে সকলকে দিশাহারা ক'রে দিয়ে পরিশেষে 'অবর্ণনীয়া' ব'লে অক্ষমতা জ্ঞাপন করবার কৌশল আমার খুব আয়ত্ত আছে। এ ক্ষেত্রে সে কৌশল প্রয়োগ করতে বিরত হলাম, কারণ আমি কিছুই অতিরঞ্জিত করতে চাই না। ঔপন্যাসিকী কায়দায় বর্ণনা করতে বসলে অতিরঞ্জন অবশ্যম্ভাবী। অতি সংক্ষেপে কেবল কিছু বলছি, যদিও তাও, খুব সম্ভব, 'অতি' না হ'লেও ঈষৎ-রঞ্জিত হয়ে যাবেই।

ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, কালো রঙ। এমন কালো সাধারণত দেখা যায় না। মিশ কালো, কুচকুচে কালো প্রভৃতি কালো-রঙ-প্রকাশক বিশেষণগুলি দিয়ে এ কালো রঙের বর্ণনা করা যাবে না। কারণ তার রঙে শুধু কালিমা নয়, কোমলতাও ছিল—মখমলের মত অদ্ভুত একটা কোমলতা। অতি পেলব, অতি মৃদু, অতি আশ্চর্য একটা শ্রী ওই কালো রঙের নিবিড়তায় আবিষ্ট হয়ে স্বপ্ন দেখছিল যেন। কুচকুচে কালো চোখ দুটো আরও অদ্ভুত—চঞ্চল নয়, নিষ্পলক। যখন যতটুকু দেখে, নির্নিমেষে দেখে, যার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে বিদ্ধ করছে তত মনে হয় না, যত মনে হয় নিঃশেষ করছে—মনে হয়, তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব যেন দেখতে পাচ্ছে ও। প্রথমেই তাকে দেখে আমার এত কথা মনে হয় নি, এই বর্ণনাটুকু আমি আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্কলন ক'রে দিলাম। প্রথমেই তাকে দেখে আমার মনে যে ধারণা হয়েছিল, প্রথম দৃষ্টিতেই সে রকম ধারণা করতে পারে কেবল বাঙালী-সন্তান। যদিও সে একটিও কথা বলে নি, তবু সহসা আমার মনে হ'ল, মেয়েটা জ্যাঠা, ইংরেজীতে যাকে বলে 'প্রিকোশাস'। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, তাকে বয়সের আন্দাজে বেশি বুদ্ধিমতী ব'লে মনে হয়েছিল। বয়সের আন্দাজে! তার বয়স কত—সে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম কি? আঠারো কি আটাশ—সে প্রশ্নই তো মনে জাগে নি তখন। কার জাগে? অনেকদিন পরে বংশী যখন নিমোনিয়ার ঘোরে প্রলাপ বকছিল—"তোমার বয়স কত তা আমি জানতে চাই না, তোমার

সম্বন্ধেও সব কিছু জানতে চাই না আমি”—মনে পড়ছে, এই প্রলাপের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল। বংশীর প্রলাপের চিকিৎসা অবশ্য করেছিলাম ডাক্তার আমি, কিন্তু কবি আমি সায় দিয়েছিলাম ওই প্রলাপের সঙ্গে। পুরুষের মনকে যে নারী প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তার নারীত্বের বেশি আর কিছু জানবার আগ্রহ থাকে না মনের। তার বয়স কত, তার ওজন কত—নিরতিশয় অবান্তর প্রসঙ্গ এসব ; অনভিভূত মনের বস্তুতান্ত্রিক কৌতূহল। প্রথম দর্শনেই তাকে জ্যাঠা ব'লে কেন মনে হয়েছিল, তার সঙ্গত কারণ অবশ্য একটা ছিল। চলচ্চিত্রে যেমন একটা ছবিকে অবলুপ্ত ক'রে মুহূর্তের মধ্যে আর একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাকে দেখে তেমনই তার নিষ্পলক চাহনিতে প্রথমে বিস্ময়, তারপর বিদ্রূপ ফুটে উঠেছিল। সেই নির্নিমেষ নীরব চাহনিকে ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এই রকম শোনাবে—'তুমিও এলে ! অসুস্থ বাবাকে দেখতে এসেছ ?' —একটু হাসি, তারপর—'তোমাদের সব্বাইকে ভাল ক'রে চিনি আমি'।

যথাসম্ভব আত্মসম্বরণসহকারে ঈষৎক্ষুণ্ণ আত্মসম্মানটাকে অনাবশ্যক রকম বর্মাবৃত ক'রে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বংশীকে বললাম, কই, স্বর্ণেন্দুর বাবা কোথায় ? আমি তো কিছুই শুনি নি ! এই অনুযোগটার মধ্যে যে কৃত্রিমতা ছিল, তা আমারও কানে বাজল। বংশী আলোটা এগিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম স্বর্ণেন্দুর বাবাকে। মেঝেতে বিছানা পাতা, তারই ওপর শুয়ে রয়েছেন তিনি, গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা, মুখটুকু খোলা আছে শুধু। মুখের আধখানা মরা, আধখানা জীবন্ত। মরা অংশটা ভাবলেশহীন, চোখের পাতাটা যেন শ্রান্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে জল, ঠোঁটের কোণটা নেমে এসেছে, সমস্তটা মিলে কেমন যেন একটা আত্মসমর্পণের ভাব। বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞানুযায়ী যদিও তা মরা নয়, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তা মৃত্যুর বাড়া ; বেঁচে আছে, কিন্তু জীবনের বিকাশ নেই। জীবন্ত অংশটা কিন্তু অতিরিক্ত রকম জীবন্ত। চোখের দৃষ্টি প্রখর, অধর-প্রান্তে উদ্ধত অবজ্ঞা, রগের ওপর কুটিল গোটা-দুই শিরা স্পন্দিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত।

অভ্যাসমত নাড়ীটা টিপে দেখলাম। ব্লাড-প্রেসার খুব বেশি ব'লে মনে হ'ল না। হার্টের খবর নেবার জন্যে সংস্কার-অনুযায়ী স্টেথোস্‌কোপের অভাব অনুভব করলাম। রগের শিরাগুলো দপদপ করছে কেন ? বৈজ্ঞানিকভাবে ভাববার চেষ্টা করলাম একটু। রোগের ইতিহাস, রক্ত-পরীক্ষা—ডাক্তারী চিন্তা-পরম্পরাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে জীবন্ত চোখের দৃষ্টিটা যেন চিৎকার ক'রে উঠল, চোপ রও ! জীবন্ত অধরপ্রান্ত উদ্ধত অবজ্ঞায় ব্যঙ্গ করতে লাগল। মরা

চোখটা, দেখলাম, মিনতি করছে ; অবনমিত মৃত অধর নীরবে বলছে, ক্ষমা করুন। অদ্ভুত ঐক্যতান !

ঠিক এর পর আমি কি করেছিলাম, কি বলেছিলাম, এর পরও কি ক'রে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে ওয়েটিং-রূমের ঈজিচেয়ারে ব'সে চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে তার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা সম্ভবপর হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। অস্পষ্টভাবে এইটুকু শুধু মনে আছে, ভদ্রতার হাসিটুকু মুখে ফুটিয়ে রেখে নমস্কার ক'রে আমি উঠে যাচ্ছিলাম—হ্যাঁ, সম্ভবত উঠে বাইরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঠিক যে কি কারণে আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম—হয়তো অকারণেই, হয়তো কাপড়টা আটকে গিয়েছিল চেয়ারটার হাতলে, ঠিক মনে নেই এখন। কিন্তু ফিরে তাকালাম ব'লেই ব্যাপারটা ঘটতে পারল। ঠিক পর পর ঘটনাগুলো মনে নেই। যে ছবিটা এই সূত্রে মনের মধ্যে ফুটে উঠছে, সেটা এই—বংশী শশব্যস্ত হয়ে বার্নারটা ভাল ক'রে গরম হবার আগেই জোরে জোরে কয়েকবার পাম্প ক'রে স্টোভে তেল উঠিয়ে ফেলেছিল, জ্বলন্ত কেরোসিন তেলের হলদে আলোয় সহসা তার চরিত্রের একটা দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে, অন্তত আমার তাই মনে হ'ল। তেল উঠিয়ে ফেলে বংশী শশব্যস্ত হয়ে উঠল, সে কিন্তু এতটুকু বিচলিত হ'ল না, কেবল ওষ্ঠের চাপে অধর যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল, চোখের কোণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-করুণাদীপ্ত এক ঝলক দৃষ্টি যেন মূর্ত হয়েই অবলুপ্ত হয়ে গেল, আর কিছু নয়। তারপর—ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই আমার—ছোট্ট দুটি কথা, সর তুমি। বংশী স'রে গেল, সে বসল গিয়ে স্টোভের কাছে। একটু পরেই স্টোভ-সাইলেন্সারের শতছিদ্রপথে মূর্ত হয়ে উঠল আগুনের নীল-কমল, রূপান্তরিত কেরোসিন-শিখা। আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

এর পরেই যে ঘটনাটা মনে আছে, সেটা মর্মান্তিক ব'লেই মনে আছে, এবং সেটা ঘটেছিল দ্বিতীয় পেয়ালা চা খেতে খেতে। এতবড় মর্মান্তিক আঘাত এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাব—অর্থাৎ ঈশপের একচক্ষু হরিণের দুর্দশা যে আমার কপালেও লেখা ছিল, তা কল্পনা করি নি। চায়ের পেয়ালাটা ছোট ছিল, অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে গেল।

আর একটু নেবেন ?

দিন।

প্রথম-পেয়ালা-পর্বের হালকা কথাবার্তায় আড়ষ্টতাটা ক'মে এসেছিল নিশ্চয়ই, যদিও প্রথম-পেয়ালা-পর্বের সে হালকা কথাবার্তাগুলো যে কি ছিল, তা মনে

নেই। খুব সম্ভবত পক্ষাঘাত বিষয়েই দু-চারটে টুকরো আলোচনা, স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে দু-একটা কথা, বংশী অবনীশের উল্লেখ ক'রে বংশী-সুলভ রসিকতার চেষ্টাও করেছিল যেন—অর্থাৎ সেই সব আলোচনা, যার কোন উদ্দেশ্য নেই, মাথা-মুণ্ড নেই, অর্থও সব সময়ে নেই, যার একমাত্র সার্থকতা অপরিচয়ের অথবা অতি-পবিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য আড়ষ্টতাকে সুলঙ্ঘ্য ক'রে তোলা।

দ্বিতীয় বার আমার পেয়ালাটায় চা ঢালতে ঢালতে, চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বললে, আপনি বিদেশী বই অনেক পড়েছেন, নয়?

কিছু কিছু পড়েছি।

আপনার লেখা পড়লে সেটা বোঝা যায়।

এটা নিন্দা, না, প্রশংসা—সেটা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্বেই চিনি মেশাতে মেশাতে এবং পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মৃদুকণ্ঠে সে আবার বললে, একটা জিনিস বুঝতে পারি না আমি, স্বীকার করেন না কেন আপনারা?

কি?

ইব্‌সেনের পিয়র গিন্‌ট থেকে আপনি আপনার নাটকে হুবহু খানিকটা নিয়েছেন, কীট্‌সের একটা বিখ্যাত কবিতার সঙ্গেও আপনার একটা কবিতার আশ্চর্য রকম মিল আছে, কিন্তু আপনি ঋণ স্বীকার করেন নি কোথাও। আজকালকার অনেক লেখকই করেন না; আমি ঠিক বুঝতে পারি না, এতবড় শক্তিশালী লেখকদের এ সামান্য দুর্বলতা কেন?

আমার মুখের পানে নির্নিমেষ নয়নে ক্ষণকাল চেয়ে রইল। বংশী বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক; কিন্তু 'গ্রেট মেন' পর্যন্ত ব'লেই সে হেসে ফেললে এবং চলকে-পড়া চায়ের প্রবাহে 'থিঙ্ক অ্যালাইক'টা ভেসে গেল।

গুলি খেয়ে একচক্ষু হরিণটা মারা গিয়েছিল।

আমারও মৃত্যু হ'ল।

নির্বাক হয়ে রইলাম আমি।

আপনার লেখা কিন্তু খুব ভাল লাগে আমার।

মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে ফোনে যেন সে কথা বলছে। ভাল লাগে! নিহত হরিণটার মাংসও নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল সেই শিকারীর।

হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম।

শুনলাম, আমি বলছি, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে, বুঝলেন কিনা, অনেক জিনিস—

ও, তাই নাকি ?

ঠিক এর পরের মুহূর্তেই আমার সমস্ত সত্তা আমার দৃষ্টিপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তার আনমিত মুখের দক্ষিণ অংশটুকুতে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল মখমল-কোমল কালো রঙের নিবিড় অন্ধকারে। কয়েকটি আবিষ্ট মুহূর্ত।

তারপর যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, তখন দেখলাম, একটা অজুহাত পেয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটছি। প্ল্যাটফর্মে একটা সোরগোল উঠেছে, ট্রেন এসেছে একটা।

লোকে লোকারণ্য। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্' চিৎকারের উপলক্ষ্য খদ্দর-পরিহিত মাল্যভূষিত ব্যক্তিটি ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামলেন। মক্কেলহীন এই উকিলটি সকলেরই পরিচিত। ডেমোক্রেসি-যন্ত্রের নানা চাকায় নানা তৈল, যেখানে যেটির প্রয়োজন, নিপুনভাবে নিষেক করতে পারলে ভাগ্যচক্র যে উন্নতিপথে ঘর্ঘরশব্দে ছুটে চলবার যোগ্যতা লাভ করে, ইনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম প্রথম ইনি দেশসেবার খুচরো কারবার করতেন, এখন পাইকারী ব্যবসা খুলেছেন—বচন, বুদ্ধি আর খদ্দর এই মূলধন নিয়ে। ভিড় চ'লে গেল, ট্রেন চ'লে গেল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও, তাই নাকি ?

কানের পাশে আবার গুঞ্জন ক'রে উঠল কথাগুলো! সহসা নিজেকে ওই মাল্যভূষিত চোরটার সগোত্র ব'লে মনে হ'ল। ব'সে পড়লাম। রঙিন শতরঞ্জিখানা প্রসারিতই ছিল, শিয়রে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা বিছানা, পাশে নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। চোখ বুজে বিছানাটায় ঠেস দিলাম, ভারি নিঃস্ব মনে হতে লাগল নিজেকে। চুরি ধরা পড়েছে ক্ষতি নেই, কিন্তু ওর কাছে! তখন কে জানত যে, চোরাই-মাল-সমেত ওকেও ধরা পড়তে হবে একদিন আমার কাছে! কিন্তু না, জিনিসটা ঠিক তা নয়, ও ধরা পড়ে নি, ধরা দিয়েছিল। আকাশ-পাতাল তফাত যে! আমি হয়তো সারারাত তেমনই ভাবেই ব'সে থাকতাম, যদি না টেলিগ্রাফ-পিওনটা এসে বংশীর খোঁজ করত। বংশার নামে একটা টেলিগ্রাফ এসেছিল। ওয়েটিং-রুমের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে ডাকলাম বংশীকে। বংশী বেরিয়ে এসে টেলিগ্রাম খুলে দেখলে, তারপর ঘরের

দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, জ্যোতির্ময়দা টেলিগ্রাম করেছেন—Missed train. Following in a taxi. Inform Ratri. Wait for me.

দরজার পাশে দেখলাম, রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে।

চুপ ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

৪

দিল্লী এক্সপ্রেসে যখন স্বর্ণেন্দু এল, যখন আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। বংশীর ডাকে উঠে ব'সে সামনে দেখলাম, একমাথা রুক্ষ চুল, একমুখ রুক্ষ গোঁফ-দাড়ি, আড়ময়লা-জামা-কাপড়-ক্যাম্বিসের-জুতো-পরা এক ব্যক্তি আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। ককৃখনও এ স্বর্ণেন্দু নয়। আমাদের সঙ্গে যে রোগা লাজুক ছেলেটি পড়ত, সে এই! আমি উঠে দাঁড়াতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, ঘনশ্যাম, তুই! আর কিছু বলতে পারলে না সে।

স্বর্ণেন্দু ঘণ্টা দুই ছিল বোধ হয়। কিন্তু এই দু' ঘণ্টার অধিকাংশ সময়ই সে আমার কাছে ছিল। এসেই মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার ওয়েটিং-রুমের ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর বরাবর আমার কাছেই ছিল। শুনলাম, মাকে আনতে সে মথুরা গিয়েছিল, কিন্তু মা এলেন না। সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আসতেই চান না নাকি তিনি। একটু ম্লান হেসে স্বর্ণেন্দু বললে, মায়ের মাঝে মাঝে ওই রকম ধর্ম-বাই চাগে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে স'রে পড়েন তিনি, আবার কিছুকাল পরে ফিরে আসেন, আবার চ'লে যান। বাবার পক্ষাঘাত হয়ে আরও সুবিধে হয়েছে তাঁর। আসল কথা কি জানিস? ওয়েটিং-রুমের দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, রাতুই আসল কারণ। ওর বিয়ে নিয়েই ভাই যত গোলমাল। মা একটু—মানে, আজকালকার স্বাধীন মত-টতগুলো পছন্দ করেন না। তাই বা বলি কি ক'রে? একটু থেমে, ছোট্ট একটু হেসে বললে, মানে, আমাদের সঙ্গে তর্কে না পেরে রাগারাগি ক'রে শেষকালে পালিয়ে যান।

কোথা যান?

কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ—যখন যেখানে তাঁর গুরুদেব থাকেন। তাঁকে খবর দিলেই গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন।

একটু খটকা লাগল।

গুরুদেব গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন?

হ্যাঁ। মাকে তুই দেখিস নি কখনও, অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ মা। মাঝে মাঝে দেবতার ভর হয় তাঁর ওপর।

দেবতার ভর হয়?

না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ভারি অদ্ভুত কিন্তু।

মায়ের গল্প শেষ ক'রে স্বর্ণেন্দু নিজের বেকার জীবনের ইতিহাস শুরু করলে। কত রকম ভাবে চেষ্টা ক'রে সে কত রকম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তারই বর্ণনা। দু ঘণ্টা ধ'রে নানা ছন্দে একই কাহিনী শুনলাম। তার সব কথা মনে নেই; কিন্তু এটা বেশ মনে আছে, স্বর্ণেন্দুকে সেদিন যেন নূতন রূপে দেখলাম। লাজুক রোগা যে স্বর্ণেন্দু আমাদের সঙ্গে পড়ত, এ যেন সে নয়,—
—এ যেন তার থেকেই উদ্ভূত অন্য আর একজন।

প্রায় বছর দশেক আগে একবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন মামার বাড়ির চেহারা ছিল—তকতকে ঝকঝকে উঠোন, উঠোনের এক কোণে বাঁশের মাচায় কচি শসা ঝুলছে, দক্ষিণ দিকে মাটির দেওয়াল বেয়ে ঝিঙেলতা উঠেছে —তাতে অজস্র ঝিঙেফুল, দাঁড়ে টিয়াপাখি চোখ পাকিয়ে হরিনাম শোনাচ্ছে সবাইকে, রান্নাঘরের দাওয়ায় মামীমা তাঁর নিজস্ব ছোট উনুনটার ধারে ব'সে কখনও পাটিসাপটা, কখনও সন্দেশ, কখনও ক্ষীরপুলি তৈরি করছেন। মামারা এখন শহরে, বাড়িতে কেউ নেই। মাস-দুয়েক আগে একটা কার্যোপলক্ষ্যে আবার সেখানে গিয়েছিলাম আমি। বাড়িটার আর এক রকম চেহারা দেখে এলাম। উঠোনে একহাঁটু জঙ্গল—কচু, ঘেঁটু, মনসা আপাং, শেয়ালকাঁটা, আরও কত রকম গাছ গজিয়ে ছেয়ে ফেলেছে উঠোনটাকে। গিরগিটি, ছাতারে পাখি নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রী যে নেই তা নয়, কিন্তু নূতন রকম শ্রী।

স্বর্ণেন্দুকে দেখে মামার বাড়ির ছবি দুটো পর পর চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল সেদিন। আগে যে কথাই বলত না, সে বাক্যবাগীশ হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত ব'কে চলেছে।—

বুঝলি ভাই, দরখাস্ত নিয়ে তো গেলাম লোকটার কাছে, সে আমাকে মুখে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিলে, বুঝলি ভাই, বললে, ফার্স্ট ক্লাস এম. এ. যখন তুমি, তখন তোমার আর ভাবনা কি, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, আমি প্রাণপণে রেকমেণ্ড করব তোমাকে। ও হরি! শেষকালে শুনলাম, সবাইকেই ওই কথা বলেছে লোকটা, আসলে ঘুষ না দিলে কিছু করবে না।

এমন অদ্ভুত একটা ছোট্ট হাসি হেসে স্বর্ণেন্দু আমার মুখের পানে চাইলে, যার অর্থ—সত্যি সত্যি ঘুষ দিয়ে তো আর চাকরি নেওয়া যায় না, সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল।

ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং—

যে এঞ্জিনটা এতক্ষণ সোঁ-সোঁ করছিল, সেটা মাল-গাড়ি শাণ্ট করছে। খানিকক্ষণ বোধ হয় ট্রেন আসার সম্ভাবনা নেই, আপ-ডাউন-ভাষী বাবুটি কার্বন-পেপারের ওপর পেন্সিল পিষে চলেছেন। কুলীগুলো সার সার শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তারপর বুঝলি, চাকরির চেষ্টা ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে একটা দোকান করলাম। প্রথম প্রথম বেশ চলল কিছুদিন, বাঙালীরা সব্বাই আমার দোকান থেকে জিনিসপত্তর কিনতে লাগল, কিন্তু ক্যাপিটাল বেশি ছিল না, শেষ পর্যন্ত চালাতে পারলাম না, ভয়ানক কম্‌পিটিশন ভাই, বুঝলি ?

আবার সেই ছোট্ট ধরনের হাসি হেসে ভয়ানক কম্‌পিটিশনের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সে নিরস্ত হচ্ছিল। আমি বললাম, বাঙালীরা সবাই কিনতে লাগল, অথচ দোকান চলল না—তার মানে ?

স্বর্ণেন্দু একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, অর্থাৎ আসল কথাটা ব্যক্ত করতে তার নিজেরই যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। তার গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ ক'রে সাবেক কালের লাজুক স্বর্ণেন্দু যেন ক্ষণিকের জন্যে আত্মপ্রকাশ করলে।

মানে, বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো, সবাই প্রায় ধারে কিনত, সব সময়ে সকলে ক্রেডিট-মেমোতে সইও করত না, আর ক্রেডিট-মেমোতে সই করলেও কি আর আমি নালিশ করতে পারতাম ? অনেকে বাবার বন্ধু, অনেকে আমার বন্ধু, সবই প্রায় আপনা-আপনি, কিনতে এলে চক্ষুলজ্জার জন্যে 'না' বলতে পারতাম না, মানে, আমাদের বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো ? একটু হেসে সে এমন ভাবে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলে, যেন সে সমস্ত বাঙালী জাতির হয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

আমি ওর কথা শুনছিলাম না যে তা নয়, কিন্তু শোনার চেয়ে বেশি দেখছিলাম আমি ওকে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর ছোট ছোট হাসির টুকরো, ওর রুক্ষ চুল দাড়ি গোঁফ, ওর আদর্শবাদ, ওর সত্যনিষ্ঠা, ওর অসহায় ভঙ্গী—সবটা মিশিয়ে নতুন ধরনের স্বর্ণেন্দু। এখন বুঝতে পারছি, বেকার-জীবনের শত লাঞ্ছনার মধ্যেও ও হাসিমুখে টিকেছিল সত্যানষ্ঠার জোরে। সম্ভবত এক-

বার মাত্র মিথ্যে কথা ও জীবনে বলেছিল এবং বলবার পর আর বেঁচে থাকে নি।

ইন্সিওরেন্সের দালাল হয়ে কিছুদিন ঘুরলাম, কিন্তু ও আমার পোষাল না ভাই, বড্ড বেশি মিথ্যে কথা বলতে হয়, তা ছাড়া খোশামোদও করতে হয় ভয়ানক—কোম্পানির খোশামোদ কর, পাব্‌লিকের খোশামোদ কর, ডাক্তারের খোশামোদ কর—দেশের অধিকাংশ লোকই রুগ্ন, তাদের সুস্থ ব'লে চালাতে হবে তো! তুই তো নিজে ডাক্তার, তোকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে হয় এই নিয়ে মাঝে মাঝে, বুঝতেই পারছিস।

আবার সেই অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি হেসে, যার অর্থ—মিথ্যে কথা ব'লে ব'লে তো আর টাকা রোজগার করা যায় না, সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল। স্বর্ণেন্দু চুপ করলে।

একটার পর একটা—অনেক কাহিনী শুনলাম, প্রত্যেক কাহিনীর শেষেই 'সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল'—ব্যঞ্জক হাসি।

তোদের চলছে কি ক'রে তা হ'লে ?

অভদ্র এই প্রশ্নটা আমার জিভ থেকে ছটকে বেরিয়ে পড়ল।

বাবার পেন্‌শন। বাবার মৃত্যু হ'লেই আমাদের মৃত্যু। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি তাই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে। কলকাতায় অবশ্য ছোটখাট বাড়ি আছে আমাদের একটা, কিন্তু সেটা এমন জায়গায় যে, তার ভাড়াটেই জোটে না।

আবার হাসলে স্বর্ণেন্দু এবং আমার মনে যে অভদ্রতর প্রশ্নটা উ কি দিচ্ছিল, অজ্ঞাতসারেই তার জবাবও দিয়ে দিলে।

ভাগ্যে অবনীশ কিছু টাকা দিয়েছে, আর জ্যোতির্ময়ের একটা বাড়ি আছে মধুপুরে, তাই বাবাকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে পারছি, তা না হ'লে বাবার পেন্‌শনে এত সব কুলোয় কি ?

অবনীশই বা কে, জ্যোতির্ময়ই বা কে ?

দুজনেই আমার বন্ধু। অবনীশ বোম্বেতে বিজ্‌নেস করে, বেশ দু-পয়সা করেছে। জ্যোতির্ময় একজন আর্টিস্ট।

ও।

বংশী চা দিয়ে গেল। বংশী ঠিক চাকরের মত খাটছে দেখলাম। বংশী চ'লে যেতে স্বর্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, বংশী তোদের সঙ্গেই থাকে বুঝি বরাবর ?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে। ওর বাপ-মা কেউ নেই, আমার বাবাই মানুষ করেছেন, ওকে বি. এ. পাস করাবার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছেন বাবা! কিন্তু কিছুতেই ও পাস করতে পারলে না।

বংশীর সম্বন্ধে এই অপ্রীতিকর উক্তিটা ক'রে স্বর্ণেন্দুর মনে বোধ হয় ঈষৎ ক্ষোভ হ'ল, একটু হেসে বললে, এক-একজনের পরীক্ষা পাস করবার 'ন্যাক' থাকে না, বংশী এদিকে বেশ ইয়ে আছে।

নীরবেই দুজনে চা-পান শেষ করলাম।

স্বর্ণেন্দু নিজের প্রসঙ্গ শেষ ক'রে আমাকে নিয়ে পড়ল।

তুই কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস করিস কোন্‌খানটায়?

বেনেটোলায়।

বেনেটোলার ধরণীবাবুকে চিনিস? বেনেটোলায় আমার দূরসম্পর্কের এক-জন ভগ্নীপতিও থাকেন—নিখিল চৌধুরী, উকিল।

কাউকেই চিনি না আমি।

এবার গিয়ে আলাপ করিস।

ঠিকানা দিয়ে দিলে স্বর্ণেন্দু।

বেনেটোলায় কি ওঁদের নিজেদের বাড়ি?

ধরণীবাবুর নিজের বাড়ি, নিখিলদা ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, অনেকদিন ধ'রে আছেন ওই বাড়িতে। বেশ লোক।

আচ্ছা, এবার গিয়ে আলাপ করা যাবে।

নম্বর দুটো টুকে নিলাম।

চমৎকার লিখছিস আজকাল ভাই তুই কিন্তু। রাতু তো তোর লেখার ভয়ানক 'অ্যাড্‌মায়ারার'।

লক্ষ্য করলাম, 'ভয়ানক' কথাটা ভয়ানকভাবে ব্যবহার করে স্বর্ণেন্দু। রাতু আমার লেখার ভয়ানক অ্যাড্‌মায়ারার শুনেই বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব'লে ফেললাম, ওর বিয়ের একটা কিছু ঠিক ক'রে ফেল্ এবার। আমিও চেষ্টায় থাকব। মেয়ের বিয়ে আজকাল একটা সমস্যা।

রাতুর বেলায় সমস্যা হ'ত না, মা যদি না অবুঝ হতেন। মায়ের মাথায় যে কি ঢুকেছে, তা বলতে পারি না। জ্যোতির্ময় মানে, আমার আর্টিস্ট-বন্ধুটি, ওকে এখুনি বিয়ে করতে রাজী, কিন্তু মা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না; আর মায়ের মত না পেলে জ্যোতির্ময় বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। মায়ের পছন্দ অবনীশকে।

কেন ?

অবনীশ দু-পয়সা রোজগারও করে, তা ছাড়া একটু ধার্মিক-গোছের—মায়ের আরও পছন্দ সেইজন্যেই বোধ হয়।

অবনীশ রাজী নয় বুঝি ?

অবনীশ রাজী আছে। আমরা, মানে, আমি মত দিই নি।

কেন ?

ঝাঁকড়া গোঁফ-দাড়ি সত্ত্বেও লাজুক স্বর্ণেন্দু পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলে, তারপর তৎক্ষণাৎ ছোট্ট একটু হেসে সামলে নিলে লজ্জাটা। তারপর উকিলরা যেমন আসামীর পক্ষ নিয়ে বলে, তেমনই ভাবে বলতে লাগল, রাতু বেচারা মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে ব'লে কি তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ থাকতে নেই ? নিজে সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বললে না ব'লে সব জেনে-শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না ? আমি জানি—

এইটেই স্বর্ণেন্দুর লজ্জার কারণ সম্ভবত, কিন্তু সেটা খুলে বললে না সেদিন। একটু থেমে শুধু বললে, অবনীশটা নিরামিষ খেয়ে, সন্ধ্যাহ্নিক ক'রে আর বার বার টাকা পাঠিয়ে মাকে হাত করেছে। মা এক রকম কথাই দিয়েছেন তাকে। অথচ আসল কথাটা জেনে কি ক'রে আমি—

মুচকি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

একটু পরে আর একটু মুচকি হেসে বললে, এই যে রাতদুপুরে জ্যোতির্ময় ট্যাক্‌সি হাঁকিয়ে ছুটে আসছে—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গেল স্বর্ণেন্দু, হঠাৎ খুব যেন গম্ভীর হয়ে পড়ল, হঠাৎ যেন লাজুক স্বর্ণেন্দুকে আড়াল ক'রে আদর্শবাদী ভাবুক স্বর্ণেন্দু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌নালের লাল আলোটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ সেই অদ্ভুত ছোট্ট হাসিটা হেসে কি একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল, থেমে গিয়ে অপ্রতিভ হ'ল একটু।

তোর মা জ্যোতির্ময়ের ওপর চটা কেন ?

ঠিক উলটো। ভয়ানক ভালবাসে মা ওকে, অবনীশের চেয়ে বেশি ভালবাসে, কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী নয় কিছুতেই।

কেন, গরিব ব'লে ?

জ্যোতির্ময় খুব গরিব নয়, মধুপুরে বাড়ি আছে, কলকাতায় বাড়ি আছে,

ছবি এঁকে রোজগারও করে কিছু। কিন্তু হ'লে কি হবে, ভয়ানক উড়ুনচণ্ডে, বেপরোয়া, খামখেয়ালী।

তোর সঙ্গে আলাপ হ'ল কি ক'রে?

মা-ই ওকে আবিষ্কার করেন প্রথমে কাশীতে। মায়ের মুখ থেকেই শুনেছি, ওর বাবা নাকি মায়ের গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন। জ্যোতির্ময় হবার পর মা মারা যান, কিছুদিন পরে বাবাও। মায়ের গুরুদেবই জ্যোতির্ময়কে মানুষ করেছেন। জ্যোতির্ময়ের যে সম্পত্তি গুরুদেবের কাছে গচ্ছিত ছিল, সে সব জ্যোতির্ময় বড় হবার পর জ্যোতির্ময়কে দিয়েছেন তিনি।

ঢননং ঢননং ঢননং—

আমার ট্রেন এসে পড়ল, কুলীটা এসে দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি শতরঞ্জি গুটিয়ে উঠে পড়লাম। 'চিঠি দিস মাঝে মাঝে'—কলরবের মাঝে স্বর্ণেন্দুর কথাগুলো এখনও শুনতে পাচ্ছি যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজায় নীরবে রাত্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ পাখাটা বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য গরম। একটা দমকা হাওয়ায় তপ্ত ধুলোগুলো ঘুরপাক খেয়ে উড়ছে। বুড়ো মুচী আর কইলু ইতর ভাষায় কলহ শুরু ক'রে দিয়েছে। লোম-ওঠা কুকুরটা ধুঁকছে রাস্তার এক ধারে ব'সে। একটা টমটমের সঙ্গে একটা সাইকেলের ধাক্কা লেগে গেল। ছিটকে পড়ল সাইকেলের ছোকরা, তারই দোষ, সে দু হাত ছেড়ে বাহাদুরি করতে করতে যাচ্ছিল। টমটমওয়ালা ছুট দিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রে কতকগুলো লোক ছুটল তাকে ধরতে। ঝগড়া ভুলে বুড়ো মুচী আর কইলুও ছুটল। কি অদ্ভুত আবেষ্টনী! আজ আর লিখব না। সুর কেটে গেছে। আর একদিন শুরু করা যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

কিছুক্ষণ আগে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

পৃথিবী সামান্য একটু ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয় নি। ছানা কেটে গেলে দুধ যেমন দেখতে হয়, খোবা খোবা ছানার ফাঁকে ফাঁকে সবুজাভ ছানার জল যেমন দেখা যায়, এক পসলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশের অবস্থা অনেকটা তেমনই হয়েছে। ফাটা মেঘের মাঝে মাঝে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেদুর জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক আবিষ্ট। মেঘমুক্ত পূর্ণিমারাত্রির শোভা নয়, আবছা অর্ধস্ফুট মাধুরী। দেওয়ালের ও-পাশে সদ্যস্নাত হাসনুহানার ঝাড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেছে, টের পাচ্ছি। খোলা আকাশের নীচে ব'সে আছি, কিন্তু মশারির ভেতর। ভয়ানক মশা। এমন রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে ব'সে থাকতে ভাল লাগে। পাশে কোন সঙ্গিনী থাকে তো ভালই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। বস্তুত সশরীরে না থাকাটাই বোধ হয় বেশি বাঞ্ছনীয়, অনায়াসে কল্পনা ক'রে নেওয়া যেতে পারে, নীলাম্বরী তন্বী একজন ব'সে আছে পাশে। সেই কল্পনাসঙ্গিনী আর যা-ই করুক, কথা ব'লে রসভঙ্গ করবে না।

কিন্তু এসব কিছু না ক'রে লণ্ঠন জ্বেলে আমি লিখতে বসলাম। স্বর্ণেন্দু এসে ভর করেছে। এই মেঘমেদুর জ্যোৎস্নার মধ্যে স্বর্ণেন্দু প্রচ্ছন্ন হয়ে এসেছে কি না কে জানে!

কলুটোলার মোড়ে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখাটার কথা মনে পড়ছে।

মশারির বাইরে রক্তপিপাসু অসংখ্য মশা চিৎকার ক'রে তাই করছে, প্রচলিত ভাষায় যাকে গুঞ্জন বলে। এই রক্তলোভী মশার দল কোন মন্ত্রবলে হঠাৎ যদি মালপোলোভী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীতে রূপান্তরিত হয়ে সবিনয়ে আমাকে বলে, আপনাকে একটা কীর্তন শোনাতে এসেছি আমরা, দয়া ক'রে মশারিটি তুলে বসুন, তা হ'লে আমি যত আশ্চর্য হয়ে যাই তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন স্বর্ণেন্দুর হাতে টকটকে লাল খাপে ঢাকা চকচকে ছোরাখানা দেখে। অথচ ভেবে দেখলে ব্যাপারটা এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। মানুষের হাতেই তো ছোরা থাকে। আসলে সেদিন শেষরাত্রে প্ল্যাটফর্মের ওপর

ব'সে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম, তার মধ্যে ছোরার সম্ভাবনা ছিল না। রজ্জু সহসা সর্পে রূপান্তরিত হ'লেই আমরা চমকাই। একটু পরেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে, রজ্জুতে আমার সর্পভ্রম হয়েছে, রজ্জু ঠিক রজ্জুই আছে। কিন্তু ওই ভ্রমের মধ্যেও যে একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল, সেদিন তা বুঝি নি।

ধরণীবাবুর কথাগুলো মনে পড়ছে—ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশাই, ওরা বাঙালী নয়, আলাদা জাতের লোক। ধরণীবাবু লোকটি অবশ্য নিখাদ বাঙালী। চাকরি ক'রে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, পর-নিন্দা করেন, দোল-দুর্গোৎসব করেন, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রে 'লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ' ছাপান, লৌকিকতা গ্রহণ করেন তা সত্ত্বেও, দেনও; বাড়িতে শাক-চচ্চড়ি খেয়ে বাইরে সশব্দে উদ্গার তুলে মুখবিকৃতি ক'রে বলেন, রিচ ফুড আর হজম হয় না মশাই; ভুঁড়ি আছে, টাক আছে, অষ্টধাতুর আংটি আছে, হুঁকো আছে; বাড়িতে ন-হাত্তি কাপড় প'রে মিতব্যয়িতা এবং সকালবেলা টুকটুক ক'রে হেঁটে স্বাস্থ্যচর্চা করেন। আলাপ হবার পর থেকে এই প্রাতর্ভ্রমণের মুখে মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় এসে চা-পান করতেন, এবং সেই সময়ই স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে আলোচনা চলত। স্বর্ণেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই কারণে, যে কারণে নাকি, তাঁর ভাষায়, 'দুটো কুকুরের মধ্যেও বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব'—অর্থাৎ দায়ে প'ড়ে। চাকরির ঘূর্ণাবর্তের টানে দুজনেই এমন স্থানে গিয়ে পড়েছিলেন, যেখানে তৃতীয় কোন বাঙালী ছিল না। সুতরাং বন্ধুত্ব হয়েছিল, ধরণীবাবু এটাকে বন্ধুত্বই বলতেন, যদিও তাঁর কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা যেত যে, এ বন্ধুত্বের মধ্যে যে বন্ধন ছিল, তা আত্মার নয়—স্বার্থের। ধরণীবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর পাল্লায় প'ড়েই নাকি তামাক খেতে শিখেছিলেন, অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি, কারণ পূর্ণেন্দুবাবু বন্ধু হ'লেও তাঁর ওপরওলা অফিসার ছিলেন।

বাঙালী ব'লেই যেতে হ'ত—ধরণীবাবু বলতেন,—সায়েবী ধাতেরই হোক আর যা-ই হোক, বাঙালী তো, নাড়ীর যোগ আছে একটা। নাড়ীর টানে যেতাম, কিন্তু আলাপ জমত না। পূর্ণেন্দুবাবু ঢিলে পাজামা প'রে আর পাইপ কামড়ে যে সব গল্প জুড়তেন, তা এমন বিদঘুটে যে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। এই ধর না, একদিন সাফ্রাজেট্‌সদের নিয়েই খুব বক্তৃতা শুরু করলেন। কি করব! সায় দিয়ে যেতাম। একদিন বক্তৃতার মাঝখানে

হঠাৎ থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার মুখের পানে। তারপর বললেন, তামাক ধর তুমি।

ধরণীবাবুর কথায় আমিও মুচকি হেসে সায় দিতাম। আমি ডাক্তার, ব্যবসার খাতিরেই আমাকে মুচকি হেসে সায় দেওয়াটা শিখতে হয়েছিল। মুচকি হাসির সায় পেয়ে ধরণীবাবুর মনের দরজাটা আরও খুলে যেত, অনর্গল ব'লে যেতেন তিনি এদের কথা। তবে সমস্ত কথা যে তিনি বলেন নি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরে।

কলুটোলা স্ট্রীট যেখানে এসে কলেজ স্ট্রীটে মিশেছে, সেইখানেই হঠাৎ স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ছে, ঠিক সেই সময় মেডিকেল কলেজের গেট থেকে একটা মড়াকে কাঁধে নিয়ে হরিধ্বনি করতে করতে জন-কয়েক লোক কলুটোলার মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল, ঠিক ওই মোড়ের কাছাকাছি আপাদমস্তক পেতলের বালা-পরা যে উড়েনীটা ফুটপাথে শুয়ে থাকত, তার কাছে মোটা-গোছের একজন বাবু উবু হয়ে ব'সে কিছু খাবার নিয়ে তাকে খাওয়াবার জন্যে সাধ্যসাধনা করছিলেন (উড়েনীর সম্বন্ধে নানা রকম গুজব প্রচলিত ছিল—কেউ বলত, ও নাকি তন্ত্রসিদ্ধ যোগিনী ; কেউ বলত, স্পাই ; কেউ বলত, পাগল)। হার্ডিঞ্জ হস্টেলের ওপরতলা থেকে কে যেন গাইছিল —'কে যাবি পারে'। আমি এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম থেকে নেবে হার্ডিঞ্জ হস্টেলের দিকেই যাচ্ছিলাম আমার মামাতো-ভাই হারাধনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ; তখনও ঠিক সন্ধ্যে হয় নি, এজরা হসপিটালের পেছন দিকের গাছগুলোতে অসংখ্য কাকের ডাকাডাকি শুনে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ নজরে পড়ল, স্বর্ণেন্দু চলেছে ওপারের ফুটপাথ দিয়ে। মাথা হেঁট ক'রে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে, এমন ভাবে চলেছে—যেন তার আশপাশে আর কেউ নেই, যেন সে আর তার সমস্যা ছাড়া অন্য সব কিছু অনাবশ্যক, এত অনাবশ্যক যে— তাদের দিকে ফিরে চেয়ে তাদের অস্তিত্বটুকু স্বীকার করবার মতও বাড়তি সময় যেন নেই তার।

স্বর্ণেন্দু !

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আমাকে দেখতে পেল না, সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কলুটোলার ফুটপাথে কাক-কলরব-মুখরিত আসন্ন সন্ধ্যায় তার চোখের বিস্মিত সেই দৃষ্টি এখনও আমি যেন দেখতে পাচ্ছি।

এগিয়ে গেলাম।

ও, তুই ঘনশ্যাম!

একটু ছোট্ট হাসি, তারপর কলুটোলার ফুটপাথে তার আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সলজ্জ একটু জবাবদিহি—একটা চাকরির চেষ্টায় এসেছিলাম ভাই, সিটি কলেজে একটা লেক্‌চারারের পোস্ট খালি ছিল—। একটু থেমে বললে, হ'ল না, লোক ঠিক হয়ে গেছে। তারপর এমন হাসি-ভরা চোখে সে চেয়ে রইল, যেন স্বর্ণেন্দু নামক বেকার যুবকের চাকরির জন্যে এই হাস্যকর ছটফটানিটা সে নিজে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে।

তোর হাতে ওটা কি?

খবরের কাগজের মোড়কটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল খাপে ঢাকা বাঁকা ছোরাটা।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম আমি।

কিনলি নাকি?

না। এটা ফার্নান্‌ডিজ রাতুকে জন্মদিনে উপহার পাঠিয়েছে। আমাদের এখানকার ঠিকানায় প'ড়ে ছিল, নিয়ে যাচ্ছি।

ফার্নান্‌ডিজ কে আবার?

বাবা যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন, ফার্নান্‌ডিজ তখন আমাদের ড্রাইভার ছিল। প্রতি বছর রাতুর জন্যে একটা না একটা কিছু পাঠায়।

স্বর্ণেন্দুর চোখ দুটো সহসা যেন স্বপ্নাতুর হয়ে এল। বলতে লাগল, তখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, তবু তার চেহারাটা একটু একটু মনে আছে এখনও। লম্বা-চওড়া কালো-কুচকুচে চেহারা। একটু থেমে বললে,—হাবসী ক্রিশ্চান। খুব ভালবাসে রাতুকে, ও বাহাল হবার বছর দেড়েক পরে রাতুর জন্ম হয়, মানে রাতুকে জন্মাতে দেখেছে ব'লেই বোধ হয়—। ছোট্ট হাসিটি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

খুলে দেখলাম। খাপ থেকে খুলতেই চকমক ক'রে উঠল। স্বর্ণেন্দুর মুখ-খানা ছোরাটার শাণিত ফলকে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠল একবার। মোড়ের ঘড়িটার দিকে চেয়ে স্বর্ণেন্দু বললে, ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই, চললাম ভাই।

মধুপুরেই ফিরে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়বাবু এসেছেন?

সেই দিনই তো ট্যাক্সি ক'রে এসে পড়ল, তুই চ'লে যাবার একটু পরেই।

বাবা কেমন আছেন ?

তেমনই।

ঘাড় নেড়ে হেসে স্বর্ণেন্দু চ'লে গেল।

২

তাড়াতাড়িতে স্বর্ণেন্দুকে তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, তার দূর-সম্পর্কের ভগ্নীপতি নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে শুধু আলাপ নয়, বেশ একটু মাখামাখি হয়েছে আমার। মাখামাখি হবার একটা স্থূল আধিভৌতিক কারণও ঘটেছিল। বিপত্নীক নিখিল চৌধুরীর কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড কাহার চাকর চামেলির রন্ধনপটুতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার গোকুলচন্দ্র যে মাংস রাঁধতে পারে না তা নয়, কিন্তু খুব ভাল করবার আগ্রহাতিশয্যে ধনে-হলুদ-আদা-জিরে-দই-পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কার সম্মিলনে যে বস্তু সে প্রস্তুত করে, তা শুধু যকৃতের নয়, রসিকের পক্ষেও দুষ্পাচ্য। ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণ ওই চামেলির রান্নার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তা মসলার নয়—ওর নিজের বৈশিষ্ট্য। সুস্বাদটারই প্রাধান্য, উপকরণের নয়। একটা কথা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগে, এই চামেলি না থাকলে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপটা হৃদ্যতায় পরিণত হ'ত না এবং এই উপাখ্যানের অনেকখানিই হয়তো আমার আগোচরে থেকে যেত।

সেদিন সকালে গোটা-চারেক বুনো হাঁস কিনেছিলাম। হৃষ্টপুষ্ট গোটা-চারেক 'লালসর'। খাবার জন্যেই যখন কিনেছিলাম, তখন তাদের মৃত্যু অনিবার্য। সহসা মনে হ'ল, গোকুল রান্না করলে এ মৃত্যু শোচনীয়ও হয়ে উঠবে। দিলাম পাঠিয়ে সেগুলো নিখিল চৌধুরীকে। সদ্গতি হবে।

হার্ডিঞ্জ হস্টেলে হারাধনের সঙ্গে দেখা সেরে ফিরে এসেই নিখিলবাবুর চিঠি পেলাম—

ঘনশ্যামবাবু,

লালসর শুধু বন্য হংস নহে, পরম হংস। এই কলিকাতা শহরে মহাভাগ্যবলে দৈবাৎ ইহাদের দর্শনলাভ ঘটে। আপনার উদারতার জন্য গদ্গদকণ্ঠে সাধুবাদ জানাইয়া নিবেদন করিতেছি, আপনি শীঘ্র আসুন, চামেলি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

নিখিল চৌধুরী

না উড়লে নীলকণ্ঠ পাখির নীল-বর্ণসম্পদ যেমন সম্যকরূপে নয়নগোচর হয না, একটু উত্তেজিত না হ'লে তেমনই আসল নিখিল চৌধুরীকে চেনা যায় না। সেদিন সন্ধ্যায় আহারাদির পূর্বেই খোলা ছাদে ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে স্বর্ণেন্দুর কথা আলোচনা করতে করতে নিখিল চৌধুরী একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এক নজর আমার পানে চেয়ে হাতীর দাঁতের নস্য-দানিটা থেকে বড় এক টিপ র-ম্যাড্রাসী নস্যি বার ক'রে একটু হেঁট হয়ে ঘন ঘন নাকের ছিদ্র দুটো বোঝাই ক'রে নিলেন। তারপর নাকের আশপাশে-লাগা নস্যিটা না ঝেড়েই ঈষৎ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কিছুই জানেন না আপনি।

বুঝলাম, নিখিল উত্তেজিত হয়েছেন। কারণ, আমি যে কিছু জানি—এ দাবি আমি মোটেই করি নি। স্বর্ণেন্দুকে উপলক্ষ্য ক'রে যে কথোপকথন শুরু হয়েছিল, তা স্বর্ণেন্দুতেই নিবদ্ধ ছিল না, রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হচ্ছিল এবং সেই আবর্তের মুখে আমি কেবল আমার সরল বিশ্বাসটুকুই ব্যক্ত করেছিলাম—কালো হ'লে কি হয়, চমৎকার দেখতে মেয়েটি! এ কথা শুনে প্রথমটা কিছু বলেন নি নিখিলবাবু, কিন্তু দ্বিতীয় বার এ কথা বলতেই নস্যি নিয়ে উক্ত উক্তিটি করলেন।

আমি পুনরায় বললাম, চমৎকার নয়?

আবার এক টিপ নস্যি তর্জনীও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে কটমট ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার পানে, তারপর সশব্দে সেটা নাসারন্ধ্রে টেনে নিয়ে নাকের আশপাশের নস্যিগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মনে হ'ল যেন অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর! তারপর আমি কিছু বলবার আগেই স্ফুটকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, চেকভ না শেহভ—উচ্চারণ ঠিক জানি না, তাঁর লেখা 'ডার্লিং' আপনি পড়েছেন?

পড়েছি।

আনাতোল ফ্রাঁসের 'থোয়া' না 'থেস', উচ্চারণ ঠিক জানি না, পড়েছেন?

পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'?

পড়েছি।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কুচকুচে কালো লম্বা একটা বাঘিনী আছে, দেখেছেন?

দেখেছি।

অমাবস্যার অন্ধকার দেখেছেন একা মাঠে দাঁড়িয়ে কখনও ?

দেখেছি।

চকচকে তলোয়ার দেখেছেন ?

দেখেছি।

চুম্বক ?

দেখেছি।

তা হ'লে এই সমস্তগুলির আত্মাকে আকাশের মত বিরাট একটা কটাহে একত্রিত ক'রে কোন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর চাপিয়ে ডিস্‌টিল করতে থাকুন কল্পনায়।

তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, করছেন ?

চেষ্টা করছি।

করুন। যা হবে, দেখবেন, তা ওই ড্রয়িং-রুম-মার্কা ছোট্ট চিকমিকে 'চমৎকার' কথাটা দিয়ে বর্ণনীয় নয়।

আবার একটু থেমে বললেন, 'সাংঘাতিক' বললে কিছু আভাস পাওয়া যায় হয়তো, তাও যৎসামান্য।

এর পর কি বলব, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কারণ নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রির একটা ঘোরতর রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে ঘটেছে, তা অবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলাম ; কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি আলোড়নযোগ্য কি না, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সাবধানতা অবলম্বন ক'রে বললাম, আপনার আত্মীয় যখন, তখন নিশ্চয়ই আপনি ভাল ক'রে চেনেন। আমার তো সে সুযোগ—

বিরক্তিকর! আবার আপনি একটা ভুল কথা ব্যবহার করলেন অজ্ঞাতসারে। রাত্রির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা সুযোগ নয়, দুর্যোগ! আমার স্ত্রী ওর জন্যে আত্মহত্যা করেছে, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালিয়ে বেঁচেছি।

এর পর চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় রইল না। দুজনেই নির্বাক হয়ে রহিলাম। চারটে বুনো হাঁসের মধ্যস্থতায় এত বড় একটা সত্যের সম্মুখীন হতে পারব, তা আমি কল্পনাই করি নি। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নিখিলবাবু বললেন, এখনও কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। ভালবাসি, ঘৃণাও করি। বিরক্তিকর!

বললাম অর্থাৎ না ব'লে পারলাম না, আপনার সঙ্গে ওদের যা সম্পর্ক, তাতে অনায়াসেই তো ওকে বিয়ে করতে পারতেন আপনি।

দুটো বাধা ছিল। প্রথমত—পূর্ণেন্দুবাবু, পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী, রাত্রি এরা ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে, অন্তত আমার তাই ধারণা। আর দ্বিতীয়ত—আমিও ঠিক সেই ধরনের উদার লোক নই, যে সব জেনে-শুনে একটা প্রেম-করা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।

একটু ইতস্তত ক'রে একটু হেসে বললাম, কিন্তু প্রেম তো আপনার সঙ্গেই হয়েছিল।

নিখিল সশব্দে আর এক টিপ নস্য টেনে নিলেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, রাত্রির আকাশে অগণিত নক্ষত্র। আবার একটু থেমে বললেন, দিনের আকাশেও অগণিত নক্ষত্র, কিন্তু দেখা যায় না। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে 'বিরক্তিকর' কথাটা হয়তো উচ্চারণ করেছিলেন নিখিল চৌধুরী, কিন্তু গোলমালে আমি শুনতে পাই নি, একটা দ্রুতগামী লরির ঘড়ঘড় শব্দের তলায় শেষের দিকের কয়েকটা কথা চাপা প'ড়ে গিয়েছিল।

নিখিলবাবুর মুখে সেদিন যা শুনেছিলাম, সেই স্মৃতির সঙ্গে আর একটা শ্রুতি-স্মৃতি মিলিয়ে দেখছি। একদিন লুকিয়ে তার কান্না শুনেছিলাম। নিখিল চৌধুরী-বর্ণিত অগণ্য নক্ষত্রময়ী রাত্রির পাশে মেঘভারাক্রান্ত বর্ষণমুখর রাত্রির ছবিটি রেখে বিস্মিত হয়ে দেখছি। এই বাড়িতেই গভীর রাত্রের নির্জন অন্ধকারে ওই পাশের ঘরটায় সে লুকিয়ে কাঁদছিল। এই ছাতেরই এক প্রান্তে আধখোলা জানলাটার পাশে অন্ধকারে আমি যে সবিস্ময়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা সে জানত না। মাঝে মাঝে ভাবি, জানলে সে কি করত? হয়তো হেসে উঠত। তার কলকণ্ঠের অট্টহাস্য ভীরু অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে বিদ্যুতের মত ঝকমক ক'রে উঠত হয়তো। কিন্তু সে দেখতে পায় নি। আমি কিন্তু দেখেছি, শুনেছি! আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে প'ড়ে অঝোর-ঝরে কাঁদছিল সে।

আমি জানতাম না, (এখনও অবশ্য কতটুকুই বা জানি!) তাই একটু সসঙ্কোচে নিখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবনীশ জ্যোতির্ময় কি তখনও ছিল?

না, এদের নাম তখন শুনি নি, অন্তত মনে পড়ছে না। তখন ছিল খগেন, সৌমেন্দ্র, তপেশ, জমীর ব'লে এক মুসলমান ছোকরা, হারুবাবু নামে এক বুড়ো ডেপুটি, আর নিখিল চৌধুরী। অর্থাৎ এদের কথা আমি জানতাম, আরও

অনেক ছিল নিশ্চয়। একটু থেমে আবার বললেন, ওদের বাড়িটায় পুরুষদের একটা মস্ত আড্ডা ছিল যে তখন।

আড্ডা ছিল?

রীতিমত। হবে না? যে বাড়িতে অমন চমৎকার চা তৈরি হয় এবং তা যখন খুশি গেলে পাওয়া যায়, যে বাড়িতে বাজি রেখে ব্রিজ খেলা হয় এবং খেলার সঙ্গিনী হিসেবে রাত্রির মত মেয়েকে পাওয়া যায়, যে বাড়ির গিন্নী—গড নোজ হোয়াই—সংসার ছেড়ে তীর্থে তীর্থে গুরুদেবের সেবা ক'রে বেড়ান, যে বাড়ির কর্তার সুনীতি-দুর্নীতি পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে তা বল্‌শেভিক রাশিয়াতেও চলবে কি না সন্দেহ, সে বাড়িতে পুরুষমানুষের—মানে আমাদের মত পুরুষমানুষের আড্ডা হবে না তো কি হবে?

কোথায় ছিলেন আপনারা তখন?

এই কলকাতা শহরেই। পূর্ণেন্দুবাবু তখন ছ-মাসের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

তখনও পক্ষাঘাত হয় নি তাঁর?

আরে না না, তখনও তিনি রকেটের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন। বছর তিনেক আগে আর কি।

নিখিল চৌধুরী আবার একবার নস্যি নিলেন।

আমি তখনও সিগারেট ধরি নি, অন্যমনস্কভাবে গোঁফের ডগাটা পাকাতে লাগলাম।

বিরক্তিকর!

নিখিলবাবু উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

স্বর্ণেন্দুও কি আপনাদের আড্ডায় যোগ দিত?

না। সে ছিল লখ্‌নৌয়ে, এম. এ. পড়ছিল।

ও তো স্কটিশে আমার সঙ্গে পড়ত!

পরে লখ্‌নৌ চ'লে যায়।

স্বর্ণেন্দু আমার সঙ্গে কিছুদিন এক কলেজে পড়েছিল ব'লে তাকে যতটা আপন ব'লে মনে হচ্ছিল, এই সামান্য সংবাদটায় সেই আত্মীয়-ভাবটা কেমন যেন খানিকটা ক'মে গেল। আমি ভাবছিলাম—

হঠাৎ ছ-ফুট লম্বা নিখিল চৌধুরী আমার দুই কাঁধে থাবার মত দুটো হাত রেখে বললেন, সাবধান হোন।

এ অবস্থায় সাধারণত লোকে যা করে—ভাষার সাহায্যে আত্মগোপন—আমি তাই করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হ'ল না, চামেলি এসে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

দুজনেই নীচে নেমে গেলাম!

এমন চমৎকার 'ডাক-রোস্ট' আমি আর কখনও খাই নি। নিখিলবাবু কিন্তু দেখলাম খুব খুশি হন নি। কেমন যেন খুঁত-খুঁত করতে লাগলেন এবং অতি সব তুচ্ছ কারণ আবিষ্কার ক'রে চামেলিকে ধমকাতে লাগলেন। পরে জেনেছিলাম, এইটেই তাঁর ভালবাসা প্রকাশের ধরন। তিনি তাঁর এই ছিপছিপে কালো কাহার ভৃত্যটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন ব'লেই তুচ্ছ অলীক কারণে তাকে ধমকান। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিখিল চৌধুরীও অবশ্য নিজেকে লুকোতে পারেন নি, চামেলি সব বুঝত। নিখিলবাবু যখন তাকে ধমকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে যদিও সে শুষ্কমুখে অপরাধীর মত ভাব প্রকাশ করছিল, কিন্তু আড়ালে মুখ টিপে হাসছিল।

যেন ছাতে কোন আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখে আমরা নেবে এসেছিলাম, এমনই একটা মনোভাব নিয়ে খাওয়া শেষ হতেই যন্ত্রচালিতবৎ আবার আমরা দুজনে ছাতে এসে বসলাম। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সেই রইলাম—যদিও দুজনেই একই কথা ভাবছিলাম, এবং আশ্চর্যের বিষয়, দুজনেই তা বুঝতে পারছিলাম। নিখিলবাবুর একটা কথা ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল—এরা কেউ ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে। কথাগুলোর নানা রকম অর্থ করা যায়। আমার সহসা কৌতূহল হ'ল, নিখিলবাবু কি অর্থে কথাগুলো ব্যবহার করলেন, কে জানে? কৌতূহলটাকে বাঙ্ময় করলাম যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক আকার দিয়ে এবং নিরুৎসুক কণ্ঠে।

মেয়েরা একটু বড় হয়ে গেলে, আজকালকার দিনে, যাকে-তাকে বিয়ে করতে চায় না। স্বর্ণেন্দুর কথাটারই পুনরুক্তি করলাম, তাদেরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে তো!

বড় মানে কি, কত বয়সের মেয়েকে আপনি বড় বলেন?

শুধু নিখিল চৌধুরীই নয়, অনেকেই দেখেছি, কোন একটা জিনিস বুঝেও যখন না বুঝতে চান, তখন তাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করেন। পৃথিবীতে প্রায় সব জিনিসেরই ব্যতিক্রম আছে—এই সত্যটার সুযোগ নিয়ে তাঁরা প্রতিপক্ষকে

বিপর্যস্ত করবার প্রয়াস পান। হ'লও তাই।

আমি যেই বললাম—এই ধরুন ষোল-সতরো, শিকারের ওপর ঝম্পোন্মুখ শিকারী পশুর চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, নিখিল চৌধুরীর চোখেও ঠিক সেই দৃষ্টি ফুটে উঠল। এক টিপ নস্যি তুলে নিয়ে বললেন, তার ঢের আগে আপনার ওই রাত্রি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের চোটে সকলের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল একদিন। তখন ওর বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে।

সশব্দে নস্যিটা টেনে নিলেন।

হয়েছিল কি?

বিয়ের কনে পিঁড়ি থেকে উঠে পালিয়েছিল, বরের কানে একটু খুঁত ছিল ব'লে।

কানে?

হ্যাঁ, কানে। ঠিক কাটা নয়, কানটা একটু মোড়া-গোছের ছিল।

কি রকম?

পুর্ণেন্দুবাবু যখন আশীর্বাদ করতে যান, তখন সেটা পাগড়ি দিয়ে ঢাকা ছিল ব'লে দেখা যায় নি।

আশীর্বাদ করবার সময় বর পাগড়ি প'রে ছিল নাকি?

হ্যাঁ। ছেলেটি পশ্চিমেই মানুষ, পশ্চিমেই থাকত, তাই পাগড়ি-পরাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়েছিল তখন সকলের! আসল কারণটা বোঝা গেল বিয়ের ঠিক আগে, টোপর পরবার সময়।

নিখিল চুপ করলেন।

আমি বলতে গেলাম, জোচ্চোরকে বিয়ে না ক'রে তো ঠিকই—

বিরক্তিকর! আমি কি বলেছি, বেঠিক করেছিল? আমার বক্তব্য শুধু এই যে, অন্য কোন মেয়ে ঠিক এমনটা করত না ওই বয়সে।

আমি মানস-চক্ষে দেখতে পেলাম ছবিটা। টোপর-পরা বরের মুখের দিকে ক্ষণকাল নিষ্পলক নয়নে চেয়ে থেকে তারপর উঠে গেল সে। পরনে লাল চেলী, কপালে কনে-চন্দন।

পুর্ণেন্দুবাবু সেই একটিবার মাত্র সম্বন্ধ ক'রে ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, আর করেন নি। একটু থেমে নিখিলবাবু আবার বললেন, ওর মায়ের জন্যে আর সম্ভবও হয় নি।

মায়ের বিয়ে দিতে আপত্তি ছিল নাকি খুব?

নিখিল চৌধুরী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর জানতেন কি না এবং জানলেও দিতেন কি না জানি না ; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে টং-টং ক'রে বারোটা বেজে উঠতেই দুজনে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হতে বাধ্য হলাম। নিখিলবাবু বললেন, বিরক্তিকর ! কাল আবার সকালেই কোর্ট আছে আমার।

আমারও একটি রোগীকে ভোরেই ইন্‌জেক্‌শন দেবার কথা ছিল। সুতরাং উঠতে হ'ল। কিন্তু বেশ মনে আছে, নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারেই উঠেছিলাম সেদিন। নিখিলবাবুকে এতক্ষণ ধ'রে একা পাবার সুযোগ আর একদিন মাত্র ঘটেছিল আমার। সেদিনও প্রসঙ্গ এই, কিন্তু 'পরিস্থিতি' বিভিন্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

আমি গোড়াতেই বলেছি, রাত্রির সবটা আমি দেখি নি। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি এবং অনেকখানি কল্পনা করেছি। যদিও সকলের সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান এই তিনটি জিনিসের যোগ-বিয়োগের ফল, তবু রাত্রির সম্বন্ধে এ কথাটা আরও বেশি ক'রে মনে রাখা উচিত এই কারণে যে, এ ক্ষেত্রে যোগ-বিয়োগের ফলে যে ধারণাটা আমাদের মনে স্থায়ী হবার সম্ভাবনা, সে ধারণাটার স্বরূপ সমাজ-স্বার্থের দিক থেকে ; কিন্তু—না থাক্। বাক্যের আবর্তে আপনাদের সহজ বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে তুলতে চাই না। আমি ঘটনাগুলির যথাযথ বর্ণনা ক'রে যাচ্ছি, আপনারা নিজেরাই নিজেদের স্বকীয়তা অনুযায়ী স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। কেবল সত্যনিষ্ঠার খাতিরে এইটুকু শুধু আমি বলছি যে, ঘটনাগুলির মধ্যে পারম্পর্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। 'যথাযথ' শব্দটাকেও বৈজ্ঞানিক অর্থে নিলে চলবে না। নারীর সম্বন্ধে পুরুষের বর্ণনা কখনও যথাযথ হতে পেরেছে ? 'পারম্পর্য নেই'—এ কথাটা যে তুচ্ছ করবার মত নয়, একটা উদাহরণ দিলে তা আরও স্পষ্ট হবে। বিছুটি-লতার সুনাম নেই। মনে করা যাক, আপনি এই বিছুটির পাতা দেখেছেন, শিকড় দেখেছেন, বীজ দেখেছেন, অখ্যাতি শুনেছেন এবং সংস্পর্শও লাভ করেছেন ; কিন্তু বিছুটির জীবনের সেই কটা দিন হয়তো আপনি দেখেন নি,

যখন সে ফুলে ফুলে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ যদি পুষ্পালঙ্কৃতা রূপান্তরিতা বিছুটিকে একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে কোন দিন দেখতেন, তা হ'লে হয়তো বিছুটির সম্বন্ধে আপনার ভূতপূর্ব তিক্ত ধারণায় হঠাৎ খানিকটা মাধুর্য-সঞ্চার হ'ত। আপনার অজ্ঞাতসারেই বিছুটির বিজ্ঞানসম্মত বদনাম সত্ত্বেও আপনার মন অনেক রকম দার্শনিক তথ্য, সত্য-অসত্যের অভিন্নতা, স্বপ্নের বাস্তবতা, আপাতদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা—নানা রকম উদ্ভট আলোআঁধারির মোহ সৃজন ক'রে অসহায় আত্মহারা ভাবে বিছুটির পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে যুক্তি আহরণ করতে ব্যস্ত হ'ত। অর্থাৎ বিছুটি নামক বিষাক্ত উদ্ভিদটির জীবনের ঘটনা-পরম্পরা পর পর দেখবার সুযোগ যদি কারও ঘটে, তা হ'লে বিছুটির ওপর চ'টে থাকা অসম্ভব হবে তার পক্ষে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিছুটির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি বিছুটির জীবনে স্বল্পকাল থাকে এবং অধিকাংশ লোকের তা নয়ন-পথবর্তী হয় না।

আমি যে রাত্রির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি দেখতে পেয়েছিলাম তা নয়; কিন্তু কল্পনা করতে ক্ষতি কি, বিশেষত সে কল্পনার যখন অতি স্বাভাবিক একটা ভিত্তি আছে। নিখাদ বাঙালী ধরণীবাবুও কল্পনা করেন, 'ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশায়, ওরা বাঙালী নয়, ওরা আলাদা জাতের লোক।' আমারই বা কল্পনা করতে বাধা কি যে, রাত্রির জীবনেও একদিন অতিশয় স্বাভাবিক নিয়মে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছিল, যে ফুলের সৌরভ শুধু অলিকুলকেই নয়, রাত্রিকেও আবিষ্ট করেছিল, যে আবেশের মোহে সে ভেবেছিল—অলিদের নয়, বসন্তকেই সে বন্দী ক'রে রাখতে পারবে তার পুষ্পিত কারাগারে!

আমার বিশ্বাস, স্বর্ণেন্দু তার এই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপটি দেখেছিল,—শুধু দেখে নি, মিলিয়ে দেখেছিল তার নিজের অপুষ্পিত ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে। তা না হ'লে কিংবা হয়তো তার মায়ের কথা—না, কারণটা এখনও ঠিক জানি না আমি। কিন্তু স্বর্ণেন্দুর, সেই আদর্শবাদী স্বর্ণেন্দুর নিষ্পাপ মুখচ্ছবিটা ভুলতে পারি না আমি কিছুতে। অতিশয় শান্তভাবে কেবল সে বলেছিল, আমি করেছি! কোন উত্তেজনা, কোন বাহাদুরি, কোন উত্তাপ ছিল না তার কণ্ঠস্বরে। তাই আমার মনে হয়, রাত্রির পুষ্পিত জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যর্থ জীবন সে মিলিয়ে দেখেছিল এবং—। কিন্তু এ সব আমার কল্পনা। ঘটনাটা শুনুন।

নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রিদের সম্বন্ধে আলোচনা হবার প্রায় ছ মাস পরে ঘটনাটা ঘটেছিল। এই ছ মাস আমি এদের কারও কোন খবর পাই নি,

রাখিও নি। সেদিন রাত্রে নিখিলবাবুর সাবধান-বাণী অনুসরণ ক'রেই যে আমি এদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম তা নয়, ধরণীবাবুর আলোচনা শুনেও আমার মনে জুগুপ্সার সঞ্চার হয় নি, রাত্রির সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য এতটুকু কমে নি, বরং বেড়েছিল ; তবু এদের সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়ে কোন সংবাদ সংগ্রহ করি নি—সম্ভবত মজ্জাগত সেই স্বভাবের প্রভাবে, যার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়ে কোন কিছুই করি না, যা চোখে পড়ে তাই দেখি, যা কানে ঢোকে তাই শুনি। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ছ মাসের খবর যদি আমি রাখতাম, অন্তত চিঠিপত্রেরও আদান-প্রদান যদি চলত, তা হ'লে হয়তো খবরের কাগজে কাহিনীটা যত বীভৎসভাবে বেরিয়েছিল আমি তার প্রতিবাদ করতে পারতাম ; এবং এই কাহিনীতে কল্পনায় যে সত্যটা অনুভব করছি, প্রত্যক্ষদর্শনের জোর পেলে—কিংবা হয়তো ভুল বলছি—প্রত্যক্ষদর্শনের উগ্রতাটা এত বেশি যে তার দাপটে সূক্ষ্ম সত্য অনেক সময় মারা পড়ে। কল্পনার সূক্ষ্ম জালেই সূক্ষ্ম সত্য ধরা যায়। সবটা প্রত্যক্ষদর্শন করলে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তিই থাকত না হয়তো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডিস্পেন্সারি থেকে ফিরলাম প্রায় সাতটার পর। নানা কারণে মনটা ভাল ছিল না। দিন সাতেকের মধ্যে দুটো রুগী মরেছিল, আরও দুটো মর-মর হয়ে ছিল, একজন বড়লোক ভাটিয়ার বাড়িতে দুটো সঙিন-গোছের ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। অল্পদিন মাত্র ঘরটায় ঢুকেছিলাম, দু-দুটো মৃত্যু ঘ'টে গেলে, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির সঙিনতার নয়, আমারই বদনাম হবে। ঘোষেদের বাড়ির টাইফয়েডটাকে পথ্য দিয়েছিলাম, বিকেলের দিকে শোনা গেল, তার একটু জ্বর হয়েছে। সকালবেলা শুভবিবাহ-মার্কা যে নেমন্তন্নের চিঠিখানা পকেটে পুরেছিলাম সেটার কথা মনেই ছিল না। বাড়ি ফিরে পকেট থেকে স্টেথস্কোপ বার করতে গিয়ে চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল। বিরক্তিতে সারা মনটা ভ'রে গেল। না গিয়ে উপায় নেই। শুধু যেতে হবে তা নয়, একটা উপহার কিনে নিয়ে যেতে হবে। এড়াবার উপায় নেই, কারণ ধনী জমিদার রায় মশায় একজন মস্তবড় পেট্রন আমার। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহে কোমরে গামছা বেঁধে দই পরিবেশন করতেই লেগে যাওয়া উচিত ছিল আমার। অন্তত টাকা পাঁচেকের মত দিশী বিলিতী জাপানী জার্মানী যাই হোক কিছু একটা শৌখিন দ্রব্য কিনে ঠোঁটে ভদ্রতার হাসিটি ঝুলিয়ে আত্মীয়তার অভিনয় করতেই হবে গিয়ে। অভিনয় করা শক্ত হবে না, কিন্তু কি জিনিস

কেনা যায় তাই একটা সমস্যা। কারণ জিনিসটা তো আর অভিনয় করবে না। ফুলদানি, টয়লেট-সেট, টী-সেট, নিটিং-সেট, রাইটিং-সেট—নানা রকম সেটের কথা মনে হ'ল, কিন্তু একটাও মনঃপূত হ'ল না। শাড়ির কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। পাঁচ টাকা দামের শাড়ি রায় মশায়ের মেয়ে কচিৎ কখনও পরলেও পরতে পারে হয়তো, কিন্তু সে শাড়ি উপহারের ভিড়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই তো উপহার দেওয়া। মনে হ'ল, তেমন কিছু পাঁচ টাকার মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ধড়াচুড়া ছেড়ে স্নান করলাম। স্নানান্তে এক কাপ চা খেয়ে একটু প্রফুল্লিত হলাম। মনে হ'ল, দুলাল সাধুর শরণাপন্ন হ'লে সে পাঁচ টাকার মধ্যেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। গোটা পাঁচেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিলাম, গোকুল এসে পথরোধ করলে।

আজ রায়েদের বাড়ি নেমন্তন্ন না তোমার ?

সেইখানেই তো যাচ্ছি।

কাপড়-চোপড়গুলো বদলে যাও, ও-রকম ময়লা জামাকাপড় প'রে নেমন্তন্ন খেতে যায় নাকি কেউ ?

জানি, প্রতিবাদ করা বৃথা।

বললাম, শিগগির দে তা হ'লে।

গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, বাবুধাক্কা-পাড় কাপড়, ফিতেবসানো পেটেণ্ট লেদারের কালো পাম্প-শু, মায় রূপো দিয়ে বাঁধানো শৌখিন ছড়িটি পর্যন্ত এনে হাজির করলে গোকুল। আলমারি খুলে এসেন্সের শিশি বার ক'রে পাট-করা রুমালে এসেন্সও ঢালতে লাগল। পৃথিবীতে এত লোকেরই যখন মন রেখে চলেছি, বস্তুত সমাজ-জীবন মানেই যখন এক-নাগাড়ে সকলের মন রেখে চলা, তখন গোকুলকেই বা মনঃক্ষুণ্ণ করি কেন ? কোনও আপত্তি করলাম না।

বেশি রাত ক'রো না যেন।

আচ্ছা।

তখন কি জানি, রাত্রির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে !

আমার সচেতন সত্তা জানত না যদিও, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, অবচেতন মনের কোন স্তরে সংবাদটা এসে পৌঁছেছিল বোধ হয়, এবং সেইজন্যেই আমি

বোধ হয় আমার কিছুক্ষণ আগেকার উপহার-বিরোধী মনোবৃত্তি সত্ত্বেও—না, ভুল বলছি—আসলে সেটা দুলাল সাধুর কীর্তি—আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েই সোজা সেই মনিহারী দোকানটির উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হলাম, যার একচ্ছত্র মালিক শ্রীদুলালচন্দ্র সাধু। একাধিক কারণে দুলাল সাধুর অসাধুতার নানা প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আমি সব জিনিস তার দোকান থেকেই কিনি। প্রথমেই বলেছি, চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। দুলাল সাধুর চোখ দেখেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার প্রতি। বড় ট্যারা চোখ। যখন মনে হবে, দুলাল সাধু রাস্তার ষাঁড়টার দিকে চেয়ে আছে, তখন কিন্তু সে নিরীক্ষণ করছে আপনাকে। যখন তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আকস্মিক ভৎর্সনা ঘনিয়ে উঠতে দেখে আপনার মনে আতঙ্ক-সঞ্চার হচ্ছে, তখন তার 'মাপ কর বাবা, এখানে হবে না' শুনে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে প্রত্যাখ্যাত ভিখারীটাকে দেখে আশ্বস্ত হবেন। ওর অদ্ভুত ট্যারা চোখই আকৃষ্ট করেছিল আমাকে প্রথমে। পরিচয় পেয়ে আরও আকৃষ্ট হলাম। অতি অমায়িক লোক। যখন গলা কাটছে, তখনও অমায়িক। পৃথিবীতে গলা তো সকলেই কাটে, অমায়িক কজন হয়? আমার বিশ্বাস, এটা ওর নিছক ভণ্ডামির আবরণ নয়, এটা ওর বিশেষ একটা গুণ। 'আপনি হলেন ঘরের লোক'—এটা শুধু ওর মুখের কথা নয়, আচরণেও সেটা ফুটিয়ে তোলার শক্তি আছে ওর। কেবল মুখের কথায় মানুষ বরাবর ভোলে না, খানিকটা আন্তরিকতাও থাকা চাই।

তৃতীয়ত, ধার দেয়। সকলকে দেয় না, লোক বুঝে দেয়। দুলাল সাধুর এইটে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা। ট্যারা চোখের এক চাউনিতেই ও বুঝে নেয়, লোকটা কোন জাতের, একে ধার দেওয়া চলে কি না!

আমি যখন দুলাল সাধুর দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বেচারা ভারি ব্যস্ত। নানা-রঙের-শাড়ি-পরা এক ঝাঁক কলেজের মেয়ে তাকে ঘিরে ছিল। দুলাল যে কখন কার মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, তা বোঝবার উপায় ছিল না। তবে এটা ঠিক, ফরসা লম্বা মেয়েটি যখন মনে মনে ঈষৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে করতে মুখে একটা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করছিল, তখন দুলাল তাকে দেখছিল না, তখন দুলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল খুব সম্ভব বাঁ ধারের শ্যামবর্ণটির ওপর। শ্যামবর্ণা মেয়েটি নিজেকে যখন বিব্রত মনে করতে লাগল, তখন দুলালের দৃষ্টি পড়েছিল আমার ওপর—

আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন, বসুন।

বসব না আর, আমাকে টাকা পাঁচেকের মত কিছু একটা দিন তো—বিয়ের উপহার।

এক মিনিট, এক্ষুনি দিচ্ছি। ওরে ভোঁদড়, পান দে ডাক্তারবাবুকে।

বলা বাহুল্য, একাধিক মিনিট বসতে হ'ল।

ব'সে ব'সে লক্ষ্য করতে লাগলাম মেয়েগুলিকেই। মুগ্ধ নয়, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। নানা রকম লোভনীয় মনিহারী জিনিসের দিকে সঞ্চরমাণ ওদের দৃষ্টিতে সেদিন যে লুব্ধতা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা ভুলব না কোনদিন। চোখ দিয়ে ওরা জিনিসগুলোকে গিলছিল যেন। এক-একবার মনে হচ্ছিল, আমার যথাসর্বস্ব খরচ ক'রে কিনে দিই ওদের জিনিসগুলো। ট্যারা দুলাল সাধুর সামনে ওদের ওই লুব্ধতা আমারই আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করছিল যেন। কিন্তু আমার যথাসর্বস্ব আর কতটুকু! খুব বেশিও যদি কত, তা হ'লেও ওদের তৃপ্ত করতে পারতাম না। হুতাশনকে ঘি খাইয়ে তৃপ্ত করবে কে? অনেক দরকষাকষি ক'রে (সেদিন এটাও লক্ষ্য করেছিলাম, এ বিষয়ে মেয়েরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি পটু) একখানি মাত্র শাড়ি কিনে চ'লে গেল ওরা। শাড়ির দরকার ছিল একজনের, বাকি কজন বোধ হয় পছন্দ করতে এসেছিল।

এইবার ডাক্তারবাবু, আপনাকে কি দোব বলুন? ওহে জগু, ফ্যানটা খুলে দাও ওদিকের।

টাকা পাঁচেকের মত যা হোক একটা কিছু দিন শৌখিনগোছের—বিয়েতে উপহার।

সসম্ভ্রমে দুলাল বললে, রায়েদের বাড়ির জন্যে বুঝি?

হ্যাঁ।

সামনের তাকে রক্ষিত গণেশের দিকে চেয়ে দুলাল হুকুম করলে, ওহে চণ্ডী, ওপর থেকে নিকেলের ইলেকট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আন তো, সাবধানে এনো।

একটু পরে চণ্ডী নিকেলের ইলেকট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আনলে, এবং দুলাল সাধু সসম্ভ্রমে সেটা খুলে দেখাতে লাগল।

এর পাঁচ টাকা দাম?

দাম কিছু বেশী। কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে জিনিস যাবে, দামের দিকে লক্ষ্য রাখলে তো চলবে না আমার।

শাড়ি-ব্লাউজ-পরা ডামিটার দিকে চেয়ে দুলাল সাধু মুচকি হেসে এমন

একটা ভাব প্রকাশ করলে, যা সত্যিই অবর্ণনীয়। তবু আমি শেষ চেষ্টা করলাম, আমার সঙ্গে পাঁচ টাকার বেশি নেই যে!

দাম আপনি যখন খুশি দেবেন, নাও যদি দেন তাও সহ্য হবে আমার, কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে চার-পাঁচ টাকা দামের খেলো জাপানি জিনিস পাঠাতে পারব না আমি।

ডামিটার দিকে এমন মর্মাহতভাবে চাইলে দুলাল সাধু যে, আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না।

সকলেই প্রশংসা করেছিল আইসক্রীম-সেটটার। রাত্রি প্রশংসা করেছিল আমার রুচির। বছর-খানেক পরে দুলাল বিল পাঠিয়েছিল—চল্লিশ টাকা পনেরো আনা।

রায় মশায় আমাদের পাড়ার বর্ধিষ্ণু লোক। সুতরাং এ পাড়ার অতি-পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, অপরিচিত সকলকেই প্রায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাইরের লোকও অনেক ছিল। শামিয়ানার তলায়, টিনের চেয়ারে, বৈঠকখানা-ঘরের বিস্তৃত ফরাশে, বারান্দায়, সামনের একটা তাঁবুতে—চতুর্দিকে গিজগিজ করছিল নিমন্ত্রিতের দল। কুলীর মাথায় নিকেলের ইলেকট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেট সহ আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। ভাগ্যে গেটে কেউ এসে আটকায় নি, কারণ যে কার্ডখানা গেটে প্রদর্শন করবার কথা সেটা আমি আনতে ভুলেছিলাম।

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, কন্‌সার্ট, লাল নীল হলুদ সবুজ ইলেকট্রিক আলোর সারি, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকরা-গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নজনিত চেঁচামেচি—সমস্তটা মিলে একটা প্রলাপ যেন।

খানিকক্ষণ পরে আর একটা প্রলাপ যে আমাকে শুনতে হবে—বংশীর প্রলাপ—তা তখন কে জানত!

২

বংশী যে প্রলাপ বকবে, তা বোধ হয় রাত্রিও জানত না, জানলে সে আমাকে নিয়ে যেত না সঙ্গে ক'রে। অবশ্য রাত্রি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, এটা ঠিক সত্য কথা নয়; আমিই তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কিছুই সম্ভব হ'ত না, যদি কান্তি পালের সঙ্গে দেখা না হ'ত।

অগ্রগামী কুলীর মাথায় নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেট নিয়ে রায় মশায়ের বিরাট বাড়ির চৌহদ্দিতে যেই আমি ঢুকলাম, অমনই দেখা হয়ে গেল কান্তি পালের সঙ্গে। সেদিন কান্তি পালের সঙ্গে ওই ভিড়ের মধ্যে দেখা হয়ে যাওয়াটাকে আমি এখন আর আকস্মিক ব'লে মনে করি না। আমার মনে হয়, নিয়তির এই চক্রান্তের মধ্যে কান্তি পালের স্থান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

কান্তি পাল লোকটি কান্তিমান লোক নন। রোগা বকের কত চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো,—কিন্তু নিয়মিতভাবে নয়, প্রত্যহ তো নয়ই। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে নগ্নগাত্রে একখানা ভিজে লাল গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে বীজন করছিলেন তিনি ম্যাগ্‌নোলিয়া-গ্রাণ্ডিফ্লোরা গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে। আমি তাঁকে দেখতে পাই নি। তিনিই এগিয়ে এসে বললেন, ডাক্তার যে, এস এস, কুলীর মাথায় ও কি?

উপহার একটা।

ও নিতু, ডাক্তারবাবুর এই জিনিসটা মাঝের হল-ঘরে রাখিয়ে দাও—বেশ সামনের দিকে রাখিয়ে দাও।

নিতু এসে কুলীটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। হল-ঘরে উপহারের একটা প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল।

কান্তি পাল বললেন, উঃ, রগ দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে আমার! আবার বনবন ক'রে গামছা ঘোরাতে লাগলেন এবং আমি কিছু বলবার আগেই বললেন, সকাল থেকে ক ব্যাটা উড়েকে নিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুনের সামনে —উঃ!

কান্তি পালকে আমি চিনি, তিনি আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছিলেন, তাও আমার অবিদিত ছিল না। বললাম, আপনি ব'লেই পারেন এ সব, আমরা হ'লে ম'রে যেতাম।

আর পারি না ভাই, বয়স তো হচ্ছে। চল, তোমাকে বসিয়ে দিইগে। ভিড়ের মধ্যে ঢুকো না, ও-ধারের বারান্দার কোণে একটা নিরিবিলি জায়গা আছে, সেখানেই চল। একটা ফ্যানও আছে সেখানে, আরামে বসতে পারবে।

তারপর যেতে যেতে বললেন, উঃ, মনে হচ্ছে, দুটো রগে দুটো ইস্ক্রুপ ক যেন প্যাঁচকষ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢোকাচ্ছে!

কান্তি পালের এই বৈশিষ্ট্য। শিবহীন যজ্ঞ বরং সম্ভব, কিন্তু এ পাড়ায় কান্তি-পাল-হীন 'যগ্যি' অসম্ভব। সকাল থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি রান্নাবান্নার তদারকের ভার নিয়ে এগিয়ে যাবেন। তারপর যত বেলা বাড়তে থাকবে, কান্তি পাল তত গম্ভীর হতে থাকবেন এবং ক্রমশ চেনা-শোনা যার সঙ্গে দেখা হতে থাকবে, তার কাছেই চুপি চুপি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে নিজের একটা না একটা শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ ক'রে 'ক্যাসাবিয়াঙ্কা'-মার্কা এমন একটা নিদারুণ রকম আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন (গোপনে গোপনে কিন্তু) যে, শ্রোতাকে সহানুভূতি-মিশ্রিত দু-চারটে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতেই হবে। কান্তি পাল এর বেশি আর কিছু চানও না। অসুখের প্রতিকারকল্পে কেউ যদি কোন ব্যবস্থা করতে যায়, কান্তি পাল বলবেন, না, থাক্। সমস্ত দিন রান্নাঘরে ঘোরা-ফেরা করবেন, কিচ্ছু খাবেন না এবং রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে এক গ্লাস শরবত কিংবা বড় জোর একটা মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চ'লে যাবেন।

কান্তি পাল আমাকে নিয়ে গিয়ে যে স্থানটিতে বসিয়ে দিলেন, সে স্থানটি আমি এই ভিড়ের মধ্যে নিজে খুঁজে বার করতে পারতাম না এবং তা না পারলে পরবর্তী ঘটনাপরম্পরা আমার জীবনে ঘটত কি না সন্দেহ। আমার সহানুভূতিসূচক কথায় বিগলিত হয়ে কান্তি পাল যেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন সেটা অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা নয়। সেটা পেছন দিকে অন্দর-মহলের কাছাকাছি একটা স্থান। খুব পরদানশীনও নয়, খুব প্রকাশ্যও নয়। মেয়েরাও বসতে পারে, পুরুষেরাও বসতে পারে। সেখানে ছিল একটা গোল টেবিলের চারপাশে খান কয়েক চেয়ার, মাথার ওপরে একটা পাখা। আশপাশ দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল বটে, কিন্তু সেখানে থামছিল না কেউ। এই ভিড়ের বাড়িতে এমন একটা জায়গা পাওয়া ভাগ্যের কথা। ফ্যানটি খুলে দিয়ে কান্তি পাল মুচকি হেসে ব'লে গেলেন, ওদিক পানে চেয়ো না যেন।

তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশে চেয়ে দেখলাম, একটু দূরে একটি বিস্তৃত ঘরে নিমন্ত্রিতা ভদ্রমহিলারা সমবেত হয়েছেন। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠছে। তাঁরা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ মনে হ'ল, বুনো রামনাথের স্ত্রী এঁদের মধ্যে নেই। হাতে শাঁখা (এমন কি অভাবে লাল সুতো), সীমন্তে সিঁদুর, আর সাধারণ সাদাসিধে

সুতোর কাপড় প'রে যে মহিলা সগৌরবে নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন, এই মেকী প্রজাপতির দলে তিনি নিশ্চয়ই নেই। বুনো রামনাথের স্ত্রীর আত্মমর্যাদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কেবল তাঁর স্বামীর ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর, আর এই মেকী প্রজাপতিদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত কেবল তাদের স্বামীর উপার্জন কিংবা ধার করবার ক্ষমতার ওপরই নয়, সৎ-অসৎ ভদ্র-অভদ্র নানা উপায়ে সেটা জাহির করবার প্রচেষ্টার ওপর। এদের আত্মসম্মান পরিপুষ্ট হয় সোফা-সেটি-মোটর-বসন-ভূষণ কিনেই নয়, তা অধনী-অধন্যদের চোখের সামনে নানা ভাবে আস্ফালন ক'রে। অন্তরের ঐশ্বর্যের কথা কেউ আজকাল ভাবেই না, বাইরের ঐশ্বর্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড। তাই নানা রঙের কাপড় নানা ঢঙের গয়না প'রে, মুখে পাউডার ক্রীম ঘ'ষে, আন্তরিকতাবর্জিত হাসি হেসে প্রাণপণে সবাই অভিনয় ক'রে চলেছে। সবাই সবাইকে সমালোচনাও করছে মনে মনে, মুখের ভদ্র হাসিটুকু বজায় রেখে। কার স্বামী কেরানী এবং কার স্বামী সেই কেরানীর প্রভু, তা বোঝবার উপায় নেই তাঁদের স্ত্রীদের দেখে। গয়না-কাপড়ের দৌলতে সবাই রাজরাণী। পেট ভ'রে খায় না, মনুষ্যত্বের চর্চা করে না, যা কিছু রোজগার করে তা দিয়ে ঠুন্‌কো ঐশ্বর্যের সস্তা চাকচিক্য কিনে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে। বুনো রামনাথের স্ত্রী নিরলঙ্কৃত মর্যাদাবোধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হয়তো এক রকম কম্‌প্লেক্স; কিন্তু এই দরিদ্র পরাধীন দেশে গয়না-কাপড়-সর্বস্ব ঝুটো-আভিজাত্য-কম্‌প্লেক্সের চেয়ে দারিদ্র-কম্‌প্লেক্স ঢের বেশি শ্রেয় এবং সম্মানার্হ। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের চেয়ে ঢের কম রোজগার ক'রে ঢের বেশি সুখে ছিলেন, কারণ তাঁদের মর্যাদাবোধ আর্থিক ছিল না, আত্মিক ছিল। সুখে জীবনযাপন করবার জন্যেই অর্থ, অর্থের জন্য জীবনযাপন নয়—এ কথা আমরা ভুলে গেছি ব'লেই যে কোন ধনী দুরাত্মার কাছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে মাথা নোয়াতে পেলে ধন্য হয়ে যাই।

পলাশীর যুদ্ধ…রামমোহন রায়…বিদ্যাসাগর…বঙ্কিম…বিবেকানন্দ…রবীন্দ্রনাথ…একশো তিরাশি বছর মনের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে পার হয়ে গেল।

দিস ইজ ক্যালকাটা কলিং—

চাল-ডালের দর থেকে আরম্ভ ক'রে বড় বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের সংবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সেতারে কানাড়ার আলাপ, মধ্যযুগের সাধনা, আবৃত্তি, নাটক, ফুটবলখেলার ফলাফল তারস্বরে একের পর এক শূন্যে চিৎকার

ক'রে মরছে—পানবিড়ির দোকানেও, মহারাজার প্রাসাদেও। আর এই গান! বাংলা ভাষা যারা বোঝে না তারা হয়তো ভাবে, বাংলা দেশ জুড়ে মড়াকান্না উঠেছে। কিন্তু কাঁদবে কে? একটা মড়া কি আর একটা মড়ার শোকে কাঁদে কখনও? কান্না নয়, গানই হচ্ছে, ভাষা বুঝলে গানের কথায় মুগ্ধ হয়ে যেত—কেউ মরে নি, সবাই বেঁচে আছে এবং এত আনন্দে আছে যে, অষ্টপ্রহর গান গাইছে সবাই।

টর্চের আলো নিবিড় অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে দেয় যেমন ক'রে, আমার মনের তমিস্রাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাশের ঘরে তেমনই ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, কে আপনি? সবিতা দেবীর বাড়িতে স্বর্ণেন্দুবাবু খবর পাঠিয়েছেন? রাত্রিকে ডাকছেন? কি বলব তাঁকে? একা রুগী সামলাতে পারছেন না? আচ্ছা, আমি দেখছি। যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনি ওদিকের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাঁকে আমি দেখতেই পেলাম না। আমার মনে পর পর হুটো অসংলগ্ন চিন্তা জাগল—রায় মশায়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি···রাত্রির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হঠাৎ উঠে বারান্দার সিঁড়িটা দিয়ে হনহন ক'রে আমি লনে নেমে গেলাম, সম্ভবত সিঁড়িগুলো সামনে ছিল ব'লেই। লনের ওধার দিয়ে এক ছোকরা ট্রেতে সাজিয়ে শরবত নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, রায় মশায় কোথায় বলতে পারেন?

তিনি গেস্ট-হাউসে রয়েছেন। দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার আছেন কিনা সেখানে।

ছোকরা চ'লে গেল।

যদিও রায় মশায়ের নিমন্ত্রণে এসেছিলাম, তবু—কিন্তু না, দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার থাকতে রায় মশায় আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সময় নষ্ট করবেন—এ কথা চিন্তা করাও অন্যায়, হলামই বা আমরা নিমন্ত্রিত। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে লোকের অভাব নেই তো। এতবড় একটা রাজসূয় ব্যাপারে জনে জনে প্রত্যেককে আপ্যায়িত করা রায় মশায়ের পক্ষে সম্ভব কি? আর, তা ছাড়া, আর একটা কথাও কি সত্য নয় যে, আমাকে নিমন্ত্রণ না করলে কিংবা আমি না এলে, এ উৎসব এতটুকু অসম্পূর্ণ থাকত না? আমাকে অনুগ্রহ করেন ব'লেই নিমন্ত্রণ করেছেন, না করলেও পারতেন।

সমস্ত তিক্ততা মুহূর্তে মাধুর্যে রূপান্তরিত হ'ল।

নমস্কার। আপনিও এসেছেন দেখছি।

চেয়ে দেখি, রাত্রি নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে, মুখে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা। তার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটির রঙ এত অদ্ভুত রকম ফরসা যে, হঠাৎ দেখলে ইহুদী ব'লে সন্দেহ হয়। তখন আমি জানতাম না, রাত্রি বিনা-নিমন্ত্রণেই এ বাড়িতে এসেছিল এই সবিতাকে দেখবে ব'লে। সবিতার বাড়ি গিয়ে দেখা পায় নি, সবিতা এখানে চলে এসেছিল নিমন্ত্রণ-রক্ষা করবার জন্যে, রাত্রিও খোঁজ নিয়ে এসেছিল। সবিতা ও রাত্রি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল—হ্যাঁ, সেই পুরাতন উপমাটাই ব্যবহার করছি—ঠিক যেন আলো আর অন্ধকার। রাত্রির মুখভাবে সেদিন অতি-ভদ্র অতি-মোলায়েম শিষ্টাচারমসৃণ যে স্নিগ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা যে অন্তরোৎসাহিত নয়, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না সেদিন। দেশলাই-কাঠির কালো মাথাটার ভেতর আগুন যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, রাত্রির মধ্যেও সেদিন তেমনই আগুন লুকনো ছিল, আমি বুঝি নি। সবিতার সঙ্গে রাত্রির যে সেদিন প্রথম আলাপ, রাত্রি নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, তাও আমি জানতাম না। কাল সকালে জ্যোতির্ময় এসে রাত্রিদের সঙ্গে একবার মাত্র দেখা ক'রে এই সবিতাদের বাড়িতেই উঠবে—এ কথাও তখন আমার অজ্ঞাত ছিল। রাত্রি দেখতে এসেছিল সবিতা মেয়েটি কেমন, একটা চুম্বক আর একটা চুম্বকের শক্তি-নির্ধারণ করতে এসেছিল।

আপনারা মধুপুর থেকে কবে এলেন?

দিন চারেক আগে।

রাত্রি না হয়ে যদি অপর কেউ হ'ত, তা হ'লে এই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খবরও বলত। আমার প্রশ্নটির উত্তরটুকু মাত্র দিয়ে রাত্রি চুপ ক'রে রইল। আমি চেয়ে দেখলাম, সে সবিতার মুখের পানে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে, এবং সবিতা মেয়েটি অস্বস্তি ভোগ করছে সেজন্যে। আমিও কম অস্বস্তি ভোগ করছিলাম না। এর পর কি করব, কি কথা ব'লে আলাপটাকে স্বাভাবিক-ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাব, তাই ভাবছিলাম (রাত্রির সামনে বরাবরই আমার এমনই বাক্‌সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে), এমন সময় নিতু একটা কার্ড আর লাল পেন্সিল নিয়ে হাজির হ'ল।

আপনার নামটা কাইন্‌ডলি বলুন না!

কেন?

আপনার দেওয়া আইস্‌ক্রীম-সেটটার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে দোব।

সবিতা জিজ্ঞাসা করলেন, উপহারগুলো কোথায় রাখা হয়েছে, আমরা একবার দেখতে পাই না ?

ওই যে, বাঁ দিকের ঐ হলটায়। আসুন না!

সকলে নিতুর অনুসরণ করলাম।

উপহার প্রদর্শনীর বর্ণনা ক'রে সময় নষ্ট করতে চাই না, মনিহারী দোকানে যত রকম জিনিস পাওয়া যায়, সবই ছিল সেখানে। রাত্রি নিকেলের ইলেক্‌ট্রো-প্লেটেড আইস্‌ক্রীম-সেটটা দেখে (নিতু আমার নাম-লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিচ্ছিল তখন) দুটি কথা মাত্র বলেছিল—বেশ জিনিসটি। তারপর হঠাৎ সবিতার দিকে ফিরে বলেছিল, ইনি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার। নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পর মামুলি প্রথায় দু-চারটে শিষ্টবাণীর আদান-প্রদানও হয়তো চলত, কিন্তু হঠাৎ পাশের দুয়ারের পর্দা ঠেলে ব্যস্তবাগীশ-গোছের মালকোঁচামারা ঘর্মসিক্ত ঢিলে-গেঞ্জি গায়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে পড়লেন এবং সবিতা দেবীকে সামনে পেয়ে বললেন, ও, সবিতা, তুমি এদিকে চ'লে এসেছ, সুবর্ণপ্রভাকে আমি আবার ভেতরের দিকে পাঠালাম তোমার খোঁজে। এখনই তোমাদের বাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক ফোন করছিলেন, রাত্রি ব'লে একজন মেয়েকে, আই মীন—মহিলাকে, স্বর্ণেন্দুবাবু ব'লে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। বললেন তিনি রুগীকে সামলাতে পারছেন না। আমি তো রাত্রি ব'লে কাউকে খুঁজেই পাচ্ছি না।

ইনিই রাত্রি দেবী।

ও, নমস্কার।

ভদ্রলোককে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে রাত্রি বললে, এখুনি যাচ্ছি আমি।

আমি কর্তব্যের অনুরোধেই সম্ভবত প্রশ্ন করলাম, বাড়িতে কারও অসুখ নাকি ?

বংশীদার জ্বর হয়েছে।

হঠাৎ ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়বার ভান করলাম।

ও, বলেন তো আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

বেশ তো, আসুন।

বেশ মনে পড়ছে, সবিতার দিকে ফিরে রাত্রি বলেছিল, কাল ভোরেই

জ্যোতির্ময়বাবু আসছেন, বেলা দশটা নাগাদ আপনাদের বাড়িতে যাবেন। আপনি যে আগেই চিঠি পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না, তাই খবরটা দিতে এসেছিলাম।

হাস্যদীপ্ত চক্ষে সবিতা বললেন, অনেক ধন্যবাদ।

উপহার-প্রদর্শনী-হল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা দুজনে।

৩

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেকট্রিক আলো, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, শামিয়ানার তলায় ভোজননিরত নিমন্ত্রিতের দল, পরিবেশনের গোলমাল, রেডিওর নিনাদ কয়েক মুহূর্তের জন্য ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল যেন আমার চোখের সামনে থেকে; মনে হ'ল, কেউ কোথাও নেই, রাত্রি আর আমি পাশাপাশি চলেছি। মুহূর্তগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। মনে হচ্ছিল, যেন একটা সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়ে নিবিড় অন্ধকার রজনীতে পাশাপাশি চলেছি দুজনে, রাত্রির অঞ্চলতলে শঙ্কিত ভীরু দীপশিখা, —বাতাস উঠেছে···। সহসা রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেকট্রিক আলো, কুকুরের চিৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের চিৎকার, পরিবেশনের কলরব, রেডিওর নিনাদ সব আবার একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন আমার সচেতন মনের ওপর। দেখলাম, রাত্রি ঝুঁকে তার স্যাণ্ডালের স্থানচ্যুত স্ট্র্যাপটাকে বাঁধছে। রায় মশায়ের বাড়ির হাতা থেকে বেরিয়ে গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হঠাৎ দুলাল সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, টাকা পাঁচটা পকেটে আছে, ট্যাক্সি ডাকলাম।

ট্যাক্সিতে তার সঙ্গে আমার দুটি কথা হয়েছিল।

নতুন কোন বই শুরু করেছেন নাকি আর?

না।

যে বংশীর অসুখের সংবাদে চিন্তিত হয়ে হিতৈষীর ছদ্মবেশে বিনা আহ্বানেই যাচ্ছিলাম, সেই বংশীর অসুখের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই উঠল না কোন দিক থেকে। নীরবেই ব'সে রইলাম দুজনে। আলোকোজ্জ্বল বড় বড় বাড়ি পেছনে ফেলে চলেছিলাম। ফুটপাথের জনতা থেকে একটি মেয়ের কলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত

হাসি শুনতে পেয়েছিলাম মনে আছে; কোণের অন্ধ ভিখারীটা তখনও হাত পেতে ব'সে ছিল; ট্রামের ঘণ্টা, রিক্‌শা, হকারের চিৎকার, রাস্তার বিচিত্র জনতা রোজ যেমন থাকে সেদিনও তেমনই ছিল। আমিই ঠিক তেমনই ছিলাম না। রাত্রিকে পাশে বসিয়ে ট্যাক্সি ক'রে ছুটছিলাম আমি।···একটু পরে রাত্রির নির্দেশ অনুসারে থামল ট্যাক্সিটা। ভাগ্যে থামল! আর কিছুক্ষণ চললে আমি বোধ হয়—মানে, ট্যাক্সি থেকে যখন নামলাম, মনে হ'ল, নক্ষত্রলোক থেকে নামলাম।

এক পাশে একটা ডাস্টবিন আর এক পাশে একটা ল্যাম্প-পোস্ট, মাঝখানে গলিটা। অন্ধকার সরু একটা অন্ধ গলি। সেই গলির অপর প্রান্তে ছোট দ্বিতল বাড়িখানা, দেখতেই পাওয়া যায় না গলির এ প্রান্ত থেকে।

আসুন।

কপাট খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ, তারপর একটি তরুণীর মুখ, তারপর তার গৈরিক বসন। হ্যাঁ, প্রথমে তরুণীই মনে হয়েছিল তাঁকে আমার। তখনও ভাবতেই পারি নি যে, ইনি স্বর্ণেন্দুর মা, রাত্রির মা। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল, রাত্রির সমবয়সী। আমাকে দেখেই তাঁর চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। অতিশয় কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে বাবা তুমি?

আমি স্বর্ণেন্দুর বন্ধু ঘনশ্যাম। শুনলাম, বংশীর অসুখ—

এস বাবা, এস। এখুনি তোমার কথা বলছিল স্বর্ণেন্দু।

রাত্রি কোন কথা না ব'লে কারও দিকে না চেয়ে ভেতরে চ'লে গেল। স্বর্ণেন্দুর মা খানিকক্ষণ স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, আমি স্বর্ণেন্দুর মা।

প্রণাম করলাম আমি।

হয়তো আমার সদ্য-লব্ধ জ্ঞানের ফলেই আমার দৃষ্টির তারতম্য ঘটল। প্রণামান্তে চোখ তুলে যখন চাইলাম, তখন মনে হ'ল, তাঁর মুখের তরুণী-ভাবটা যেন তিরোহিত হয়েছে। অন্তরালবর্তিনী বৃদ্ধাকে যেন দেখা যাচ্ছে। নিটোল মুখখানি যদিও জরালেশহীন (পদ্মপত্রে জলের দাগ পড়ে না, আকাশের গায়ে মেঘের মলিনতা লেপটে থাকতে পায় না), তবু কিন্তু কোথায় যেন, খুব সম্ভবত চোখের দৃষ্টিতেই, তাঁর আসল বয়সের পরিচয় পেলাম। পরে এই মহিলার জীবন-রহস্যের যতটুকু আবিষ্কার করেছি, যদিও তার অধিকাংশই হয়তো আমার কল্পনা, কারণ মাত্র একখানা চিঠির টুকরো টুকরো কথা থেকে

নিঃসংশয়ে কতটুকুই বা জানা যায়, ডি. কে-র কথাই বা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা কে জানে! তা ছাড়া তার মুখ থেকে সব ঘটনাটা আমি শুনিও নি। রাখালবাবু পূর্ণেন্দুবাবু জ্যোতির্ময় নামে অন্য লোক থাকাও যুক্তির দিকে অসম্ভব নয়—যাই হোক, যতটুকু আবিষ্কার করেছি ব'লে আমার বিশ্বাস, এবং যে বিশ্বাসের জোরে রাত্রির সমস্ত দুষ্কৃতি সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা সম্ভবপর হয়েছিল আমার পক্ষে—সেদিন সে রহস্যের আভাস স্বর্ণেন্দুর মায়ের চোখে দেখেছিলাম যেন। সেই চির-পুরাতন চির-নূতন রহস্য, সর্বযুগের সর্বস্তরের নারীর দৃষ্টিতে যার কুণ্ঠিত বা অকুণ্ঠিত প্রকাশ সর্বযুগের সর্বস্তরের পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে নানা ভাবে।

এই সামনের ঘরটাতেই আছে স্বর্ণেন্দু। যাও, ভেতরে যাও তুমি।

পাশের সিঁড়ি বেয়ে তিনি দোতলায় উঠে গেলেন। এমন নির্বিকারভাবে গেলেন, যেন এ বাড়ির তিনি কেউ নন, কিংবা যেন সমস্তই তাঁর এত জানা, এমন নখদর্পণে যে, এ সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র কৌতূহল তাঁর অবশিষ্ট নেই, এমন কি এই সব কেন্দ্র ক'রে শিষ্টাচার করাও যেন তাঁর পক্ষে ক্লান্তিজনক।

দ্বার ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই স্বর্ণেন্দুর বাবার মুখখানা চোখে পড়ল, আধখানা মরা আধখানা জীবন্ত মুখ। দ্বার খোলার শব্দে জীবন্ত চোখটা খুলে গেল, সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর আবার বুজে গেল চোখটা, নীরবে যেন তিনি বললেন, ও, বুঝেছি। ঘরে আর কেউ নেই। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। রকেটের মত ছুটে বেড়াতেন যিনি, যাঁর সুনীতি-দুর্নীতি পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে, তা বল্‌শেভিক রাশিয়াতেও চলবে কি না সন্দেহ, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিছানায় প'ড়ে আছেন— নির্বাক, নিসঙ্গ, ছেলে মেয়ে স্ত্রী কেউ কাছে নেই। এ রকম করুণ দৃশ্য আমার ডাক্তারী জীবনে আরও দেখেছি। বাড়ির কর্তা হঠাৎ যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যা নেন, তখন তাঁকে ঘিরে কিছুকাল চিকিৎসার সমারোহ হয়, যার যেমন সঙ্গতি সেই অনুসারে। তারপর ক্রমশ সব থেমে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে অনিবার্য দুর্ঘটনাটা সকলের গা-সওয়া হয়ে আসে, আত্মীয়-স্বজনের স্নায়ু-কেন্দ্রে উত্তেজনা সঞ্চার করবার মত তীব্রতা আর তাতে থাকে না। তখন অসহায় চলচ্ছক্তিহীন শয্যাশায়ী বৃদ্ধের সেবা করাটা ক্রমশ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানেরে মত নিয়ম-রক্ষাগোছ কর্তব্যে পরিণত হয়। ঠাকুরের সঙ্গে শয্যাশায়ী

কর্তার কিন্তু অনেক তফাত। সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে বিলম্ব হ'লে মাটির ঠাকুর প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু সেবার ত্রুটি ঘটলে (এবং অনেক সময় সেবার ত্রুটি ঘটেছে কল্পনা ক'রে নিয়ে) পক্ষাঘাতগ্রস্ত কর্তা অসন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেবক-সেবিকারাও—হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলে মেয়েরাই—বিরক্ত হয়ে ওঠেন দেখেছি। কতদিন আর একটানা রাত্রি জাগা যায়, বার বার কতবার বিছানা বদলাতে পারে মানুষে,—হ'লই বা স্বামী, হ'লই বা বাবা—মানুষের, রক্তমাংসের মানুষের, সহ্যের সীমা আছে তো! পুত্রও তখন পিতাকে রূঢ়ভাষণ করে, সতী রমণীর মুখ দিয়েও যে বাক্য নির্গত হয় তা রমণীয় নয়। আমার মনে একটা কথা জাগছিল, মধুপুর ছেড়ে কলকাতা শহরের এই এঁদো গলিতে চ'লে এলেন কেন এঁরা? পরে জেনেছি, আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বর্ণেন্দু যখন তার মাকে মথুরা থেকে আনতে গিয়েছিল, তখন তাঁকে বলে নি যে, মধুপুরে জ্যোতির্ময়ের বাড়িতেই যাচ্ছে তারা; এবং তিনি পূর্ণেন্দুবাবুর সম্বন্ধে এত নির্বিকার ছিলেন যে, কৌতূহলও তেমন প্রকাশ করেন নি তখন,—পূর্ণেন্দুবাবু সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহলই যেন অবসান হয়ে গিয়েছিল তাঁর। স্বর্ণেন্দুর মা জানতেন, জ্যোতির্ময়ের বাড়িতে ভাড়াটে আছে এবং জ্যোতির্ময় মেতে আছে তার চিত্র-প্রদর্শনী নিয়ে কলকাতায়। ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়েছে—জ্যোতির্ময় ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিয়েছে, চিত্র-প্রদর্শনীর দরজায় তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চ'লে এসেছে, এ সব কিছুই জানতেন না তিনি। যেদিন জানতে পারলেন, সেই দিনই তিনি মথুরা থেকে চ'লে এলেন এবং এমন সব কাণ্ড করতে লাগলেন, এমন ঘন ঘন ভর হতে লাগল তাঁর যে, স্বর্ণেন্দু বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে চ'লে এল কলকাতায়। আমার মনে হয়, স্বর্ণেন্দু যদি সমস্ত ব্যাপারটা মথুরাতেই মাকে খুলে বলত, এত কাণ্ড হ'ত না, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আর রাত্রি এতদিন একসঙ্গে থাকবার সুযোগ পেত না। এ কথা শোনামাত্র প্রবল আপত্তি করতেন তিনি, এবং তাঁর প্রবল আপত্তির বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু, জ্যোতির্ময়, রাত্রি কেউ দাঁড়াতে পারত না। স্বর্ণেন্দু ভেবেছিল, মাকে ভুলিয়েভালিয়ে কোনরকমে এনে ফেলতে পারলে হয়তো তিনি বুঝবেন সব, হয়তো তিনি রাত্রি আর জ্যোতির্ময়ের মেলামেশা দেখে বিয়ে দিতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু ভুল ভেবেছিল স্বর্ণেন্দু, নিজের মাকে সে চিনত না। কজনই বা চেনে? গাছ কি মাটিকে ভাল ক'রে চেনে? মাটির সব দৈন্য-ঐশ্বর্যের খবর রাখে? সে শুধু মাটির রস চেনে, যা শোষণ ক'রে সে বড় হয়।

পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত-চোখটা আবার খুলে গেল। শুধু খুলে গেল নয়, ক্রমশ বড় হতে লাগল, মনে হ'ল, ছুটে এসে বুলেটের মত আঘাত করবে আমাকে এখুনি। যদিও মৃত চোখটা সঙ্গে সঙ্গে মিনতি করছিল, তবু আমি সামনের দেওয়ালে পরদা-ঢাকা যে দরজাটা ছিল, সেইটে দিয়ে দ্রুতপদে ঢুকে পড়লাম পাশের ঘরটাতে।

খুব লম্বা সরু গোছের ঘরটা, কমানো টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলোকে ঈষৎ আলোকিত। ঘরের অপর প্রান্তে একটা খাটে বংশী শুয়ে ছিল, তার মাথার শিয়রে ব'সে ছিল স্বর্ণেন্দু। তার গোঁফ-দাড়ি-সমাকীর্ণ আনত মুখখানাতে সস্নেহ সেবা-পরায়ণতা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। স্বল্পালোক সত্ত্বেও আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম, আমার ভুল হয় নি। ভুল হয় নি ব'লেই প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও আমি জানি, স্বর্ণেন্দু নির্দোষ। আমি এগিয়ে যেতেই স্বর্ণেন্দু চোখ তুলে চাইলে, তারপর একটু হাসলে—ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার—তারপর বললে, আয়, ব'স।

বসলাম।

কি হয়েছে বংশীর, কে দেখছে?

কোন ডাক্তার ডাকি নি এখনও। এসেই কম্প দিয়ে জ্বর এল, ভাবলাম, ম্যালেরিয়া, দু-একদিনে সেরে যাবে, কিন্তু আজ বিকেল থেকে কেমন যেন—

কম্প দিযে জ্বর, নিশ্বাসের দ্রুত-গতি এবং প্রলাপ দেখে সন্দেহ হ'ল লোবার নিউমোনিয়া। বংশী বিড়বিড় ক'রে বকছিল, হঠাৎ জোরে জোরে ব'লে উঠল, তোমার বয়স কত, তা আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধে ওসব কিছু জানতে চাই না আমি, আমি তোমাকে চাই। কোথায় রাতু! রাতু! আবার খানিকক্ষণ বিড়বিড ক'রে কি খানিকটা ব'লে গেল। তারপর আবার জোরে —হ্যাঁ, দিয়েছিলে, একদিন তো দিয়েছিলে, কেন দিয়েছিলে, কেন?—উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে উঠতে গেল, স্বর্ণেন্দু শুইয়ে দিলে জোর ক'রে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, হঠাৎ চোখে পড়ল, অন্ধকারে রাত্রিও ব'সে আছে বিছানার ও-পাশটায় বংশীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। চোখে অদ্ভুত একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলাম তিনজনেই। বংশী কখনও বিড়বিড় ক'রে কখনও জোরে জোরে প্রলাপ বকতে লাগল। ঠিক কতক্ষণ যে ব'সে ছিলাম, এসব শুনে ঠিক সেই সময়ে মনে কি কি ভাবোদয় হয়েছিল, তা এখন

ভাল ক'রে মনে নেই। এর পর যে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে তা এই—স্বর্ণেন্দু রাত্রিকে বলছিল, ভোরে জ্যোতির্ময়কে তুই কি স্টেশন থেকে আনতে যাবি? সে তো এ বাসা চেনে না।

যাব।

স্বর্ণেন্দু স্নেহভরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাত্রির দিকে। শুধু স্নেহ নয়, একটা মুগ্ধ ভাবও যেন লক্ষ্য করেছিলাম তার চোখে। বিছুটির পুর্ণ-পুষ্পিত রূপটি হয়তো দেখেছিল সে তখন।

হঠাৎ বংশী ব'লে উঠল, ইজিপ্টে ভাই-বোনে বিয়ে হ'ত—

রাত্রির নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি আরও হিংস্র হয়ে উঠল।

বংশী প্রলাপ বকছে।

জ্যোতির্ময় কয়েক ঘণ্টা পরেই এসে পড়বে।

এর পর সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা যদিও এই অধ্যায়েরই বিষয়বস্তু, পর পর ঘটেছিল, সুতরাং একসঙ্গেই বর্ণনীয়, কিন্তু তাদের গুরুত্ব এত বেশি, এবং শুধু লেখক হিসাবেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমি এ কাহিনীর সঙ্গে এমন বিজড়িত যে, একটানা লিখে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় ব'সে আছি। সার্শির লাল নীল সবুজ বেগুনী নানা রঙের কাচের ভেতর দিয়ে একই সূর্যালোক নানা বর্ণে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে আমার খাতার ওপর। একই সূর্যালোক! সবিস্ময়ে এই কথাটাই ভাবতে ইচ্ছে করছে বার বার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি পরবর্তী একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সেই কারণে করতে চাই, যে কারণে মহাভারতের সম্ভব-পর্বে অলৌকিক-ধীশক্তি-সম্পন্ন, অযুত-নাগেন্দ্র-সদৃশ বলবান, সুবিদ্বান, মহাবীর্য, মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধ হবার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়েছিলেন, মহাভারতকার বলেছেন, মায়ের দোষে। সত্যবতী যদিও

পুত্রবধূ অম্বিকাকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন—তোমার এক দেবর আছেন, আজ রাত্রে তিনি তোমার নিকট আসবেন, তুমি অপ্রমত্তা হয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা ক'রো ; কিন্তু অম্বিকা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন নি। দীপশিখার প্রদীপ্ত আলোকে কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটা-ভার, বিশাল শ্মশ্রু দেখে ভয়ে বিস্ময়ে চক্ষু দুটি নিমীলিত ক'রে ফেলেছিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ হতে হয়েছিল। অন্ধতা-প্রযুক্ত তিনি যা করেছিলেন, তার জন্যে দায়ী তাঁর মা—অম্বিকা।

সেদিন শেষরাত্রে জ্যোতির্ময়কে স্টেশন থেকে আনতে যাবার মুখে রাত্রি আমার বাসায় এসেছিল কয়েক মিনিটের জন্যে। স্টেথোস্‌কোপ প্রভৃতি নিয়ে রীতিমত চিকিৎসক-বেশে আমি দ্বিতীয় বার যখন বংশীর চিকিৎসা-উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়েছিলাম, তখন আমার ঠিকানা আর ফোন-নম্বর দিয়ে ব'লে এসে-ছিলাম, একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, প্রলাপটা যদি না কমে, খবর দিও। সেই ঠিকানার সহায়তায় রাত্রি এসেছিল ভোরবেলা।

মনে দুশ্চিন্তা ছিল, মোহ ছিল, পেটে ক্ষুধাও ছিল প্রচুর (কারণ রায় মশায়ের বাড়িতে খাওয়া হয় নি এবং সে কথাটা গোকুলকে অত রাত্রে বলবার সাহস হয় নি), তবু এসে শোওয়া মাত্র আমি অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শুধু তাই নয়, স্বপ্নও দেখেছিলাম একটা। যেন প্রকাণ্ড একটা দিগন্তবিস্তৃত জলাশয়, কিন্তু তাতে জল নেই, আছে খালি কাদা—কাদা যে আছে তাও দূর থেকে বোঝা যায় না ; মনে হয়, শক্ত জমি ; স্থানে স্থানে সবুজের আভাস আছে, কিন্তু তার ওপর দিয়ে চলতে গেলেই হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে যায়। সেই নির্জলা জলাশয়ের ওপর দিয়ে আমি আর রাত্রি যেন চলেছি, বার বার হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে যাচ্ছে। রাত্রি আমার ওপর ভর দিয়ে পঙ্ককুণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে, কিন্তু তার দৃষ্টি আমার দিকে নেই, নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে আছে শূন্য দিগন্তের পানে।

হঠাৎ কড়কড় ক'রে দুয়ারের কড়াটা ন'ড়ে উঠতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম আমি। নেবে গেলাম। কপাট খুলেই দেখি, রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা স্যুটকেস। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল সে, আমিও চেয়ে রইলাম।

বংশী কি এখনও প্রলাপ বকছে ?

থেমে গেছে।

অতি সাধারণ ব্রোমাইডে এত তাড়াতাড়ি এমন ফল পাওয়া যাবে, তা যদিও আম প্রত্যাশা করি নি ; তবু আত্মপ্রসাদে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

আপনি কি জ্যোতির্ময়বাবুকে আনতে হাওড়া যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ। এই সুটকেসটা আপনার এখানে রেখে যেতে চাই। আপনার কি কোন অসুবিধে হবে ?

না, কিছুমাত্র না।

একটা সুটকেস হাতে ক'রে জ্যোতির্ময়বাবুকে আনতে যাবার হেতু কি এবং হেতু থাকলেও মধ্যপথে সে সুটকেস আমার বাসায় রেখে যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন—এই সব অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন আমার মনে জাগে নি তখন। আমি সেদিন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, বাস্তব জগতের সঙ্গতি-অসঙ্গতির কোন অর্থ ছিল না আমার কাছে। এখন জেনেছি, পাছে পুলিসের হাতে চিঠিখানা পড়ে, এই ভয়েই সে সুটকেসে চিঠিখানা ভ'রে নিয়ে এসেছিল, তারপর মাঝরাস্তায় তার মনে হয়েছিল, জ্যোতির্ময় যদি চিঠিখানা দেখে ফেলে! চিঠিখানা সে নষ্ট ক'রে ফেলে নি কেন, তা এখনও আমি ভেবে পাই না। বোধহয় চিঠিখানা রেখেছিল নিজের ধর্মপরায়ণা মায়ের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল স্বরূপ, অবশ্য এ সব আমার কল্পনা।

রাত্রি চ'লে গেল। স্টেশন থেকে জ্যোতির্ময়কে নিয়ে আর ফেরে নি সে। সবিতার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের দেখা হবার সুযোগই সে দেয় নি। ফিরেছিল মাস চারেক পরে। জ্যোতির্ময় সঙ্গে ছিল না, সঙ্গে ছিল অবনীশ। অবনীশও বেশিক্ষণ থাকে নি, রাত্রিকে রেখে সে পরের ট্রেনেই ফিরে গিয়েছিল বম্বেতে। ব্যবসায়ী লোক সে, নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে ছিল না।

যে সুটকেস রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল · হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের মুখটা মনের মধ্যে জেগে উঠছে আমার। আচ্ছা, কেন এমন হয় বলতে পারেন, একটা কথা ভাবতে ভাবতে অতর্কিতে আর একটা কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে, একটা ছবিকে আড়াল ক'রে আর একটি ছবি নিজেকে জাহির করতে চায় ? জ্যোতির্ময়কে আমি দেখি নি কখনও, কিন্তু তার কথা শুনেছি অনেক। যখনই আমি তাকে কল্পনা করি তখনই দেখি, সে যেন খুব দামী বিরাট একখানা মোটর 'ফুল স্পীডে' হাঁকিয়ে চলেছে। প্রকাণ্ড ভারী ফরসা মুখে টানা টানা চোখ, কালো সরু লম্বা একটা সিগারেট-হোল্ডার মুখের এক কোণে কামড়ে ধ'রে আছে, হু-হু শব্দে মোটর ছুটে চলেছে, মাথার বিস্রস্ত চুলগুলো

উড়ছে, স্টিয়ারিং ধ'রে সামনের দিকে চেয়ে ব'সে আছে জ্যোতির্ময়। সে আশপাশের কাউকে দেখছে না, গাড়ির ভালমন্দর দিকেও তার লক্ষ্য নেই, পাশে কে ব'সে আছে তাও তার খেয়াল নেই—সে ফুল স্পীডে খালি ছুটে চলেছে।

সেদিন যে স্যুটকেসটা রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল, তা আমি প্রায় তিন মাস পরে খুলেছিলাম, মানে—খুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাতে রাত্রিরই দু-একখানা কাপড় শেমিজ ব্লাউজ ছিল, আর ছিল একখানা চিঠি। রাত্রির মায়ের চিঠি, পুর্ণেন্দুবাবুকে লেখা। সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি চিঠিখানার কথা বলতে চাই। অবশ্য চিঠিখানা যে পুর্ণেন্দুবাবুকেই লেখা, চিঠিতে তার কোন প্রমাণ নেই, চিঠিতে 'শ্রীচরণেষু' ছাড়া অন্য কোন সম্বোধনই ছিল না। তবু কিন্তু চিঠির ধরন-ধারণ, তাতে ফার্নান্ডিজের উল্লেখ, অনুতাপ-মিশ্রিত একটা ক্ষুব্ধ আকূতি, আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি—অবশ্য কল্পনায়—যে, চিঠিখানা পুর্ণেন্দুবাবুকেই রাত্রির মা লিখেছিলেন। আদালতে হয়তো এ কথা প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার অন্তর্যামী এ বিষয়ে নিঃসংশয়।

আমার গোকুলচন্দ্র ছুটি না নিলে এ আবিষ্কার সম্ভবপর হ'ত না। শুধু তাই নয়, গোকুল যদি নীলুর চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিমান আর কাউকে দিয়ে যেত, তা হ'লেও হযতো হ'ত না। তৃতীয় এবং সর্বপ্রধান যে কারণে এই 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হয়েছিল, সেটা হচ্ছে গযাতে হঠাৎ আমার বাল্যবন্ধু ডি. কে.-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অদ্ভুত রকম যোগাযোগ সেটা। আমার কলকাতারই এক বড়লোক মক্কেল গয়ায় গিয়েছিলেন পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করতে। গয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং গয়ার চিকিৎসকদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে না পেরে (অদ্ভুত জিনিস এই আস্থা !) আমাকে টেলিগ্রাম করলেন। আমি এলাম, চিকিৎসা করলাম, নিজের জীবনীশক্তির জোরেই বোধ হয় তিনি সেরে উঠলেন। আমি কিছু সুনাম এবং অর্থ নিয়ে সানন্দে ফিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময হঠাৎ রাস্তায ব্যায়ামবীর ধীরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা। ধীরেনের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার আরও দু-একবার দেখা হয়েছিল, মাঝে মাঝে সে দু-একবার আমার বাসায় এসেছে গেছে, সুতরাং এক নজরেই দুজনে পরস্পরকে চিনতে পারলাম। সাধারণ কাপড়-জামা প'রে থাকলে ধীরেনকে ব্যায়ামবীর ব'লে চেনবার যেমন উপায় নেই, তার নেপালী-ধরণের শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডলের

মৃদু হাসি দেখেও তেমনই বোঝবার উপায় নেই যে, ছোকরা ভীষণ রকম একগুঁয়ে। মাথায় একবার একটা ধারণা ব'সে গেলে আর নড়তে চায় না। গয়ার ধূলিধূসর রাস্তায় আমাকে দেখতে পেয়ে ডি. কে. থমকে খানিকক্ষণ দাঁড়াল, ক্ষণকাল কি চিন্তা করল এবং পর-মুহূর্তেই উল্লসিত হয়ে উঠল— আমার অপ্রত্যাশিত দর্শন লাভ ক'রে নয়, অন্য কারণে। গয়ায় আমার আগমনের কারণ খুলে বলতেই, 'অদ্ভুত যোগাযোগ তো' এই কথা কটি উচ্চারণ ক'রে ডি. কে. আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করলে। অর্থাৎ সে সঙ্গে সঙ্গে কৃতনিশ্চয় হয়ে গেল যে, আমি নির্ঘাত ওর সঙ্গে তাজমহল দেখতে আগ্রা যাচ্ছি, আকস্মিক যোগাযোগটাই ওর বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করছিল। আমি যে ওর সঙ্গে যাবই,—অর্থাৎ নিজের শক্তি সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। 'খপ্পর' নামক ছোট্ট কথাটি যে কত প্রবল এবং কিরূপ জটিলতা-বোধক, ধীরেনের খপ্পরে না পড়লে তা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শিকারের গায়ে এক পাক কোনক্রমে জড়াতে পারলে পাইথন যেমন শিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়, আমার নাগাল পাওয়া মাত্র ধীরেনও তেমনই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক, একজন বাঙালী সঙ্গী পাওয়া গেল। বাঙালী সঙ্গী না হ'লে যে ওর ভ্রমণ আটকে ছিল তা নয়; কিন্তু ধীরেনের ওই স্বভাব,—একটা ধারণা মাথায় একবার প্রবেশ করলে সহজে বেরুতে চায় না। সাধারণত বাঙালীরা যেমন ফোটো তোলায় একবার বিয়ের সময় আর একবার মৃত্যুর পর, তেমনই ভ্রমণও করে—হয় চাকরি কিংবা ব্যবসায় ব্যপদেশে, অথবা ধর্মকামনায় বৃদ্ধ-বয়সে, যদি সঙ্গতি থাকে। শুধু শুধু তাজমহল দেখতে পয়সা খরচ ক'রে আগ্রা যাব—এ চিন্তাও বাঙালী-সন্তানের কাছে হাস্যকর। সত্য মিথ্যা নানা ওজুহাত দেখিয়ে আপত্তি করলাম। কিন্তু ডি. কে.-র মাথায় ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল, তা ছাড়া সে ভাল ক'রে জানত, কি করলে বাঙালী-সন্তান কাবু হয়! কিছু না ব'লে সে এগিয়ে এল এবং আমার গলাটি জড়িয়ে আমার টিকিট এবং সদ্য-লব্ধ 'চেক' সমেত 'মনিব্যাগ'টি বুক-পকেট থেকে বার ক'রে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ডি. কে. পালোয়ান লোক, কপাল দিয়ে লোহার ডাণ্ডা বেঁকাতে পারে, বুকের ওপর মোটরকার চড়ায়, তার সঙ্গে জোরজবরদস্তি করতে যাওয়া বৃথা। সকাতরে বললাম, আমি প্রায় এক কাপড়ে চ'লে এসেছি ভাই, যদি নিতান্তই যেতে হয়, কলকাতা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসি তা হ'লে।

ডি. কে. আর একবার মৃদু হেসে চাইলে আমার দিকে।

নীরবেই পথ অতিবাহন করতে লাগলাম দুজনে খানিকক্ষণ।

পোস্ট-অফিসের সামনে এসে ধীরেন বললে, দাঁড়াও একটু।

দাঁড়িয়ে রইলাম, পালাবার উপায় নেই, ব্যাগ ওর কাছে। মিনিট দশেক পরে পোস্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চল।

কোথায়?

ধর্মশালায়, ওইখানেই উঠেছি আমি।

ধীরেনকে ভ্রমণের নেশায় পেয়েছিল। বললে, দু-মাস ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্মশালায় পৌঁছে বললে, তোকে আগ্রা থেকেই ছেড়ে দেব। আমার কেদার-বদরি পর্যন্ত ধাওয়া করবার ইচ্ছে আছে। একা একা ভাল লাগছিল না, এমন সময় তোর সঙ্গে দেখা।

আমার যে কাপড়-চোপড় কিচ্ছু সঙ্গে নেই।

রাত এগারোটা নাগাদ সব এসে পড়বে। আমার চেনা-শোনা একটি লোক আসছে আজ, তাকেই টেলিগ্রাম করলাম তোর বাসা থেকে তোর কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন, না এসে পড়ে, কিনে নিলেই হবে। আমি দাম দেব।

পাইথনের হাত থেকে নিস্তার পেলাম না।

আমার বাসায় গোকুল ছিল না, নীলু ছিল। গোকুল থাকলে আমার নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা এসে পড়ত; কিন্তু নীলু থাকাতে এসে পড়ল সেই সুটকেসটা, যা একদা তিন মাস আগে রাত্রি রেখে গিয়েছিল আমার কাছে প্রদোষের গোপনতায়।

২

ধীরেনকে মিছে কথা বলেছিলাম। একেবারে যে আমার কাছে কাপড়-চোপড় ছিল না তা নয়, অল্পসল্প ছিল। আগ্রার ধুলোয় দু-দিনেই সে সব ময়লা হয়ে গেল। ধীরেনের সেদিন যাবার কথা, ট্রেনের বেশি দেরি ছিল না। নিজের জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল সে। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে হঠাৎ সে বললে, আচ্ছা তুই এ সুটকেসটা আনালি, অথচ একদিনও খুললি না কেন বুঝতে পারছি না।

ওর চাবি আমার কাছে নেই।

চাবি নেই ব'লে ময়লা কাপড়-জামা প'রে ঘুরবি !

ঘরের কোণে স্থটকেসটা ছিল, ডি. কে. উবু হয়ে গিয়ে বসল তার সামনে এবং আমি কিছু বলার আগেই তালাটা ধ'রে এমন একটা মোচড় দিলে যে, সবসুদ্ধ উপড়ে উঠে এল। অপর কেউ হ'লে বাক্সের ডালাটা তুলে দেখত এর পর, কিন্তু ডি. কে.-র তা স্বভাব নয়। সে স্থানচ্যুত কলসুদ্ধ তালাটা মেঝেতে রেখে আমার দিকে একবার চাইলে এবং তারপর বেসুরে একটা গান গুন গুন করতে করতে আবার নিজের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। সেইদিনই ও মথুরা হয়ে হরিদ্বার যাচ্ছিল, সেখান থেকে হৃষিকেশ-কনখল সেরে লছমনঝোলা যাবে। লছমনঝোলা থেকে কেদার-বদরি। ও তখন মনে মনে মশগুল হয়েছিল, একটা ছোট স্থটকেসের ভেতর কি আছে তা দেখবার কৌতূহলই হ'ল না ওর। তালা ভাঙা সত্ত্বেও আমিও যে তখুনি উঠে বাক্সটা খুললাম না, সেটাও ওর নজরে পড়ল না। ওর স্বভাবই ওই রকম। একটু পরেই টাঙা ডেকে আমি স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলুম ধীরেনকে। ধীরেন ব'লে গেল, কেদার-বদরি থেকে যদি ফিরতে পারে, তা হ'লে আবার কলকাতায় দেখা করবে এসে। আমি আগ্রায় আরও দু-একদিন থেকে গেলাম, কাছাকাছি আরও দু-একটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে যাবার লোভ হ'ল।

এই সূত্রে এক সিগারেট-খোর সায়েবের গল্প মনে পড়ছে, এবং তার সঙ্গে নিজের আচরণের তুলনা ক'রে মনে যে অনুভূতি জাগছে, চলতি ভাষায় তাকে লজ্জাই বলতে হয়: কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, আমরা নির্লজ্জ। এক ডাক-বাংলোয় এক সিগারেটখোর সায়েবের দেশলাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি সব দোকানে খোঁজ করলেন, কিন্তু 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' দেশলাই পাওয়া গেল না, সব 'মেড ইন জাপান'। দু-ক্রোশের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের তৈরি দেশলাই পাওয়াই গেল না। সন্ধ্যাবেলা স্টীমার এল, তাতে 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' দেশলাই পাওয়া গেল, তারপর সায়েব সিগারেট ধরালেন। সমস্ত দিন তিনি সিগারেট খান নি।

আমাদের আদর্শনিষ্ঠা অতিশয় ঠুনকো। সামান্য একটু চাপ পড়লেই ভেঙে টুকরে টুকরো হয়ে যায়। ডি. কে. চ'লে যাবার পর রাত্রির স্থটকেস্ খুলে দেখেছিলাম। তাতে দু-একখানা শাড়ি-ব্লাউজ ছাড়া একখানা চিঠি ছিল। কারও চিঠি তার বিনা-অনুমতিতে পড়া যে অনুচিত—এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও চিঠিখানা পড়েছিলাম আমি। পুর্ণেন্দুবাবুকে লেখা রাত্রির মায়ের চিঠি।

৩

তার পরদিন ঠিক স্বর্যোদয়ের পূর্বে তাজমহলের একটা মিনারেটের ওপর একা ব'সে ছিলাম। গ্রীষ্মকাল। দেখছিলাম, প্রায়-নির্জলা যমুনা পূর্বমহিমার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে কোনক্রমে। কল্পনা করবার চেষ্টা করছিলাম, আলমগীর-কল্পিত কালো তাজমহল যদি যমুনার ওপারে সত্যিই নির্মিত হ'ত, কেমন দেখতে হ'ত সেটা। তাজমহলের অভ্যন্তরে বৃদ্ধ পরিচারকের মুখনিঃসৃত 'আল্লা' শব্দটার করুণ প্রতিধ্বনি আবার যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল আগ্রা ফোর্টের সেই অংশটা, যেখানে শাহ্‌জাহান এসে বসতেন,—দেওয়ালের গায়ে সারি সারি সবুজ গোল পাথর আর তার প্রত্যেকটিতে তাজমহলের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।...সহসা সমস্ত অবলুপ্ত ক'রে মনে পড়ল চিঠিখানার কথা। চিঠিখানা পকেটেই ছিল, আবার খুলে পড়লাম, বার বার ক'রে সেই অংশটাই পড়লাম, যার অর্থ বুঝতে পেরেও বুঝতে না পারার ভান করছিলাম।—

"তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার অনুমতি না নিয়ে কেবল মাত্র ফার্নান্ডিজকে সঙ্গে ক'রে আমি শিবসমুদ্রম্ দেখতে কেন গিয়েছিলাম, সেখানে কেনই বা আমার দু'দিন দেরি হ'ল—এ সবের জবাবদিহি তোমার কাছে দিতে আমি বাধ্য নই, তা তুমি জান। জেনেশুনেও তুমি তবু জবাবদিহি তলব করেছ, কারণ তুমি পুরুষ, উচ্ছ্বাসের মুখে যে সব প্রতিশ্রুতি দাও, উচ্ছ্বাস ক'মে গেলে তা পালন করবার কষ্ট স্বীকার করতে চাও না। এখন তুমি অনায়াসে ভুলে গেছ যে, শান্তনুর মত তুমিও একদিন আমার কাছে গদগদ ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমার কোন আচরণের প্রতিবাদ তুমি করবে না। অথচ আজ তুমি কড়া ভাষায় জবাবদিহি চেয়েছ। ন্যায়ত ধর্মত যাঁর জবাবদিহি দাবি করবার অধিকার, তিনি ভুলেও কখনও তা করেন নি, করবেনও না। তুমি কি জান না, তুমিই এর মূর্তিমান জবাবদিহি!..."

এ কটি কথার মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করবার সাহস আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। রাত্রির অন্ধকারে গাছকে ভূত এবং মেঘকে পর্বত ব'লে ভুল করা অসম্ভব নয়। তবু আমি জানি; আমি ভুল করি নি। রাত্রিকে এ বিষয়ে কোনদিন—হ্যাঁ, অধিকার পেয়েও—প্রশ্ন করি নি। সুটকেসটি নিখুঁতভাবে সারিয়ে নিরুৎসুকভাবেই ফেরত দিয়েছিলাম।

বেশ মনে পড়ছে, চিঠিখানা পড়বার পর আবার আমার কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল যমুনার অপর পারে কালো তাজমহলের নিকষকৃষ্ণ নিবিড় কান্তি,—

তার কোথাও একবিন্দু সাদা নেই, আগাগোড়া সমস্ত কালো।

তারপর সহসা অনুভব করলাম, আমি শুভ্র তাজমহলের সু-উচ্চ মিনারেটে ব'সে সূর্যোদয় দেখছি—কালো তাজমহলটা নিছক কল্পনামাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

সেদিন ভোরে সুটকেসটা আমার কাছে রেখে রাত্রি যখন চ'লে গেল, আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ ক'রে। রাত্রির অপ্রত্যাশিত অভ্যাগম ও অন্তর্ধান, তিন খোরাক ব্রোমাইড মিক্‌শ্চারের কার্যকরী শক্তি এবং তজ্জন্য নিজের ঈষৎ গর্ব, আমার বৈঠকখানা-ঘরের নতুন-কেনা নীল-ডোম-দেওয়া ইলেক্‌ট্রিক বাতির নীলাভ আলো, কয়েকটা কলের সমবেত বংশীধ্বনি—সমস্তটা মিলিয়ে সেটা যেন একটা নূতন রকম ভোর।

এই গলিতে যত দিন থেকে বাস করছি, তত দিন ভোরের সঙ্গে যে কটা জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ব'লে আমার ধারণা, সেদিন ভোরে এক ওই কলের বাঁশী ছাড়া, কি ক'রে জানি না, বাকি কটা জিনিস বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রোজ হড়হড় শব্দ ক'রে ময়লা-ফেলা গাড়ি যায়, কড়কড় শব্দ ক'রে পাশের বাড়ির ঝি এসে কড়া নাড়ে, ঘড়ঘড় শব্দে গলার কফ তুলতে তুলতে সামনের বাড়ির দ্বারিকবাবু তামাক খান, বড়বড় ক'রে মন্ত্র পড়তে পড়তে একদল লোক গঙ্গাস্নান করতে যায়, ছড়ছড় ক'রে কলে জল আসে। সেদিন ভোরেও এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ চেতনায় দাগ কাটতে পারে নি। সেদিনকার ভোরটা গগন ঠাকুরের ছবির মত একটা বিশিষ্ট অপরূপতায় আঁকা আছে আমার মানসপটে এখনও। নীলাভ আলোতে রাত্রি এসে দাঁড়াল, বংশীর প্রলাপ থেমে গেছে শুনে আমার মন আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, রাত্রির স্থির দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত প্রশংসার আভাস মাত্র না দেখে একটু ক্ষোভ জাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে রাত্রির গভীর প্রকৃতির পরিচায়ক মনে হওয়াতে সান্ত্বনা এল, নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে কলের বাঁশীগুলো বেজে উঠল, রাত্রি চ'লে গেল।

বেশ মনে পড়ছে, আমার মনে হয়েছিল যে, কলকাতা শহরে মাটি আকাশ গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের কোন অর্থ নেই, যেখানে ফুলের স্থান গাছে নয়—বাজারে, যেখানে পাখি নীড় বাঁধে না—খাঁচায় থাকে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সকলেই যেখানে নেশার ঘোরে উন্মত্ত, সুস্থ মনোবৃত্তি যেখানে উপহাসের খোরাক, নারীর নারীত্ব, কবির কবিত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে পণ্যদ্রব্যের সামিল, যেখানে ট্রামে বাসে সিনেমায় বড় রাস্তায় গলিতে সর্বত্রই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মৃতপ্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিস্তেজ আক্ষেপকে আনন্দ ব'লে মনে ক'রে কৃত্রিম উল্লাসের ভান করছে, সেই কলকাতা শহরের বুকে এমন একটা ভোর সম্ভব হ'ল কি ক'রে! বিস্ময় জেগেছিল মনে, একটা স্বপ্নসুলভ আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি, সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলাম যে, বর্তমান যুগের উন্মাদ জনতার আমিও একজন, যে আনন্দে অভিভূত হয়েছি তা বর্তমান-যুগ-সুলভ স্বাপ্নিক আনন্দই, বলিষ্ঠ কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম তখন দেখলাম, সেই নীলাভ আলোতে একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে তন্ময় হয়ে 'লোবার নিউ-মোনিয়া' সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করছি। আমার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত বিদ্যা একাগ্র হয়ে উঠেছে—বংশীকে বাঁচাতে হবে। হোক রাত্রির প্রকৃতি সুগভীর, বংশীকে যদি সত্যি সত্যি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, এতটুকু কৃতজ্ঞতার ঢেউ কি জাগবে না তার রহস্যময় অন্তর-সমুদ্রে, নিষ্পলক চোখের দৃষ্টিতে সামান্যতম কোমলতাও কি আভাসিত হবে না ?...কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে নেই। আরও অনেকক্ষণ হয়তো পড়তাম, যদি না একটা তীব্র অনুভূতির তাড়নায় উঠে বসতে হ'ত। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। সমস্ত রাত খাওয়া হয় নি। সহসা-পুঞ্জীভূত বিরক্তিসহকারে ডাক্তারী বইগুলো সরিয়ে ফেলে অনাবশ্যক রকম উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম গোকুলকে, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। খোলা দরজা দিয়ে কুণ্ঠিত ভোরের আলো ঘরে প্রবেশ করল, ইলেকট্রিক আলোর ভয়ে সে যেন এতক্ষণ বাইরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে ছিল।

আদেশ শুনে গোকুল খুশি হ'ল, মনে মনে একটু বিস্মিতও হ'ল বোধ হয়। 'ভয়ানক খিদে পেয়েছে' ব'লে খাবার দাবি করছি, এর চেয়ে আনন্দজনক বিস্ময়কর ঘটনা গোকুলের জীবনে বেশি ঘটে না। ওকে প্রত্যহ অনুযোগ, মিনতি, বকুনি, অভিমান—নানা উপায় অবলম্বন করতে হয় আমাকে পেট ভ'রে খাওয়াবার জন্যে। ওর ধারণা, ছোট ছেলেরা যেমন মাকে ফাঁকি দিয়ে নানা

ছুতোয় খায় না, আমিও তেমনই নানা ছুতোয় গোকুলকে ফাঁকি দিই। মহানন্দে গোকুল একটা বড় পাঁউরুটি কাটতে ব'সে গেল। একটু পরে শব্দ শুনে বুঝলাম, ডিমও ফ্যানাচ্ছে—গোকুল জানে আমি কি ভালবাসি, ও পুরুষমানুষ নয়, ও মা।

এখন আমার মনে হচ্ছে, সেদিন এই দেরিটা যদি না হ'ত অর্থাৎ রাত্রির আসা, সুটকেস রাখা, চ'লে যাওয়া—এই সামান্য ঘটনা যদি আমাকে সেদিন অতটা স্বপ্নাচ্ছন্ন না করত, বড় বড় ডাক্তারী বই ঘেঁটে অতখানি সময় যদি আমি অনর্থক নষ্ট না করতাম, অমন অসময়ে যদি অত খিদে আমার না পেত, রায় মশায়ের বাড়িতে রাত্রির সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বেই যদি আহারটা সমাধা করতে পারতাম—অর্থাৎ অনিবার্যভাবে যে যে ঘটনা ঘটাতে স্বর্ণেন্দুর ওখানে যেতে আমার দেরি হয়ে গেল,—সেগুলো যদি না ঘটত, তা হ'লে হয়তো জিনিসটা অন্যরকম হতে পারত। দেরি হ'ল ব'লেই প্রাতর্ভ্রমণ-ফিরতি ধরণী-বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, তিনি গল্পের অবতারণা করে আরও দেরি ক'রে তো দিলেনই, আমার মুখে সমস্ত শুনে পূর্ববন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন এবং নিজের চোখে সমস্ত দেখে আইনের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।

আমি স্নান সেরে যখন চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময়ে দ্বারের কাছে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রঙ-চটা গাঁট-গাঁট লাঠিটি বগলে ক'রে ঈষৎ ঝুঁকে রুমালের ঝাপটা দিয়ে প্যানেলা জুতো থেকে ধুলো ঝাড়ছেন ধরণীবাবু। আমাকে দেখে ঈষৎ হাসলেন, তারপর যেন আমার একটা জুয়াচুরি ধ'রে ফেলেছেন এইভাবে প্রশ্ন করলেন, এর মধ্যেই চা তৈরি যে দেখছি আজ, ব্রাহ্মণকে সকালবেলায় চা খাইয়ে পুণ্য-সঞ্চয় করবার মতলব নাকি হে?

বললাম, আসুন, বসুন।

খুটখুট ক'রে প্রবেশ করলেন ধরণীবাবু।

২

যদিও আমি খুব অন্যমনস্ক ছিলাম, অর্থাৎ আমার মনের যে অংশটা ধরণী-বাবুর সঙ্গে লৌকিকতা করতে ব্যস্ত ছিল, তার চেয়ে ঢের বড় একটা অংশ যদিও নীরব নেপথ্যে ব্যস্ত ছিল রাত্রিকে নিয়ে, তবু ধরণীবাবুর একটা কথা কানে প্রবেশ করামাত্রই রাত্রিকে নিয়ে ব্যস্ত মনের বৃহৎ অংশটার

অধিকাংশই যেন সহসা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে এসে যোগদান করলে ধরণীবাবুর অংশটায়। এক চুমুক চা পান ক'রে ভারি একটা হৃদয়রোচক প্রসঙ্গ তুললেন ধরণীবাবু।

শুধু ধরণীবাবুই নয়, আমাদের অনেকেরই জীবনদর্শন এবং জীবনযাপন এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। সত্য অথবা মিথ্যা দার্শনিকতার পাখায় ভর ক'রে মনোলোকের যে আকাশে আমরা অহরহ উড্ডীয়মান হই, সত্যি সত্যি উড়তে গিযে দেখা যায, সে আকাশ-বিলাস বাস্তব-জগতে আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমাদের পাখা এবং আকাশ দুইই কাল্পনিক, আসলে একটা পঙ্ককুণ্ডে কৃমির মত কিলবিল করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কল্পনাবান কৃমির যা দুর্দশা, আমাদেরও সেই দুর্দশা। ধরণীবাবু সাহেবদের ওপর চটা, স্ত্রী-শিক্ষার ওপর চটা, ব্রাহ্মদের ওপর চটা, সিনেমার ওপর চটা, টর্চের ওপর চটা, ট্যাক্সির ওপর চটা, আধুনিক অনেক জিনিসেরই ওপর হাড়ে-চটা তিনি। তাঁর মন কল্পনার পাখায ভর ক'রে যে যুগের আকাশে উড়ে বেড়ায, সেটা—ধরণীবাবু যদিও বলেন বৈদিক যুগ—আসলে বোধ হয শায়েস্তা খঁার আমল। সে যুগে টাকায আট মণ চাল ছিল, প্রচুর টাটকা দুধ ঘি মাছ সস্তায় পাওযা যেত, স্ত্রীলোকদের আব্রু ছিল, এক-ব্যক্তিক নয়—একান্নবর্তী পরিবারে লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘজীবী হযে গ্রামে বাস করত। এই যুগের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বাস্তব জীবনে কিন্তু ধরণীবাবুকে সাহেবদের ঝুঁকে সেলাম ক'রে তাদের অধীনে চাকরি করতে হযেছে, শহরে এসে বাস করতে হযেছে, একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করতে হয়েছে, নিজের ছোট মেযেটিকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিতে হযেছে, সিনেমা দেখাতে হযেছে, টর্চ কিনতে হযেছে, গত যুগের ব্রাহ্মদের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হযেছে, ট্যাক্সি চড়তে হয়েছে, কলের চাল পচা মাছ জ'লো দুধ দুর্মূল্যে কিনতে হয়েছে, এবং আরও অনেক কিছু করতে হয়েছে, যা শায়েস্তা খঁার আমলে কেউ করত না। এর ফলে যা হয়েছে, তাকে যদিও আমরা শুদ্ধ ভাষায দার্শনিকের আকূতি বলি না, চলিত ভাষায় কুৎসা-প্রবণতা নামে অভিহিত ক'রে থাকি ; কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে, কযলাই অনুকূল 'পরিস্থিতি'তে হীরকে পরিণত হয। আমার বিশ্বাস, অনুকূল 'পরি-স্থিতি'তে পড়লে ধরণীবাবুর পরনিন্দাপ্রবণ মনোভাব দার্শনিক মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারত, তিনি আর কিছু না হোন, জনপ্রিয় সম্পাদক হতে পারতেন, সকালে বিকেলে অপরের বৈঠকখানায় হানা দিয়ে বর্তমান-যুগে-বাধ্য-

হয়ে-বাস-করা-জনিত দার্শনিক ক্ষোভ উদাহরণ-সম্বলিত ক'রে প্রকাশ ক'রে বেড়াতে হ'ত না তাঁকে, লোকে সভা ক'রে ডেকে নিয়ে যেত তাঁকে সভাপতি-রূপে এবং উৎকর্ণ হয়ে শুনতে তাঁর দার্শনিক বাণী।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ধরণীবাবু বললেন, ওহে, মেঘনাদ এতদিন মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, এইবার সশরীরে দেখা দিয়েছেন। ইয়া পাকানো গোঁফ। মেঘনাদ-প্রসঙ্গ ধরণীবাবু ইতিপূর্বে আরও দু-একবার আলোচনা করেছেন ; সুতরাং বুঝতে দেরি হ'ল না যে, তিনি সেই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির অদৃশ্য-অথচ-বর্তমান প্রণয়ীটির চাক্ষুষ দর্শন লাভ করেছেন, যে তরুণী শিক্ষয়িত্রীটি তাঁর বাড়ির সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন।

উৎসুক কণ্ঠে বললাম, তাই নাকি ?

কাপে দ্বিতীয় চুমুক দেবার জন্যে কাপটি তুলেছিলেন ধরণীবাবু, কিন্তু ওষ্ঠ পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে শূন্যেই সেটাকে ধ'রে রাখলেন এবং সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

তোমরা নাড়ী টিপে তবে লোকের ভেতরের খবর বলতে পার, তাও সব সময় পার না, কিন্তু আমরা এক নজরেই পারি।

দ্বিতীয় চুমুক দিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে সেই জাতীয় আনন্দ ক্ষরিত হতে লাগল, যা কোন আবিষ্কারকের দৃষ্টি থেকে উপচে পড়ে স্বাভাবিক আবিষ্কারের পর।

যখনই দেখলাম, ঘন ঘন সিডান-বডি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে আর জানলায় ঘন ঘন টর্চের আলো ফেলছে—

তৃতীয় চুমুক দিয়ে খানিকটা চা ডিসে ঢাললেন।

বাধ্য হয়েই, মানে ভদ্রতার খাতিরেই, বলতে হ'ল আমাকে, আজকালকার কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের।

আমার এই উক্তিতে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা করবার সুযোগ পেলেন তিনি। উত্তেজনাভরে ডিসে ঢেলে ঢেলে তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ ক'রে মুখটা মুছে হাত ধুয়ে বহুবার-শ্রুত সেই হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি বেশ তারিয়ে তারিয়ে বলতে লাগলেন, আমি স্মিতমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে শুনতে লাগলাম। তারপর একটু পরেই আমার যা স্বভাব, বাইরে হুঁ হুঁ করতে করতে ভেতরে ভেতরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। ভাবছিলাম ওই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির কথাই। ভাবছিলাম, ভাগ্যিস মহিলা কতকাতা শহরে চাকরি

করেন! কলকাতা শহরের বিশাল জনসমুদ্রে এত অসংখ্য কুৎসা-বুদ্বুদ উঠছে এবং লয় পাচ্ছে যে, তা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার অবসর নেই কারও, তা ছাড়া এখানে কেউ কারও তোয়াক্কাই করে না! কিন্তু এই মহিলা যদি কোন মফস্বল শহরের ডোবায় গিয়ে বুদ্বুদ কাটতেন, সেখানে যদি ঘন ঘন সমাগত সিডান-বডি ট্যাক্সি এবং টর্চ দিয়ে আলো ফেলার সঙ্গে ইয়া-পাকানো গোঁফকে জড়িয়ে ফেলবার সুযোগ দিতেন সেখানকার ধরণীবাবুদের, তা হ'লে কি বিপর্যয় কাণ্ডই না ঘটত! মফস্বলের ছোট শহরে সকলেই সকলের হিতৈষী, সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। কতকগুলো বেকার বুড়ো আর ছোঁড়া সকলের সব খবরের জন্যে সর্বদা উৎকর্ণ। মফস্বলের ইস্কুল-মাস্টারনীদের দেখেছি, তাদের কথা ভাবলে ভারি দুঃখ হয় আমার। শহরসুদ্ধ সবাই তাদের গার্জেন। তাদের স্বাধীনভাবে কোথাও যাবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে হেসে কথা কইবার উপায় নেই, রাত নটার পর কোথাও থাকবার উপায় নেই (যেন রাত্রি নটার আগে কোন কিছু দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব!), বেচারীদের কিছু করবার উপায় নেই। বহু গার্জেন কটমট ক'রে সর্বদাই তাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন, এবং তারাও লেখা-পড়া শিখে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে হাস্যকর নিয়মের বোরখা প'রে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে বন্দিনীর মত।

সহসা সচেতন হযে উঠলাম ধরণীবাবুর একটা কথায়।

আরে, ওই যে তোমার পূর্ণেন্দুবাবুর মেযে—ওইটুকু বযসে ও না করেছে কি?

তখন আমি জানতাম না, পরে জেনেছি, এই ধরণীবাবুই তাকে প্রেমপত্র লিখেছিলেন একটা। হ্যাঁ, এই ধরণীবাবুই—তার পিতৃবন্ধু।

উঠে পড়লাম।

আমাকে একবার যেতে হবে ওদের বাড়িতে এখুনি। বংশীর খুব অসুখ।

ওঁরা এসেছেন নাকি এখানে?

হ্যাঁ।

রাত্রিও এসেছে?

এসেছে।

কবে?

কবে ঠিক জানি না।

জামাটা গায়ে দিয়ে হাতে যখন হাতঘড়িটা বাঁধছি, ধরণীবাবু বললেন, চল,

আমিও দেখে আসি। হাজার হোক বন্ধুলোক।

আপত্তি করতে পারলাম না।

ধরণীবাবু সঙ্গী হলেন।

৩

সেদিন সকালের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার মনে আছে। বেরিয়েই হাতঘড়িটা দেখলাম—ছটা বেজে পনেরো মিনিট। যে ঘটনা-পরম্পরার জন্যে অনিবার্যভাবে আমার দেরি হ'ল, সেগুলো না ঘটলে আমি অন্তত আরও দু ঘণ্টা আগে যেতে পারতাম বংশীর কাছে এবং ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ত না। আমার এখনও ধারণা, ব্যাপারটা যদি ধরণীবাবুর জ্ঞানগোচর না হ'ত, তা হ'লে হয়তো এত তাড়াতাড়ি সব জানাজানি হয়ে যেত না, হয়তো অন্য রকমও হতে পারত। কারণ বাড়িতে কেউ ছিল না। যে ঠিকে ঝিটা ওরা বহাল করেছিল এসেই, সেই ঝিটাও তখন আসে নি। স্বর্ণেন্দুর মা-ও ও-বাসায় ছিলেন না, তিনি ছিলেন মির্জাপুর স্ট্রীটের একটা বাড়িতে তাঁর গুরুদেবের কাছে। বস্তুত, পরে শুনেছিলাম, তিনি এ বাড়িতে এসে ওঠেনই নি। তিনি গুরুদেবকে নিয়ে মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় উঠেছিলেন। রায় মশায়ের বাড়ি থেকে রাত্রির সঙ্গে এসে গত রাত্রে যখন তাঁকে আমি দেখেছিলাম, তার একটু আগে তিনিও এদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন। দেখা করতে আসার উদ্দেশ্য—বংশী অথবা পূর্ণেন্দুবাবু নয়, জ্যোতির্ময় এবং রাত্রি। তিনি দেখতে এসেছিলেন, জ্যোতির্ময় এসেছে কি না! আমি চ'লে আসবার একটু পরেই তিনিও ফিরে গিয়েছিলেন মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় তাঁর গুরুদেবের কাছে।

ঘড়িটা থেকে চোখ তুলেই দেখতে পেলাম, ঘোর-নীল-লুঙ্গি-পরা সেই রোগা ফরসা ছোকরাটিকে, যে রোজ রাস্তার ধারের জানলায় ছোট হাত-আয়নাটি রেখে তন্ময়চিত্তে মুখ-বিকৃতিসহকারে দাড়ি কামায়। সেদিনও সে তাই করছিল। জানলার নীচেই সরু ফুটপাথে একটা কালো বেরাল দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দিকে পীতাভ সবুজ চোখ দুটো ক্ষণকাল নিবদ্ধ রেখে হঠাৎ সে ত্রস্ত হয়ে ঢুকে পড়ল পাশের গলিটায়। তার পরের বাড়ির কাকাতুয়াটা তারস্বরে চিৎকার করছিল সমস্ত পাড়াটা সচকিত ক'রে। রাস্তাটা যেখানে বেঁকেছে, সেই বাঁকের মুখে একটা কল আছে, সেই কলকে কেন্দ্র ক'রে কলতলার কাব্য-কলরব উঠছিল, দগ্ধ-কটাহ-মার্জন-নিরতা আঁট-সাঁট-কাপড়-পরা একটি তরুণী পরি-

চারিকার নবোন্মেষিত যৌবনের ঈষন্মাদক আবহাওয়ায; আর একটু দূরে একজন ফেরিওযালা এসে এ-পাড়ার সবজান্তা গোষ্ঠবাবুর অহমিকাকে তোয়াজ ক'রে কতকগুলো দাগী আম বিক্রি করবার চেষ্টা করছিল তাঁর কাছে, বলছিল, হলেন সমঝদার লোক বাবু, তাই আপনার কাছেই আগে নিয়ে এলুম। বুল-বুলভোগ আম এ কলকাতা শহরে কটা লোক চেনে, বলুন? এই আমগুলো দেখে ধরণীবাবুর ভদ্রতাজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হ'ল সম্ভবত, বললেন, তোমার কাছে গণ্ডা আষ্টেক পযসা হবে হে ডাক্তার? পকেট থেকে ব্যাগ ব্যর ক'রে দেখলাম, কাল রাত্রে ট্যাক্সি-ভাড়া দেওয়ার পর পাঁচ টাকা থেকে যা অবশিষ্ট ছিল তাই রযেছে। ড্রাইভারকে আমি পাঁচ টাকার নোটটা দিযেছিলাম, সে কত ফেরত দিযেছিল তা গুনে নেবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন আমার। দেখলাম, একটা আধুলি রযেছে, বার ক'রে দিলাম ধরণীবাবুকে। ধরণীবাবু বললেন, ও নিযে আমি কি করব, কিছু কমলানেবু-টেবু কিনিগে চল। রুগীর বাড়ি যাচ্ছি, তা বললে কি চলে, হাজাব হোক বন্ধুলোক, লোকত ধর্মত একটা—। ধরণীবাবু কথা অসম্পূর্ণ রেখে এমন ভাবে আমার পানে চাইলেন, যেন আমি কমলালেবু কেনার বিরোধী। আমি কিছু না ব'লে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। মোড়ের চাযের দোকানটায দেখলাম, বাঁধা খদ্দেরগুলি যুদ্ধের সংবাদ আলোচনা করতে করতে বহুবার-মোছা অযেলক্লথ-মোড়া টেবিলের ধারে ব'সে রোজ যেমন চা খান, সেদিনও তেমনই খাচ্ছেন। ঠোঁটে ধবল, আঙুলে ধবল, চোখের কোণে ধবল জ্যোতিষীটি নিজের আসনটি পাতছেন ফুটপাথের ওপর এদিক ওদিক চাইতে চাইতে। শ্যামবাজারমুখী ট্রামটার শিবোনামায এস্‌প্ল্যানেড লেখা রযেছে,—হয ড্রাইভার অনমনস্ক, না হয ঘোরাবার যন্ত্রটা খারাপ হযে গেছে। ডানহাতি গলির মোডটায শ্বশুরের সহাযতায সদ্য-বিবাহিত যে যুবকটি মনিহারী দোকানটি সম্প্রতি খুলেছেন, তাঁকে সঙ্গসুখ দান করবার জন্যে যে কজন ছোকরা ওই সঙ্কীর্ণ দোকানের সঙ্কীর্ণতর বেঞ্চিটায ব'সে বোজ হাসাহাসি করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুজন এসে জুটেছেন দেখলাম, যেটির নেউলের মত মুখ সেইটি এবং নাদুসনুদুসটি। কার বাড়ি থেকে জানি না, বড বড় লোমওযালা ছোট্ট একটা কুকুর ফুটপাথে বেরিযে ছুটোছুটি করছিল—চ্যাপ্টা-গোছের ছোট মুখ, লোমে পরিপূর্ণ, চোখ দেখা যায় না…

চ'লে যেও না হে, দাঁড়াও।

ও-ধারের ফুটপাথে কমলালেবু দেখতে পেয়েছিলেন ধরণীবাবু। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে রাস্তা পেরিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলেন, আমি যন্ত্র-চালিতবৎ অনুসরণ করলাম। পশ্চিমদেশীয় দোকানদারটির সঙ্গে হাস্যকর হিন্দীতে অনেক দর-কষাকষি করলেন, আমি নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। অনেক ধ্বস্তাধস্তির পর টাকায় বত্রিশটা থেকে টাকায় চল্লিশটা দিতে সে যখন রাজী হ'ল, তখন আট আনার লেবু কিনলেন ধরণীবাবু। পাশের একটা মুদির দোকান থেকে একটা বড় ঠোঙা ভিক্ষে ক'রে আনলেন।

এই সমস্তই এবং আরও নানা ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছিল সেদিন সকালে। সমস্তই আমি ধৈর্যভরে সহ্য করেছিলাম সেই শক্তিবলে, যে শক্তি মানুষ লাভ করে আনন্দের প্রেরণায়। আমার দেওয়া তিন খোরাক ব্রোমাইড মিক্শ্চার পান ক'রে বংশীর প্রলাপ থেমেছে এবং রাত্রি নিজে এসে সে কথা আমায় ব'লে গেছে, এতেই আমার মন এমন একটা উত্তুঙ্গ লোকে আরোহণ করেছিল যে, এই সব তুচ্ছ ঘটনার সাধ্য ছিল না আমাকে বিচলিত করে।

মনুমেণ্টের ওপর দাঁড়িয়ে সমতলবর্তী লোকজন গাড়ি বাড়ি মোটর এবং তাদের সমন্বয়-বৈচিত্র্য লোকে যেমন নিরুৎসুক অনুকম্পাভরে দেখে, সেদিন সকালের ঘটনাবলী আমিও সেই রকম উদাসীন দৃষ্টিতে দেখেছিলাম অনেক ঊর্ধ্বলোক থেকে। যদিও রাত্রির মুখের একটি পেশীও বিচলিত হয় নি, তার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে হর্ষের বিন্দুমাত্র আভাসও দেখতে পাই নি, তবু সেদিন কলকাতা শহরের কলরবের মধ্যেও দুটি কথা আমার কানে যেন গান গেয়ে ফিরছিল—"থেমে গেছে"।

৪

স্বর্ণেন্দুর বাসায় যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে, কিন্তু তখনও সেই অন্ধ গলিটা থেকে অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নি। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। সরু লম্বা ঈষৎ অন্ধকার গলিটা, তবু তার ভেতর থেকে ফুরফুরে একটা হাওয়া বইছিল, কল থেকে চৌবাচ্চায় জল পড়ার একটা একটানা শব্দও ভেসে আসছিল কোথা থেকে যেন, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাশের বাড়ির বারান্দার খোপ থেকে পায়রাটা ডাকছিল তার সঙ্গিনীকে গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে, ঠুন ঠুন শব্দ ক'রে একটা রিক্শওয়ালা অলস মন্থর গতিতে চলেছিল।

প্রথম রসভঙ্গ হ'ল গলিতে ঢোকবার মুখেই, ধরণীবাবুর কমলালেবুর ঠোঙাটা ফেটে গেল, প'ড়ে পেল দু-চারটে লেবু এবং সেগুলোকে সামলাতে গিয়ে আরও দু-চারটে পড়ল। বিরক্ত ধরণীবাবু হেঁট হয়ে কুড়োতে লাগলেন সে সব। আমার লোকটাকে ঘোর মিথ্যুক ব'লে সন্দেহ হ'ল। গত তিন মাস যাবৎ ইনি কোমরের বাতের ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন আমার কাছ থেকে; দেখা হ'লেই বলেন, ওষুধে কোন ফল হ'ল না হে, মোটে হেঁট হতে পারি না। স্বচক্ষে দেখলাম, বেশ হেঁট হতে পারছেন তিনি। অথচ সে কথা স্বীকার করেন না কখনও ভুলেও, চিকিৎসা করাচ্ছেন যেন আমাকে বাধিত করবার জন্যেই। মানব-চরিত্রের একটা দিক যেন পরিস্ফুট হ'ল আমার কাছে, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

গলির ভেতর ঢুকেই চোখে পড়ল স্বর্ণেন্দুদের বাসার দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজার পাশেই একটা শ্যাওলা-পড়া ছোট চৌবাচ্চা, একটা ভাঙা কলের মুখ থেকে অবিরাম জল পড়ছে তাতে, কাছেই হাতলহীন টিনের একটা মগ প'ড়ে আছে কাত হয়ে।

ধরণীবাবু কমলালেবুগুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়েছিলেন। আমি একাগ্রদৃষ্টিতে খোলা দরজাটার পানে চেয়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, হঠাৎ হয়তো রাত্রি এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবে, অপরিচিত জ্যোতির্ময়বাবুও হয়তো বেরিয়ে আসতে পারেন। বেশ মনে আছে, এদের দুজনকেই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। ওই খোলা দরজায় স্বর্ণেন্দুর আবির্ভাব যদিও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, আমি সেটা প্রত্যাশা করি নি।

কেউ এল না। এটাও বেশ মনে পড়ছে, তাদের না আসার একটা সঙ্গত কারণও আমি অনুমান ক'রে নিয়েছিলাম ওই অল্প কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। মনে হয়েছিল, সারারাত জেগে এসে ক্লান্ত জ্যোতির্ময়বাবু হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন···রাত্রি হয়তো স্নান করছে···কিংবা হয়তো নিদ্রিত বংশীর মাথার শিয়রে ব'সে হাওয়া করছে আস্তে আস্তে···সমস্ত রাত জেগে স্বর্ণেন্দু হয়তো শুয়েছে একটু···

খোলা দরজাটা দিয়ে আমি আগে ঢুকলাম।

আমার পিছু পিছু ধরণীবাবু।

ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত চোখটা। যদিও তিনি উত্থানশক্তিরহিত, পাশের ঘরে কি ঘটেছে তা জানবার যদিও কোন উপায়

ছিল না তাঁর, তবু আমার মনে হয়, কোন অতীন্দ্রিয় উপায়ে কিছু আভাস যেন পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবন্ত চোখটা যেন তারস্বরে প্রশ্ন করছিল, কি হয়েছে, ও-ঘরে কি হয়েছে, জান তোমরা ?

তাঁর বিছানার পাশেই খালি একটা চেয়ার ছিল। ধরণীবাবুর মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, নিমেষের মধ্যে তাঁর মুখে প্রাগ্‌জীবনের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ-জনিত দাস্য-ভাবটা প্রকট হয়ে উঠল, আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে সবিনয় নমস্কারান্তে সসঙ্কোচে উপবেশন করলেন তিনি চেয়ারটাতে।

আমি পাশের ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

স্বর্ণেন্দু যেন দোল খেলেছে। তার জামা, কাপড়, বংশীর বিছানা সব লালে লাল। রক্ত। চাপ চাপ রক্ত চতুর্দিকে। বংশীর গলার প্রকাণ্ড ক্ষতটা হাঁ ক'রে আছে। পাশেই প'ড়ে আছে রক্তাক্ত বাঁকা ছোরাটা, যেটা ফার্নান্‌-ডিজ রাত্রিকে উপহার পাঠিয়েছিল তার জন্মদিনে। লাল খাপখানাও প'ড়ে রয়েছে মেঝেতে।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এ কি !

স্বর্ণেন্দু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর তোর ছোট্ট হাসিটি হেসে বললে, আমি করেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

এর অব্যবহিত পরে যা যা ঘটেছিল, তার স্মৃতি আমার মনে অস্পষ্ট নয়, কিন্তু তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করব না। গ্লানিজনক ব'লে নয়, এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর ব'লে। তা ছাড়া লিপিবদ্ধ করবার মত সুসম্বদ্ধভাবে সব কথা আমার মনে নেই। একটা হত্যাকাণ্ড ঘ'টে যাবার পর তাকে লোমহর্ষণ অথবা ওই-জাতীয় কোন একটা বিশেষণে ভূষিত ক'রে আমরা সাড়ম্বরে সাধারণত যা যা ক'রে থাকি, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। পুলিস এসেছিল, খবরের কাগজে সত্যমিথ্যা-কল্পনা-প্রণোদিত সংবাদ বেরিয়ে-

ছিল, মকদ্দমা হয়েছিল, তদ্বির হয়েছিল। এমনই যে কিছু একটা নির্ঘাত ঘটবেই, একদিন ধরণীবাবু মাথা নেড়ে বার বার সে কথা বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, অদূরদর্শিতাপ্রযুক্ত এত বড় একটা কাণ্ড চাপা দেবার কল্পনাও করেছিলাম এবং ধরণীবাবু না মানা করলে তা করতে গিয়ে আমি সুদ্ধ যে জড়িয়ে পড়তাম—এ কথা নিজেদের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে জাহির ক'রে আমার কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করবার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। অনেক ফুসফুস, অনেক গুজগুজ, উক্ত অনুক্ত অনেক চিন্তা উদ্বেগ-অনুদ্বেগের অভিনয়—কোন কিছুরই ক্রটি হয় নি। আইনের রথচক্রের আবর্তনে যে পরিমাণ শব্দ ও ধুলি উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, সবই হয়েছিল। সে সবের বিস্তৃত বর্ণনা এ কাহিনীর পক্ষে ক্লান্তিকর। আমি রাত্রির কথা লিখতে বসেছি, স্বর্ণেন্দুর নয়। রাত্রিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে স্বর্ণেন্দুকে আনতে হয়েছে, অন্ধকারকে ভাল ক'রে জানবার জন্যে যেমন আলো জ্বালতে হয়।

ইতিপূর্বে একবার বলেছি, আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ কাহিনীতে পারম্পর্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। সেই ফাঁকগুলো আমি আমার কল্পনা দিয়ে ভরাট ক'রে নিয়েছি। আমার এ কল্পনা-বিলাসের হেতু কি, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, সত্যের অনুরোধে আমাকে বলতেই হবে, মোহ। এই মোহের বশেই সব জেনে-শুনেও রাত্রির সম্পর্কে আমার মত তিক্ত হয়ে ওঠে নি ; এর পরও প্রভাতকে নিষ্কলঙ্ক করবার প্রয়াস আমি করেছিলাম।

এই সময় একটি আশ্চর্য চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস আমি পেয়েছিলাম, আগে সেই কথাই বলব ; চরিত্রটি অসাধারণ। অর্থাৎ এত অসাধারণ যে, সব কথা জানবার পরও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না ; মনে হয়, এমন নিগূঢ় কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না, এবং যা দেখতে পেলে, বুঝতে পারলে ওই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে অনায়াসে সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে। অসাধারণকে সাধারণের পর্যায়ভুক্ত করবার কি দুর্দমনীয় আগ্রহ আমাদের ! কোন কিছুর অসাধারণত্ব আমরা যেন সইতে পারি না। মনে হয়, লোকটা সুদক্ষ অভিনেতা ; মনে হয়, মুখোশ প'রে আছে ; কিছুতেই মনে হয় না, লোকটা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু এই ব্যক্তিটির কোন মুখোশ নয়নগোচর অথবা বুদ্ধিগোচর যখন হয় নি, তখন তাঁকে আমি অসাধারণ বলতে বাধ্য। বস্তুত, আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন তাঁকে মোটে অসাধারণ ব'লে মনেই হয় নি। সমস্ত ইতিহাস জানবার পর তবে তাঁর অসাধারণত্ব

সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়েছি। রাত্রির কাহিনীতে এই চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, রাত্রির মায়ের জীবনের বিভিন্ন যুগকে এ চরিত্রটি, শুধু গভীরভাবে নয়, নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে বিভিন্ন সময়ে। সুতরাং, মুখ্যভাবে না হ'লেও গৌণভাবে রাত্রির সঙ্গে এর যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।

বিশ্লেষণ করলে এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কারণ আবিষ্কার করা যায়, যা আমি এ প্রসঙ্গের অবতরণিকায় এইমাত্র বললাম। আমরা সহসা অসাধারণকে অসাধারণ ব'লে চিনতে পারি না, চিনলেও মানতে পারি না,—অহঙ্কারবশে মানতে চাই না। রাত্রির মা পরবর্তী জীবনে যাঁকে গুরুদেব ব'লে সকলের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী জীবনে যদি তাঁর অসাধারণত্বকে মেনে নিতে পারতেন, তা হ'লে এ সব হয়তো কিছুই হ'ত না। রাত্রিরই জন্ম হ'ত না হয়তো।

গুরুদেব-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে দাড়ি-জটা-গেরুয়া-রুদ্রাক্ষ-জাতীয় যে সব জিনিস সাধারণত জড়িত থাকে, রাত্রির মায়ের গুরুদেব রাখালবাবুর সে সব কিছুই ছিল না। নামের পূর্বে স্বামী এবং পরে আনন্দ যোগ ক'রে ধ্বনি-ঝঙ্কার দ্বারা নিজের নাম-মাহাত্ম্য বাড়াবার চেষ্টাও তিনি করেন নি, বস্তুত ধর্ম নিয়ে কোন ভড়ংই ছিল না তাঁর। রাখালবাবু এত বেশি রকম সাদাসিধে ছিলেন যে, তাঁকে দেখলে হঠাৎ নির্বোধ ব'লে সন্দেহ হ'ত। দেহের তুলনায় মাথাটা বড় ছিল তাঁর, চোখ দুটো খুব শান্ত ধরনের ছিল, কিন্তু চোখে অদ্ভুত ধরনের বিস্মিত দৃষ্টি ছিল একটা। মনে হ'ত, সর্বদাই অকৃত্রিম বিস্ময়ভরে যেন তিনি চেয়ে আছেন জগতের পানে। ভাল ক'রে লক্ষ্য না করলেও বোঝা যেত যে, সে বিস্ময় এত গভীর, এত সর্বগ্রাসী যে, অন্য কোন দিকে মন দেবার অবসর নেই তাঁর। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে দেখতে কোন কোন দর্শক যেমন আত্মহারা হয়ে যান, পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না, রাখালবাবুও ঠিক তেমনই যেন বিশ্বরঙ্গমঞ্চের সামনে সবিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিজেও যে একজন অভিনেতা, সে খেয়াল নেই তাঁর, অন্যান্য অভিনেতারা আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর এই বিস্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও যেন তাঁকে সচেতন করতে পারছেন না, বাধ্য হয়ে অন্য একজন অভিনেতা এসে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করছেন, এবং রাখালবাবু একটু স'রে দাঁড়িয়ে সে অভিনয়ও সমান বিস্ময়ে উপভোগ ক'রে চলেছেন। বলা বাহুল্য, এ রকম মনোবৃত্তি অসাধারণ। কিন্তু অসাধারণ কেউ তাঁকে বলে নি। নির্বোধ, কাপুরুষ, পাগল,

এমন কি নপুংসকও কেউ কেউ বলেছে তাঁকে শুনেছি। কিন্তু তিনি এ সব গ্রাহ্য করেন নি, কারণ গ্রাহ্য করবার মত মনোবৃত্তি থাকলে তিনি আত্মহারা অভিনয়-রসিক না হয়ে আত্মপরায়ণ কলাকুশল অভিনেতা হতেন। এই আত্মবিস্মৃত মনোবৃত্তি ছাড়া আর একটা বর্ম ছিল তাঁর, যাতে প্রতিহত হয়ে সমালোচক বীরপুরুষদের বাক্যবাণ সব ভোঁতা হয়ে যেত শুনেছি।—তাঁর সরল হাসিটি। যে যাই বলুক, বিরুদ্ধ সমালোচনা যত বিষাক্ত, যত অসম্মানজনকই হোক না কেন, সরল হাসিটি হেসে তিনি তার নিষ্পত্তি ক'রে ফেলতেন, মনে কোন দাগ পড়ত না। তিনি বোধ হয় ভাবতেন, সমস্তটাই তো অভিনয়, রেগে কি আর হবে! এ সব অবশ্য আমার কল্পনা, কারণ আমি তাঁর বিরুদ্ধ-সমালোচকদের দেখি নি এবং তাঁকেও মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্যে দেখেছিলাম। শুনেছি, আর একটা সুবিধে ছিল রাখালবাবুর, এক জায়গায় তিনি বেশিদিন থাকতেন না, ভারতের নানা স্থানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, প্রধানত তীর্থে তীর্থে। লোকটির পরনে আড়ময়লা কাপড়, হাত-কাটা ফতুয়া, মাথায় কাঁচাপাকা চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা, গোঁফ-দাড়ি অযত্নরক্ষিত, অর্থাৎ যদিও তাঁকে আপাত-দৃষ্টিতে দরিদ্র ব'লে মনে হ'ত, কিন্তু ব্যাঙ্কে তাঁর অনেক টাকা ছিল এবং অধিকাংশই তার ব্যয় করতেন তিনি দেশভ্রমণে। তাঁর সম্বন্ধে এত সব তথ্য আমি পরে সংগ্রহ করেছিলাম—কিছু রাত্রির কাছে, কিছু ধরণীবাবুর কাছে, কিছু নিখিল চৌধুরীর কাছে। কল্পনাও খানিকটা রঙ ফলিয়েছে। তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে। স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় ক'রে মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় গিয়ে প্রথমেই যে লোকটিকে দেখেছিলাম, তিনিই রাখালবাবু। তিনি ফতুয়া প'রে বারান্দার এক ধারে ব'সে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন ফুটপাথের ওপর ক্রীড়ানিরত একটি শিশুকে। শিশুটির মাথায় চুল চুড়ো ক'রে বাঁধা, চোখে কাজল, পরেন রঙচঙে পোশাক। পাশের বাড়িতে বোধ হয় বিয়ে ছিল। কাছেই সার সার বাজনদার ব'সে ছিল আমি বারান্দায় উঠতেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন—তাঁর সেই শান্ত অথচ কৌতূহলী দৃষ্টি। তিনিই যে রাত্রির মায়ের গুরুদেব, তা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। গুরুদেবের অঙ্গে অন্তত একটা গৈরিক বসনও থাকবে—এ প্রত্যাশা করেছিলাম। তাঁকে গোমস্তা-জাতীয় একটা কিছু ভেবে একটু আদেশের ভঙ্গীতেই বলেছিলাম মনে পড়ছে, বাড়ির ভেতরে একবার খবর দাও তো, বল গিয়ে—স্বর্ণেন্দুবাবুর বাসা থেকে ঘনশ্যামবাবু এসেছেন, বড় জরুরি

দরকার। তাঁর সেই সরল হাসিটী হাসলেন তিনি, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে গেলেন। আমি বারান্দাতেই অপেক্ষা ক'রে রইলাম। একটু পরে তিনি ফিরে এসে বললেন, স্বর্ণেন্দুর মা পুজো করতে বসেছেন, আপনি যদি অপেক্ষা করতে পারেন অপেক্ষা করুন, কিংবা যদি ইচ্ছে করেন আমাকেও ব'লে যেতে পারেন—কি দরকার!

এত বড় একটা নিদারুণ সংবাদ ভৃত্য-জাতীয় একটা লোকের কাছে দেওয়া অসমীচীন বোধ ক'রেই যে আমি অপেক্ষা করা স্থির করলাম তা নয়, কারণ কোন কিছু স্থির করবার মত মাথার ঠিক ছিল না আমার। আমি যন্ত্রচালিত-বৎ ঢুকে পড়লাম সামনের ঘরটাতে। রাখালবাবু আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে আবার বাইরে গিয়ে বসলেন। শিশুটি তখনও ফুটপাথে খেলা করছিল।

আমার মনটা তখন এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিল যে, স্বর্ণেন্দুর মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে শুনেই আমি যেন বেঁচে গেলাম, অন্য কোন কারণে নয়, কিছু একটা করতে পেয়ে। বংশীর গলার প্রকাণ্ড ক্ষতটা, রক্তাক্ত স্বর্ণেন্দু, ধরণীবাবুর অন্তর্ধান ও প্রতিবেশীদের নিয়ে আগমন—এ সমস্তকে ছাপিয়ে আমার মনে একটি কথা শিখার মত জ্বলছিল, জ্যোতির্ময়কে নিয়ে রাত্রি স্টেশন থেকে ফেরে নি। বাইরের বারান্দায় যিনি ক্রীড়ানিরত শিশুটিকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর দিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না আমার। আমার অন্যমনস্কতা এবং তাঁর অন্যমনস্কতার অবকাশে তাঁর সঙ্গে সেদিন যতটুকু পরিচয় হয়েছিল, তা স্বল্প ব'লেই স্মৃতি সেটি কৃপণের মত সঞ্চয় ক'রে রেখেছে। তাঁকে সেই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। আর একটু পরিচয় অবশ্য পেয়েছিলাম স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে দেখা হবার পর, অর্থাৎ যখন আবিষ্কার করেছিলাম —ওই আড়ময়লা-কাপড়-পরা আপাতনগণ্য ব্যক্তিটিই রাত্রির মায়ের গুরুদেব, যাঁর সঙ্গে রাত্রির মা ছায়ার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়ান সর্বত্র।

২

কতক্ষণ ব'সে ছিলাম মনে নেই।

কিন্তু এটা এখনও বেশ মনে আছে যে, সীমন্তে চওড়া সিঁদুর এবং টকটকে লালপেড়ে গরদ প'রে স্বর্ণেন্দুর মা এসে যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখনও আমি অসাড়ভাবে ব'সেই ছিলাম খানিকক্ষণ, তারপর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে অসংলগ্ন ভাষায় আবোল-তাবোল কি যে বলেছিলাম, তা মনে নেই;

নিদারুণ দুঃসংবাদটাই জ্ঞাপন করেছিলাম নিশ্চয়।

সমস্ত শুনে স্বর্ণেন্দুর মা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মুখচ্ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধী যেমন ভাবে দণ্ডাজ্ঞা শোনে, ঠিক যেন তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি সব শুনলেন। সব শোনবার পর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন আরও খানিকক্ষণ। তার পর সহসা যেন ভেঙে পড়লেন, ব'সে পড়লেন ঘরের মেঝের ওপর, কাঁদলেন না, একটি কথা বললেন না। আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু না, যদিও তিনি বরাবর আমার দৃষ্টির সামনেই ব'সে ছিলেন, তবু, খুব সম্ভব বরাবর আমি তাঁকে দেখছিলাম না। শব্দটা শোনবার পর আবার যেন তাঁকে নূতন ভঙ্গীতে নূতনরূপে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম। মাথার অবগুণ্ঠন খ'সে পড়েছে, মুখের ওপর ঘাড়ের ওপর পিঠের ওপর বিস্রস্ত হয়ে নেমে এসেছে আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশভার, বিস্ফারিত চোখ দুটো সামনের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত, মেঝের ওপর দু হাতে ভর দিয়ে দুলছেন তিনি, আর তাঁর সমস্ত অন্তর মথিত ক'রে যে আর্ত শব্দটা উঠছে তার অনুরূপ শব্দ আমি শুনেছি প্রসব-বেদনাতুরা জননীর মুখে। খানিকক্ষণ পরে সহসা শব্দটা থেমে গেল। বিস্ফারিত চক্ষু দুটি আরও বিস্ফারিত হয়ে স্থির হযে গেল, স্থির দৃষ্টিতে কি একটা দেখতে লাগলেন যেন তিনি। তারপর সহসা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন, গৌতমের আশ্রম, এক চাপ কালো কলঙ্কের মত কালো পাথরটা এখনও প'ড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি; বৃষ্টিতে গ'লে যায় নি, রোদে ফেটে যায় নি, একটুও ক্ষ'য়ে যায় নি, যুগযুগান্ত ধ'রে ঠিক তেমনই ভাবে প'ড়ে আছে।—এইটুকু ব'লে আবার থেমে গেলেন তিনি, আবার দুলতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে আবার ক্রমশ তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হতে লাগল, আবার কি যেন একটা দেখতে লাগলেন তিনি, আবার দোলা বন্ধ হয়ে গেল, বক্তৃতার ভঙ্গীতে আবার শুরু করলেন, পাষাণী অহল্যা আজও পাষাণস্তূপ হয়ে প'ড়ে আছে, আজও মুক্তি হয় নি তার, অনেক শাস্তি বাকি আছে, অনেক রোদ-বৃষ্টি-বজ্রপাত সহ্য করতে হবে এখনও। তার পর দু হাত মেঝের ওপর প্রসারিত ক'রে লুটিয়ে পড়লেন, কোথায় তুমি নবজলধরশ্যাম রামচন্দ্র, এস, দয়া কর, অভয় চরণের স্পর্শ দিয়ে পাষাণী অহল্যাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও—

নিস্পন্দ দেহটা প'ড়ে রইল মেঝের ওপর। স্বর্ণেন্দুর মুখে শুনেছিলাম, তার মায়ের মাঝে মাঝে 'ভর' হয়—এই কি? হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম,

রাখালবাবু উঠে এসেছেন কখন বারান্দা থেকে এবং সবিস্ময়ে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে। তাঁর সে নির্বিকার অথচ বিস্মিত দৃষ্টি কোন দিন ভুলব না আমি। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি রাত্রির মায়ের পাশে গিয়ে বসলেন। অতিশয় স্নেহভরে তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে আমার মনে হতে লাগল, তিনি ঠিক সান্ত্বনা দিচ্ছেন না, তিনি যেন কোন অভিনেত্রীকে অভিনয়-কুশলতার জন্য নীরবে বাহবা দিচ্ছেন।

চল, ও-ঘরে চল।

রাত্রির মা বেশবাস সম্বৃত ক'রে উঠলেন এবং তাঁর অনুসরণ ক'রে পাশের ঘরে গেলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেলাম—রাখালবাবু বলছেন, তুমি যদি স্বর্ণেন্দুর মকদ্দমার জন্যে থাকতে চাও, থাক, আমি কাল হরিদ্বারে চ'লে যাই, টাকা-কড়ির সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।

তুমি আমাকে থাকতে বল ?

আমি কিছুই বলি না—একটু থেমে—কোন দিনই তো কিছু বলি নি।

তার পর খানিকক্ষণ নীরবতা। তার পর সহসা পাশের বাড়িতে বিয়ের বাজনা বেজে উঠল একসঙ্গে। আর শুনতে পেলাম না কিছু। একটু পরে বেরিয়ে এলেন রাখালবাবু, শান্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে কয়েক সেকেণ্ড, তার পর বললেন, আপনার পুরো নামটা কি ?

ঘনশ্যাম সরকার।

সরকার ? 'আই' দিয়ে বানান করেন, না 'এ' দিয়ে ? 'কে' না 'সি,' সেটাও বলবেন দয়া ক'রে।

বললাম। তিনি একটা ড্রয়ার টেনে একটা চেক-বুক আর কলম বার করলেন, তারপর একটা চেক কেটে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, হাজার টাকার একখানা চেক। চেক থেকে চোখ তুলতেই তিনি বললেন, আমরা কাল হরিদ্বার যাচ্ছি। স্বর্ণেন্দুর মকদ্দমার তদ্বির যাতে হয়, দেখবেন দয়া ক'রে।

ব'লেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি এত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, তাঁকে প্রণাম করতে ভুলে গেলাম।

এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

গোটা পাঁচেক অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণকায় লোক গোটা তিনেক ঢোল আর গোটা দুই সানাই নিয়ে কি ভীষণ শব্দ-প্রভঞ্জন সৃষ্টি করতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ওদের শীর্ণ দেহের পেশীতে যতটা শক্তি আছে সমস্তটা প্রাণপণে প্রয়োগ ক'রে সুর-সৃষ্টি ক'রে চলেছে ওরা, রঙিন-কাপড়-পরা নানা বয়সের এক দল মুগ্ধ শ্রোতাও দাঁড়িয়ে রয়েছে আশেপাশে, আড়ময়লা কয়েকটা রাজহাঁস তাদের বাচ্চাগুলিকে আগলে খুব নির্বিকার ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের কাছে-পিঠেই, বাচ্চাগুলি যেন পাঁশুটে রঙের তুলো দিয়ে তৈরি, ভবিষ্যৎ রাজহাঁস যে ওদের মধ্যে লুকিয়ে আছে বোঝা যায় না সহসা; ঢোল আর সানাই সম্বন্ধে ওরা উদাসীন, রাস্তার নালা থেকে আহার-সংগ্রহের দিকেই ওদের বেশি আগ্রহ।···নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত গাম্ভীর্যকে বিচলিত ক'রে একটা খামখেয়ালী দুরন্ত হাওয়া হুড়োমুড়ি ক'রে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, লুটোপুটি করছে গাছের পাতায়, ছুটোছুটি করছে রাস্তার ধূলোয়, ছেঁড়া কাগজ শুকনো পাতাদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের খেয়াল-খুশিতে। ঢোল আর সানাই সমানে বেজে চলেছে, তাদের উচ্চনিনাদকে বিক্ষত ক'রে একটা কাঠবেড়ালী অশ্বত্থগাছের ডালে পুচ্ছোৎক্ষেপসহকারে ডাকছে—চিক-চিক-চিক। মুচীটা নেই; কইলুর বদলে আর একজন লোক এসেছে, কণ্ঠিপরা ভক্ত-গোছের। ময়দা-কলের আকাশ-চুম্বী চিমনিটা থেকে খুব ঘন কালো রঙের ধোঁয়া খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে কুণ্ডলাকারে বেরুচ্ছে। ঈশান-কোণে পুঞ্জীভূত মেঘটায় মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে, একটু পরে কাল-বৈশাখীর যে তাণ্ডব শুরু হবে, তারই মহড়া চলছে বোধ হয় ওখানে। "সীতারাম, সীতারাম বোলো ভাই"—গর্জন করতে করতে সামনের গলি থেকে ষণ্ডা-গোছের একটি লোক বেরুল, তার হাতে চকচকে একটা ঘটি, কপালের মাঝখানে বড় সিঁদুরের ফোঁটা এদিক ওদিক চেয়ে সশব্দে একবার উদ্গার তুললে, তার পর আবার "সীতারাম বোলো, সীতারাম বোলো ভাই," বলতে বলতে চলে গেল; এক পাল নধরকান্তি গাভী প্রকাণ্ড একটা ষণ্ড-সমভিব্যাহারে হেলতে দুলতে মন্থরগমনে পার হয়ে গেল রাস্তাটা; এক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসল সামনের বাড়ির ছাতে;

একটা ছুটন্ত গরুর গাড়ির ছইয়ের ভেতর থেকে কমলা-রঙের ওড়না গায়ে পরদানশীন একটি মেয়ে পরদাটি একটু ফাঁক ক'রে কৌতূহলভরে দেখতে দেখতে চ'লে গেল।...ভাবছি, বাংলার বাইরে নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের এই পরিবেষ্টনীর মাঝখানে কলকাতা শহরের সেই সন্ধ্যাটি আমি মূর্ত ক'রে তুলতে পারব কি না, যে সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

সেদিন একটু আগেই এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, গুমোট গরমটা আরও যেন বেড়ে উঠেছিল তাতে। নিখিল চৌধুরী ট্রাম থেকে নামলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, ভালই হ'ল, চলুন যাওয়া যাক। আমি প্রায় পনরো দিন কলকাতায় ছিলাম না। বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশে গিয়েছিলাম। সঙ্গে যে কটা বই নিয়েছিলাম, শেষ হয়ে গিয়েছিল। বই কিনতেই বেরিয়েছিলাম একটা পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কতকগুলো উপন্যাস বেছে রেখে দরদস্তুর করতে যাচ্ছিলাম। ভালই হ'ল, চলুন, যাওয়া যাক।—এই কথাগুলো নিখিল যদিও খুব স্বাভাবিক কণ্ঠেই উচ্চারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হ'ল, তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের একটা স্বস্তির নিশ্বাসও যেন নির্গত হ'ল, যে ধরনের স্বস্তির নিশ্বাস কোন মজ্জমান ব্যক্তির বক্ষ ভেদ ক'রে নির্গত হওয়া স্বাভাবিক—সামনে একটা নৌকো বা ভেলা দেখলে। আমি বইগুলোর দাম দিয়ে বগলে ক'রে নিলাম, দরদস্তুর করবার সময় হ'ল না। নিখিল চৌধুরীর পানে তির্যক দৃষ্টীতে একবার চেয়ে বললাম, কেন, ব্যাপার কি?

বিরক্তিকর, চলুন না।

মজ্জমান ব্যক্তির নিশ্বাসের আভাস আর পেলাম না, নিখিল তখন সামলে নিয়েছেন। নীরবে অনুসরণ করলাম নিখিল চৌধুরীকে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড় তখন চতুর্মুখী জন-স্রোতের সংঘর্ষে তুমুল হয়ে উঠেছে চারিদিকে সারি সারি ট্রাম, সারি সারি মোটর, রিক্‌শ, ফিটন-গাড়ি, গরুর গাড়ি, ফেরিওয়ালা, ঝাঁকামুটে, খবরের কাগজের হকার, প্যাচপেচে কাদা, অসংখ্য মানুষ নানা রকমের। আমরা একটু স'রে গিয়ে দেলখোশ কেবিনের সামনা-সামনি হ্যারিসন রোডটা পেরিয়ে যাব ঠিক করলাম ট্রামগুলো বেরিয়ে গেলেই। সারি সারি অনেকগুলো ট্রাম দাঁড়িয়ে ছিল, একটা গরুর গাড়ি উল্টেছিল ট্রাম-লাইনে। পিছু ফিরে দেখলাম, দেলখোশ কেবিন উপচে পড়ছে, একটুও স্থান নেই, এক কাপ চা খেয়ে সময়টা অতিবাহিত করবার ইচ্ছাটিকে

বিসর্জন দিতে হ'ল ; সামনে নবীন ফার্মেসির দোকানে লাল নীল রঙের জল-পোরা বড় বড় কাচের জালাগুলো ইলেক্‌ট্রিক আলোর দৌলতে বিস্ময়জনক হয়ে উঠেছে ; কেষ্টদাস পালের প্রতিমূর্তির নীচে বেলফুলের মালা, নানা রকম ছবি, টুকি-টাকি জিনিস, লাল রঙের চীনে ফানুস বিক্রি হচ্ছে ; ওভারটুন হলে কোন বক্তৃতা হচ্ছিল বোধ হয়, শেষ হয়ে গেল, গলগল ক'রে লোক বেরুতে লাগল ওয়াই. এম. সি, এ.-র দরজা দিয়ে। নিখিল চৌধুরী যে ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, ক্ষণিকের জন্যে সে কথাও ভুলে গেলাম অন্যমনস্ক হয়ে। কলকাতা শহরে প্রতি মুহূর্তে এত বিচিত্র উত্তেজনা যে, কোন উত্তেজনাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পায় না, ছায়াবাজির মত হয় আর মিলিয়ে যায়। সচেতন মনের ওপর দিয়ে প্রতিক্ষণেই নতুন একটা মিছিল চলছে যেন। মানুষ কতক্ষণ মনে রাখবে, কাকে মনে রাখবে? চলমান মিছিলের প্রতি অংশটাই সচল, বিস্ময়কর, উত্তেজনাজনক। মন দিশাহারা হবে আত্মরক্ষার্থেই বোধ হয় উদাসীন হয়ে পড়ে শেষটা। না, ঠিক সেই মুহূর্তে দু মাস আগের ঘটনা আমার মনে ছিল না। সেই মুহূর্তে আমি মোড়ের ঘড়িটার দিকে চেয়ে সক্ষোভে ভাবছিলাম, এম্পায়ারে আজ ভাল একটা নাচ ছিল, নিখিল চৌধুরীর পাল্লায় প'ড়ে যাওয়া হ'ল না। হঠাৎ ট্রাম-লাইন পরিষ্কার হয়ে গেল, ঘড়াং ঘড়াং শব্দ ক'রে ট্রামগুলো চলতে লাগল, আমার দুজনে ট্যাক্সি রিক্‌শ জনতার ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হ্যারিসন রোড পার হয়ে গেলাম।

নিখিলবাবু আর একটিও কথা বলেন নি। গলিতে ঢুকে আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম ব্যাপার কি বলুন তো, চামেলি আজ ভাল কিছু রেঁধেছে নাকি? নিখিল চৌধুরী গলিতে ঢুকেই পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করেছিলেন, আমার কথা শুনেই ঢাকনি খুলে এক টিপ তুলে নিলেন এবং আমার দিকে চকিতে এক নজর চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে নস্যিটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে রুমাল দিয়ে নাকের আশপাশ ঝেড়ে পুনরায় ভাল ক'রে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি আমাকে যেন কশাঘাত করলে। আমি বিস্মিত হয়ে পুনরায় বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো?

নিখিলবাবু স্ফুটকণ্ঠে একটু ধমকের সুরে বললেন, চলুন!

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর!

নীরবেই পথ অতিবাহন করতে লাগলাম দুজনে।

২

নিখিলবাবুর বাসার ছাতে দুজনে নীরবে ব'সে ছিলাম। কাছে কোন আলো ছিল না। পাড়াতেই কাদের বাড়িতে যেন গ্রামোফোন বাজছিল। হু-হু ক'রে একটা দক্ষিণে বাতাস উঠল। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে ব'সে ছিলাম। স্বর্ণেন্দুর বিচারের শেষ নিষ্পত্তি যে হয়ে গিয়েছে, তা আমি জানতাম না। আমি যে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে ইচ্ছে ক'রে নির্বিকার হয়ে ছিলাম তা নয়, হাজার টাকার চেক দিয়ে রাখালবাবু আমাকে যে অনুরোধ করেছিলেন দু মাস আগে, আমি যে তার মর্যাদা রক্ষা করি নি তাও নয়। আমি সেই দিনই চেকটা নিখিলবাবুর হাতে দিয়ে তাঁকে ব'লে এসেছিলাম, আইনত বে-আইনত যে কোন উপায়ে হোক স্বর্ণেন্দুকে বাঁচাতে হবে। নিখিলবাবু রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু চেকটি তিনি ভাঙাতে চান নি, পরে ভাঙিয়েছিলেন কি না, তা আমি জানি না। নিখিলবাবু ভাল উকিল, স্বর্ণেন্দুর আত্মীয়। যতটা করা সম্ভব ততটা তিনি নিশ্চয় করবেন—এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর ক'রেই যে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম—এটা ওজুহাতস্বরূপ খাড়া করতে পারি, কিন্তু কারণটা আসলে তা নয়। তা ছাড়া আমি স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে সত্যিই নির্বিকার ছিলাম না, সত্যিই তার কথা উদ্বিগ্নভাবে আমি ভাবতাম মাঝে মাঝে। সে যে নির্দোষ, সে সম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু এটা ঠিক, স্বর্ণেন্দুর চেয়ে রাত্রির কথাই আমি বেশি ভেবেছি, যদিও তার মধ্যেও যে বিস্মৃতি ছিল না, তা নয়। এদের সম্বন্ধে আমার মন সর্বতোভাবে সর্বদা উন্মুখ ছিল না, তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, আমার চিত্তবৃত্তি মানবীয়, কোন উত্তেজনার প্রভাবেই উৎসাহের উচ্চশীর্ষে বেশিক্ষণ টিঁকে থাকতে পারে না, নেমে পড়ে। স্বর্ণেন্দুকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবার পরদিন থেকেই তা নামতে শুরু করেছিল এবং সাত দিনের মধ্যেই কলিকাতা শহরের এবং আমার ডাক্তারী-জীবনের নব নব উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত পুর্ণেন্দুবাবুর ভার যখন তাঁর এক মামাতো ভাই এসে নিলেন এবং তাঁর দূর-সম্পর্কের জামাই নিখিলবাবু যখন তাঁর তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব স্বীকার করলেন, তখন আমার আর কিছুই করবার রইল না। বস্তুত সামাজিক কোন বন্ধন না থাকাতে আমি আরও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এদের সঙ্গে আমার বন্ধনটা সত্যই আকস্মিক। সেদিন স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে রাত্রি যদি আমাকে অভিভূত না করত, তা হলে আমি এদের নিয়ে মোটেই

মাথা ঘামাতাম না, স্বর্ণেন্দুকে ভাল ক'রে লক্ষ্য করবার সুযোগ, এমন কি প্রেরণাও পেতাম না সম্ভবত। কর্তব্যবোধে আমি স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে জেলে একবার দেখা করতেও চেয়েছিলাম, স্বর্ণেন্দুই দেখা করে নি। আইনের কবলে প'ড়ে বংশীর চিকিৎসক হিসেবে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে হয়েছিল। আমি যা জানতাম, (যা সন্দেহ করতাম, তা নয়) যথাযথ বলেছিলাম সত্যনিষ্ঠার জন্যে নয়, বাধ্য হয়ে। বানিয়ে দু-চারটে মিছে কথা বললে স্বর্ণেন্দুর যদি কোন সুবিধে হ'ত, আমি নিশ্চয়ই বলতাম; কিন্তু সে সুযোগই পাওয়া যায় নি। সেদিন সকালে সেই যে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ছোট্ট হাসিটি হেসে স্বর্ণেন্দু আমাকে বলেছিল—আমি করেছি, সে কথা আর সে প্রত্যাহার করে নি। যে নিজের দোষ স্বীকার করে, তাকে আইনের কবল থেকে বাঁচাবে কে?

শুধু নিজের মুখে নয়, নিজের হাতে লিখে সে দোষ স্বীকার করেছিল। সে লিখে দিয়েছিল যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা তার মা মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় তাঁর গুরুদেবের কাছে চ'লে গিয়েছিলেন, তার বোন রাত্রিও মধুপুরে যাবার জন্যে চ'লে গিয়েছিল ভোরবেলা, পাশের ঘরে বাবা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উত্থানশক্তিরহিত—এই সুযোগ সে স্বহস্তে ছোরা দিয়ে বংশীকে খুন করেছিল কোন বিশেষ কারণে। কারণটা কি, তা সে বলবে না।

পুলিস স্বর্ণেন্দুর মা, স্বর্ণেন্দুর বাবা এবং রাত্রিকেও তলব করেছিল সাক্ষী হিসেবে। স্বর্ণেন্দুর বাবা কিছুই শোনেন নি। পুলিস আসবার সময় তাঁকে একটু আড়ালে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তার পর সেই দিনই তাঁকে তাঁর মামাতো ভায়ের বাড়িতে সরিয়ে ফেলা হয়। তিনি নাকি বাঁ হাতে লিখে লিখে স্বর্ণেন্দু, রাত্রি এবং বংশীর কথা জিজ্ঞেস করতেন নিখিলবাবুকে—কোথায় গেল এরা সব? নিখিলবাবু নানা রকম মিছে কথা ব'লে স্তোক দিতেন। স্বর্ণেন্দুর বাবাকে সাক্ষী দিতে হয় নি, নিখিলবাবু পুলিসকে ব'লে সে ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। স্বর্ণেন্দুর মা সাক্ষী দিতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ ঠিক সেই দিনটি আমি কলকাতার বাইরে ছিলাম। স্বর্ণেন্দুর মা স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, স্বর্ণেন্দু দেখা করে নি। রাত্রিকে মধুপুরে পাওয়া যায় নি। তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল বম্বেতে একটা হোটেলে, সেখানে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে সে ছিল। তার অসুখ করেছিল ব'লেই সে নাকি আসতে পারে নি, তার বদলে একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট এসেছিল।

তবু কমিশনে সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল তার। সে বলেছিল, সে বংশীকে অসুস্থ দেখে এসেছিল, এর বেশি আর কিছু সে জানে না। স্বর্ণেন্দু তার স্বীকারোক্তির এক বর্ণও প্রত্যাহার করে নি। নিখিলবাবু যে শেষ চেষ্টা করেছিলেন, তাও সফল হয় নি। কিছুতেই তাকে পাগল বলে প্রমাণ করা গেল না। ডাক্তারেরা পর্যবেক্ষণ ক'রে মত দিলেন যে, তার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ। সে রীতিমত খায়, ঘুমোয়, সুস্থ লোকের মত আলাপ করে।···সব শেষ হয়ে যাবার পর নিখিল চৌধুরীর মুখে আমাকে এই সব বিবরণ শুনতে হচ্ছিল। আমি নিজে সাগ্রহে ঔৎসুক্যভরে স্বয়ং এগুলো সংগ্রহ করি নি ব'লে নিজের কাছেই কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলাম। দূরে গ্রামোফোন বাজছিল, হু-হু ক'রে দক্ষিণে হাওয়াটা বইছিল, নিখিলবাবুর ছাতে অন্ধকারে একটু অপ্রস্তুত হয়ে ব'সে ছিলাম আমি।

এ সব সত্ত্বেও ওর হয়তো ফাঁসি হত না, যদি না অ্যানার্কইজ্‌মের ফ্যাকড়াটা উঠত।—এই বলে নিখিল চৌধুরী সশব্দে নস্যি টেনে নিলেন।

অ্যানার্কিজ্‌মের ফ্যাঁকড়া মানে?

আপনি শোনেন নি কিছু?

মনে মনে আর একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, না।

পুলিস স্বর্ণেন্দুকে একজন ফেরারী অ্যানার্কিস্ট ব'লে সনাক্ত করেছিল, একটা নয়, দু-তিনটে পলিটিক্যাল খুনের সঙ্গে ওর নাকি যোগ ছিল, ওকেই ওরা নাকি খুঁজছিল, বংশীর অ্যাপ্রুভার হবার সম্ভাবনা ছিল ব'লেই নাকি বংশীকে ও খুন করেছে—এই ওদের থিওরি।

নিখিল চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন এবং ছাতে পায়চারি করতে লাগলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

বিরক্তিকর!

আবার এসে বসলেন নিখিল চৌধুরী।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে নিষ্ফল আক্রোশে যেন চাপা গর্জন ক'রে বললেন, আর জানেন, স্বর্ণেন্দু হাসিমুখে তাও মেনে নিলে! ড্যাম হিজ হাসি!

আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটু ইতস্তত ক'রে এবং রূঢ় সত্যটা শোনবার জন্যে মনকে যথাসম্ভব প্রস্তুত ক'রে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার ফাঁসির দিন কবে?

ফাঁসি কাল হয়ে গেছে।

হাওয়াটা থেমে গেল না, দূরের বাড়ির গ্রামোফোনও সমানে বাজতে লাগল। চামেলি এসে খবর দিলে, খাবার দেওয়া হয়েছে। নীরবে নীচে নেমে গেলাম। ফাউলের ফ্রেঞ্চ কাট্‌লেট, সুগন্ধি রূদনি চালের ভাত, চমৎকার মুগের ডাল—সবই উপাদেয় হয়েছিল। তবু কি একটা তুচ্ছ কারণে চামেলিকে ধমকালেন নিখিলবাবু। চামেলি নীরবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল হাসিমুখে। অর্থাৎ সবই যেমন হয়, হতে থাকল। স্বর্ণেন্দুর ফাঁসি হয়ে গেছে ব'লে কিছুই আটকাল না, কিছুই বদলাল না। স্বর্ণেন্দু যে নির্দোষ, এ কথা নিঃসংশয়ে জেনেও আমার আহারে রুচি কিছুমাত্র কমল না, আমি বেশ খেতে লাগলাম। স্বর্ণেন্দু আদালতে যে মিছে কথা বলেছিল, তার একটা প্রমাণ তো এখনই স্বকর্ণে শুনলাম। রাত্রির যে সেদিন ভোরে মধুপুর চ'লে যাওয়ার কথা ছিল না, স্বর্ণেন্দু তা জানত। রাত্রি স্টেশনে গিয়েছিল জ্যোতির্ময়কে আনতে, কিন্তু ফেরে নি।

নিখিলবাবু তৃতীয় কাট্‌লেটটি নিঃশেষ ক'রে চতুর্থটি আক্রমণ করতে করতে সহসা বললেন, কিন্তু এই দুঃসংবাদটা দেবার জন্যেই আপনাকে টেনে আনি নি। অধিকতর দুঃসংবাদ একটা আছে।

আবার কি?

রাত্রি পরশুদিন আসছে অবনীশের সঙ্গে বম্বে থেকে।

এই সংবাদে আমার মুখভাব কি রকম হয়েছিল, তা বলতে পারি না; কিন্তু তা লক্ষ্য ক'রেই নিখিলবাবু সম্ভবত বললেন, অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলে চলবে না, আপনাকেই ধাক্কাটা সামলাতে হবে। তারা আমার বাসাতেই এসে উঠবে লিখেছে। অবনীশবাবু লিখেছেন, কি একটা জরুরি কাজ আছে তাঁর। কিন্তু আমি থাকব না, আপনিই জরুরি দরকাটা সামলে দেবেন আমার হয়ে।

আপনি কোথা যাচ্ছেন?

অপ্রত্যাশিত একটা সংবাদ দিলেন নিখিল চৌধুরী।

বিয়ে করতে।

বিয়ে করতে! এতদিন পরে হঠাৎ এ খেয়াল?

খেয়াল নয়, প্রয়োজন। স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করতে গেলে বিয়ে করা দরকার। অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই সুখে থাকতে পারে, আমরা পারি না।

তার পর একটু হেসে বললেন, তা ছাড়া চামেলিটাকে শায়েস্তা করবার

লোক দরকার একজন। এদানীং ও বড্ড বেড়েছে।

ঠিক উৎসুক হয়েছিলাম ব'লে নয়, এই প্রসঙ্গে একটা কিছু বলতে হয় ব'লে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বিয়ে করছেন ?

ঘোর পাড়াগাঁয়ে, কালো কুচ্ছিত একটা হাঁদা মেয়েকে। তার একমাত্র গুণ, সে স্বাস্থ্যবতী। সুন্দরী স্লিম বুদ্ধিমতী দেখে দেখে অরুচি জন্মে গেছে।

নিরর্থক জেনেও বললাম, আপনার মত লোকের এ রকম বিয়ে করার—

আমার কথা শেষ হতে না দিয়েই নিখিল বললেন, বংশরক্ষার্থে। এবং তার পর একটু থেমে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর !

উভয়ে নীরবেই আহার করতে লাগলাম।

আমার মনের মধ্যে একটি চিন্তা মেঘের মত নানা ভাবে নিজেকে প্রসারিত করছিল,—রাত্রি আসছে, জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে নয়, অবনীশের সঙ্গে। স্বর্ণেন্দু নেই, নিখিলবাবুও থাকবেন না।

সহসা প্রভঞ্জন থেমে গেল।

সানাই ঢোল একসঙ্গে নীরব হ'ল। নিবিড় স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। স্তব্ধতাকে বিক্ষত ক'রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাঠবেড়ালীটা ডাকছে কেবল, চিক-চিক-চিক-চিক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

কার্যকারণের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এর পরে যা ঘটেছিল, তারও একাধিক কারণ ছিল, যদিও সে কারণগুলো তখন আমার মনে তত স্পষ্ট ছিল না, এখন যতটা হয়েছে। সমস্ত জিনিসটা পর্যালোচনা ক'রে এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি (যদিও সেটা মাসীর গোঁফ গজালে মামা হ'ত গোছ হাস্যকর সিদ্ধান্ত), যাই হোক, এই কথাটাই এখন আমার মনে হয় যে, অবনীশের ব্যবসায় এবং সামাজিক বুদ্ধি যদি আর একটু কম প্রকট হ'ত, সেদিন গভীর নিশীথে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে রাত্রির কান্না যদি না দেখতাম এবং মোহের প্ররোচনায় প'ড়ে নিজেকে কুসংস্কারহীন অতি-আধুনিক

আত্মত্যাগী ব'লে, শুধু প্রচার নয়—প্রমাণ করবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা যদি আমাকে না পেয়ে বসত, তা হ'লে হয়তো এমন হ'ত না। শেষোক্ত কারণটাকেই মুখ্য বলতে আমি রাজী নই—যদিও ধরণীবাবু এবং নিখিল চৌধুরীর তাই মত,• কারণ আগের দুটোর অস্তিত্ব না থাকলে আমার মোহ নিজেকে জাহির করবার সুযোগ এবং সম্ভবত প্রেরণাও পেত না। গাছের উদ্ভবের জন্যে মাটি এবং বীজ উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

অবনীশের কথা চিন্তা করলেই আমার খুব ছেলেবেলায় দেখা এক স্টেশন-মাস্টারের কথা মনে পড়ে। স্টেশনের নাম মনে নেই, কোন্ রেলওয়ে তাও মনে নেই, তবে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। স্টেশনটা খুব ছোট, এক মিনিটের বেশি কোন গাড়িই সেখানে বোধ হয় থামে না। স্টেশনেরই এক অংশে স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টার। চারিদিকে ধু-ধু করছে মাঠ। আমাদের ট্রেন যখন সেখানে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। অস্তগামী সূর্যের লাল আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্টেশনের পাশেই একটি নধরকান্তি গাই বাঁধা রয়েছে, আর নিকটেই একটি বলিষ্ঠ-গঠন প্রৌঢ় ব্যক্তি হেঁট মুখে, খালি গায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে জাব মেখে চলেছেন। দু হাতের কনুই পর্যন্ত খোল-খড়-মাখা। ট্রেন এসে দাঁড়াতেই তিনি জাবের ডাবা থেকে মুখ তুলে ডাকলেন, কই রে ফাগুয়া? ফাগুয়া স্টেশনের ভেতর থেকে একটা টুপি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল এবং সেটা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে। টুপিতে লেখা রয়েছে—এস. এম.। তিনি খোল-খড়-মাখা ডান হাতটা তুলে বললেন, অল রাইট, অল রাইট। ফাগুয়া ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজালে, লাইন ক্লিয়ার দিলে, গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিলেন, ট্রেন চলতে লাগল। অবনীশের সঙ্গে এই স্টেশন-মাস্টারের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য নেই, কিন্তু মূলত মিল আছে। দুজনেই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ঘোর স্বার্থপর, দুজনেই শ্যাম এবং কুল দুই-ই বজায় রাখতে অশোভনভাবে ব্যস্ত। অবনীশের চেহারাটা দেখে হঠাৎ তাকে খুব খারাপ লোক ব'লে মনে হয় না। খুব বেঁটে সায়েবী-পোশাক-পরা শ্যামবর্ণ লোকটি, পুরু ঠোঁট, ভুঁড়ো নাক, কিন্তু সমস্ত মুখখানাতে এমন একটা সদা-সপ্রতিভ ভাব আছে যে, তাতেই মুখখানা কিঞ্চিৎ শ্রীসম্পন্ন হয়েছে। দেখলেই, অর্থাৎ পরিচয় পাওয়ার আগে, মনে হয়, লোকটি নির্ভর-যোগ্য, ভেতরে শক্তি আছে। পরিচয় পেলে মনে হয়, শক্তি আছে বটে, কিন্তু সে শক্তির এক বিন্দু তিনি অপচয় অর্থাৎ অপরের জন্যে ব্যয় করতে রাজী নন। মাথায় হ্যাট আছে, ছোট একটি টিকিও আছে। দুটোই তিনি শিরোধার্য

করেছেন, আমার মনে হয়, ব্যবসার খাতিরে ; নিরামিষ আহার করাটাও বোধ হয় ব্যবসার অঙ্গ। এ দেশে বিশুদ্ধ ঘিয়ের ব্যবসা করতে হ'লে এ সব চাই।

চামেলির মুখে যখন খবর পেলাম যে, রাত্রিকে নিয়ে অবনীশবাবু এসে পৌঁছেছেন, তখন আমার মনে আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেক দিন আগে শোনা স্বর্ণেন্দুর কথাগুলো মনে হয়েছিল—সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বলবে না ব'লে সব জেনে-শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না? ভয় হয়েছিল, প্রবল-পরাক্রান্ত অবনীশের কবল থেকে রাত্রিকে উদ্ধার করবার মত সামর্থ্য হয়তো আমার নেই। রাত্রির ওপর আমার কি জোর আছে, কোন্ অধিকারে আমি এর বিরুদ্ধাচরণ করব?

নিখিলবাবুর বাসায় এসেই অবনীশের সঙ্গে দেখা হ'ল। নীচের বসবার ঘরে একাই ব'সে ছিলেন তিনি, হাতে একটা পেন্সিল ছিল। আমাকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সপ্রতিভভাবে বললেন, আসুন, আপনিই আশা করি ডক্টর সরকার। আমি অবনীশ।

নমস্কারান্তে বসলাম।

আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আবার বললেন, আচ্ছা, বাই এনি চান্স, আপনি বড়বাজারের ঘিয়ের আড়তদার কাউকে চেনেন?

না।

কোনও ব্রোকার?

না।

ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে পেন্সিল দিয়ে সামনের একটা দাঁতে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলেন চিন্তিত মুখে। তার পর হঠাৎ টেলিফোন-গাইডটা খুলে একটা নম্বর খুঁজে বার ক'রে ফোন করলেন কাকে, ফোনে ঘি সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল হিন্দীতে।

এতদিন অবনীশ আর রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে পূর্বরাগরঞ্জিত যে কুয়াশাটা আমার মনে সঞ্চিত হয়েছিল, একটা আচমকা দমকা হাওয়ায় সেটা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। ফুটকি দিয়ে আঁকা এক রকম ছবি আছে, দু দিক থেকে দু রকম দেখায়। একই ছবি এক দিক থেকে দেখলে হয়তো রমণীর মুখ, উল্টো দিক থেকে দেখলে ওরাংওটাং। ছবিটাকে উল্টো দিক থেকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম আমি।

হাঁ হাঁ, আভি, তুরন্ত্।

রিসিভারটা নামিয়ে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। মাথার সামনের কেশবিরল অংশটায় হাত বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন ডক্টর সরকার, ট্যাক্সিতেই আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। দুটো কথা আছে আপনার সঙ্গে। নিখিলবাবু যখন নেই, তখন আপনাকেই ব'লে যাই, নেক্স্‌ট বেস্ট ম্যান।

কোথা যাবেন আপনি?

বেশি দূর নয়, বড়বাজার। তার পর একটা হোটেল ঠিক করতে হবে আমাকে আজ রাত্রের মতন। কালই আমি ফিরে যাব, হয়তো আর দেখাই হবে না আপনার সঙ্গে।

দু হাত দিয়ে টেনে তিনি প্যাণ্টালুনটা ঠিক ক'রে নিলেন।

হোটেল কেন?

একটু হেসে অবনীশ বললেন, আমি থাকব।

রাত্রি আসে নি? সে কোথায়?

সে ওপরে আছে, সে এখানেই থাকবে। চলুন।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে দুজনে চ'ড়ে বসলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে অবনীশ কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়ে বললেন, দেখুন, আপনার কথা শুনেছি আমি অনেক, আপনার লেখাও পড়েছি, সেই জন্যেই ভরসা করছি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম।

অবনীশ আবার বললেন, এ বাড়িতে আমি রাত কাটাতে চাই না। গাড়িতেও আমরা একসঙ্গে আসি নি, দুটো আলাদা আলাদা কম্পার্টমেণ্টে ছিলাম।

এতে আমার বিস্ময় বাড়ল দেখে তিনি একটু হেসে বললেন, আলাদা আলাদা যে ছিলাম, তার ডকুমেণ্টারি প্রমাণ রাখবার জন্যে পয়সা খরচ ক'রে ভিন্ন দুটো কম্পার্টমেণ্টে বার্থ রিজার্ভ করিয়ে এসেছি। এখানেও হোটেলে থাকতে চাই, ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স একটা থাকবে।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। বললাম, এর মানে কি?

মানে কি, আপনারা ডাক্তার মানুষ দুদিনেই বুঝতে পারবেন। স্বর্ণেন্দুর বন্ধু হিসেবে যেটুকু কর্তব্য ছিল করলাম, তাকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। পূর্ণেন্দুবাবুর বর্তমান ঠিকানাটা খুঁজে সেইখানেই পৌঁছে দেবেন আপনারা—যদি দরকার মনে করেন। আমি হাত ধুয়ে ফিরে যেতে চাই।

জ্যোতির্ময়বাবু কোথায় ?

একটা অদ্ভুত রকম হাসি হাসলেন অবনীশ।

আহ্ আহ্ আহ্ আহ্—ঈষৎ মুখ ফাঁক ক'রে খুব আস্তে আস্তে এই শব্দটা করলেন। তার পর বললেন, আপনি জ্যোতির্ময়বাবুর কথা জানেন তা হ'লে ?

শুনেছি কিছু।

আরও শুনবেন ক্রমশ।

তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। ভুঁড়ো নাকের নীচে পুরু ঠোঁট দুটো কি যেন বলি বলি ক'রে চেপে গেল।

জ্যোতির্ময়বাবু কোথায় এখন ?

প্যারিসে। কিছু টাকা যোগাড় ক'রে তিনি প্যারিসে চ'লে গেছেন আর্ট-চর্চা করবার জন্যে। আর্টিস্ট লোক।

চুপ ক'রে ব'সে রইলাম আমি।

অবনীশ বড়বাজারে ট্যাক্সি থামিয়ে নানা দোকানে ঘুরলেন। একটা গলির ভেতর ঢুকে গেলেন শেষে। আমি ট্যাক্সিতেই চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। স্টেশন-মাস্টারের ছবিটা ফুটে উঠল মনে। মনে হ'ল, চাকরির সময় উর্ধ্বশ্বাসে গরুর জাব-দেওয়ার মধ্যে খাঁটি-দুগ্ধ-লোলুপ যে মনের পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম, আমাদের অধিকাংশের মনোবৃত্তি হয়তো ওই। জীবনের আনন্দ গৃহস্থালিতে—চাকরিতে নয়, চাকরিটা বজায় রাখতে চাই গৃহস্থালির সুবিধে হবে ব'লে। গৃহস্থালির সঙ্গে চাকরির বিরোধ যদি কোনদিন দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে, তখন স্টেশন-মাস্টারকে চাকরিটাই ছাড়তে হবে, গৃহস্থালিটা নয়। সব রকম বাঁচিয়ে যদি প্রেম করা চলত, অবনীশ রাজী ছিলেন। কিন্তু নিজের সুনাম ক্ষতবিক্ষত ক'রে ? এই রকম মেয়ের সঙ্গে ? অবনীশ মোটেই তাতে রাজী নন। প্রয়োজন হ'লে শুধু টিকি আর নিরামিষ আহারের নজিরেই নয়, দলিলের জোরে তিনি প্রমাণ করবেন যে, রাত্রির সঙ্গে কলঙ্কজনক কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁর হয় নি। তিনি নিজের ব্যবসার খাতিরে কলকাতা এসেছিলেন, বন্ধুর বোন হিসাবে ভিন্ন কম্পার্টমেণ্টে ভিন্ন বার্থে অধিষ্ঠিতা রাত্রির একটু-আধটু খোঁজ-খবর মাত্র করেছিলেন তিনি, আর কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে অবনীশ ফিরে এলেন।

ফিরে এসে বললেন, যাক্, হাজার টাকার বিজ্‌নেস হ'ল। ট্রিপটা নেহাত বৃথায় গেল না।

আমি ভদ্রতার খাতিরে সায় দিয়ে মুচকি হাসলাম।

অবনীশ নামজাদা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন এবং ট্যাক্সিওয়ালাটাকে ব'লে দিলেন, আমাকে যেন বেনেটোলায় পৌঁছে দেয় সে, তার জন্যে ভাড়াটাও দিলেন তাকে অগ্রিম।

গুড নাইট।

গুড নাইট।

জনতা ভেদ ক'রে ট্যাক্সি ছুটতে লাগল।

আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

২

"আপনারা কি আশা করেন, বংশীর সেই কুৎসিত প্রলাপ জ্যোতির্ময় এসে শুনবে, এ সম্ভাবনা জেনেও আমি চুপ ক'রে বসে থাকব? আমি? কিন্তু স্টেশনে গিয়ে দেখলাম, জ্যোতির্ময়ের আসা চলবে না, সবিতার স্বপ্নে তার দুটি চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। দেখলাম, আমার দিকে চেয়ে সে ভাবছে সবিতাকে। এ দেখবার পরও কি আমি তাকে সবিতার বাড়ি যেতে দেবার সুযোগ দিতে পারি? তা ছাড়া সে এসেই হয়তো পুলিসের হাতে পড়ত। সবিতা, পুলিস। —কিছুতেই তাকে আসতে দিলাম না। কেমন ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম? আলেয়া যেমন ক'রে পথিকের পথ ভোলায়, বাঘিনী যেমন ক'রে অসহায় হরিণের ঘাড় মটকে তাকে অনায়াসে পিঠে ক'রে তুলে নিয়ে যায়, তেমনই করে। কিন্তু তবু সে রইল না। যে হরিণটাকে মরা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম, হঠাৎ সেটা আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে তড়াক ক'রে উঠে গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল চকিতের মধ্যে।" না, রাত্রি এ সব কথা বলে নি। আমি কল্পনা করেছিলাম, যেন রাত্রি বলছে। রাত্রিকে আমি এ সব বিষয়ে প্রশ্নই করি নি কোনদিন। অবকাশ হয় নি ব'লে নয়, সাহস হয় নি, ভদ্রতায় বেধেছিল। তা ছাড়া লোকে প্রশ্ন করে সংশয় নিরসনের জন্যে, আমার মনে কোন সংশয় ছিল না। আর একদল অভদ্র লোক সব জেনে-শুনে প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত করবার জন্যে। এ সব প্রশ্ন ক'রে রাত্রিকে আমি অপ্রস্তুত করতে পারতাম কি না, জানি না; কিন্তু তাকে অপ্রস্তুত করবার বাসনাই আমার মনে হয় নি কোন দিন।

আমি কল্পনা করেছিলাম। সেদিন রাত্রে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে

দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের বিছানায় রোরুদ্যমানা রাত্রিকে দেখে অনেক রকম কল্পনা করেছিলাম আমি। মেঘভারাক্রান্ত নিবিড় রাত্রি অন্ধকারে লুকিয়ে কাঁদছিল। আমি সে কান্না দেখেছিলাম, শুনেছিলাম, কেমন যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। জলে বরফ যেমন গ'লে যায়, তেমনই আমার মনের জমাট সংস্কারগুলো ধীরে ধীরে গ'লে যাচ্ছিল। শ্রাবণশর্বরীর নিরবচ্ছিন্ন ধারা-বর্ষণ অন্তরলোকে যে নিবিড় রহস্যলোক সৃজন করে, সে রহস্যলোকের নিগূঢ় অস্পষ্টতায় যেমন বুদ্ধিবৃত্তির কোন যুক্তি চলে না, একটা সশঙ্ক উৎকর্ণ অনুভূতি অবুঝের মত রুদ্ধশ্বাসে অনির্দ্দিষ্ট একটা কিছুর প্রত্যাশা করে যেমন প্রতি মুহূর্তে, তেমনই আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো অসম্ভব সম্ভবপর হয়ে উঠবে, হয়তো রাত্রি এখনই উঠে বসে চিৎকার ক'রে বলবে, আমি তোমাদের আইন মানি না, ধর্ম মানি না, কিছু মানি না, আমি কেবল আমাকেই মানি; আমি আছি ব'লেই তোমরা আছ, জগৎ-সংসার আছে,—আমার আমিত্বটাকে চেপে পিষে দ'লে মেরে ফেলতে দেব না, দেব না, দেব না; পারবে না তোমরা, কিছুতেই আমাকে এঁটে উঠতে পারবে না, তোমাদের সমস্ত আইন ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে আমি নিজেকে জাহির করবই।

কিন্তু কিছুই সে বলে নি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে প'ড়ে অঝোরঝরে কাঁদছিল সে। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আমি যে দেখছিলাম, তা সে জানত না। তার দুর্বল মুহূর্তে তাকে যে একদিন দেখেছিলাম, সে কথা কোনদিন তাকে বলি নি। তার ধারণা, সম্রাজ্ঞীর মত অনুকম্পা ভরেই সে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি যেন আমার নিজের গরজেই তার কাছে কৃপা ভিক্ষা করেছিলাম, এবং উদারতা-চর্চা করবার সুযোগটা দিয়ে সে যেন আমাকে কৃতার্থ করেছিল। তার ভূলুণ্ঠিত সত্তার আকুল ক্রন্দন যে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সে কথা তাকে জানিয়ে কি লাভ হত আমার? তাকে শুধু ছোট করা হ'ত, সঙ্কুচিত করা হ'ত, তার পরাজিত বিধ্বস্ত অহমিকাকে নীচের মত উপহাস করা হ'ত। রাত্রিকে অপমান করবার মত কাপুরুষতা অথবা নিষ্ঠুরতা আমার ছিল না। জ্যোতির্ময়ের কথা আলাদা। সে বিশুদ্ধ শিল্পী, তাই সে স্বভাবতই নিষ্ঠুর। শিল্পীরা আলোকতীর্থের যাত্রী। যুগে যুগে তিমিরময়ী রাত্রিকে অতিক্রম করে চলে যায় তারা। জ্যোতির্ময়কে দোষ দিই না আমি।

অবনীশের সঙ্গে রাত্রি কলকাতায় এসেছিল কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে

জেগেছিল। তখন তার কোন উত্তর পাই নি, পরে পেয়েছিলাম। রাত্রি এসেছিল দেখতে, সবিতা কলকাতায় আছে কি না! সবিতা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কলকাতা শহরের ট্রাম ট্যাক্সি জনতা কোলাহল, ধরণীবাবুর ছদ্ম উৎকণ্ঠা, নিখিল চৌধুরীর নির্জলা ক্রোধ, রাখালবাবুর উইল, ডি. কে.র বর্ণনা, ডাক্তারী-জীবনের সফলতা-নিষ্ফলতা, লেখক-জীবনের প্রেরণা-অবসাদ—এ সমস্ত সত্ত্বেও পাঁচটি ছবি আমার মনে আঁকা আছে, চিরকাল থাকবে বোধ হয়।

১

অন্ধকার। গড়ের মাঠের একটা নির্জন অংশে রাত্রি শুয়ে ছিল, আমি পাশে ব'সে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমরা দুজন ছাড়া পৃথিবীতে আর যেন কেউ নেই, কলকাতা শহরটা তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আকস্মিকভাবে ক্ষণিকের জন্য যেন আবির্ভূত হয়েছে, বুদ্বুদের মত এখনই মিলিয়ে যাবে। রাত্রির মনের মধ্যে ঢুকে আমি যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, অন্ধকার গুহার ভেতর লোকে যেমন পথ হারিয়ে ফেলে, তেমনই। মোটরের চিৎকার মশকের গুঞ্জনের মত মনে হচ্ছিল, ক্রমশ, তাও আর শোনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, চারদিকের আলো ক্রমশ যেন নিস্প্রভ হয়ে আসছে, মুমূর্ষু রোগীর নাড়ী ক্রমশ যেমন ক্ষীণ হয়ে আসে। সমস্ত বিশ্বে যেন কিছু নেই, আছে কেবল একটা অনুভূতিময় স্পন্দন, ভেসে চলেছি যেন আমরা দুজনে—মন্থর গতিতে, সেই স্পন্দনের তালে তালে সময়ের স্রোতে। সময়ের গতিও যেন থেমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, চেতনা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছিল।...হঠাৎ তার দীর্ঘনিশ্বাসপতনের শব্দে চমকে উঠলাম। হঠাৎ কলকাতা শহর তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আবার মূর্ত হয়ে উঠল চতুর্দিকে। আলো অন্ধকার সব ফিরে এল। চেয়ে দেখলাম, রাত্রি শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

দিনটা মেঘলা ছিল।

নিছক বেড়াবার জন্যেই বেরিয়েছিলাম। দ্রুতগামী একটি ট্রেনের খালি কম্পার্টমেণ্টে ব'সে ছিলাম দুজনে। মেঘের স্তর ভেদ ক'রে যে সূর্যালোক সেদিন নেমে এসেছিল পৃথিবীতে, তা যেন আগত নয়, আসন্ন—যেন একটা অলৌকিক কিছুর পূর্বাভাস। এলোমেলো হাওয়াটা সেদিন বইছিল যেন তার অলক আর বসনকে উতলা করবার জন্যেই। তার পরনে ছিল জবাফুলের মত লাল রঙের একটি রেশমী শাড়ি। শাড়ির কোন পাড় ছিল না। মাথায় কোন অবগুণ্ঠন ছিল না। জানলার বাইরে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে ছিল সে। লাল শাড়িতে তার সর্বাঙ্গ আবৃত, মুখটি শুধু খোলা। মনে হচ্ছিল, মহাকাশচারী কোন জ্বলন্ত নক্ষত্রের একটা টুকরো মাধ্যাকর্ষণের টানে হঠাৎ নেমে এসেছে যেন পৃথিবীতে, তার খানিকটা নিবে কালো হয়ে গেছে, বাকিটা জ্বলছে এখন …দু পাশে দিগন্তবিস্তৃত ডানকুনির মাঠে। নিউ কর্ডের নূতন লাইন। দ্রুতগামী ট্রেন। গাড়িটা দুলছিল। হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে চাইলে আমার দিকে, তার নির্নিমেষ চোখে একবার যেন নিমেষপাত হ'ল, কৌতুকদীপ্ত এক কণা হাসি চিকমিক ক'রে উঠল কুচকুচে কালো চোখে, ক্ষণপরেই সে হাসি সংক্রামিত হ'ল অধরে।

আপনার খুব অনুতাপ হচ্ছে, নয়?

বিস্ময়ের ভান ক'রে বললাম, না, আনন্দ হচ্ছে।

সত্যি?

ক্ষণকালমাত্র কৌতুকদীপ্ত দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে। এলোমেলো হাওয়া উদ্দাম হয়ে উঠল তার অলকগুচ্ছে, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। কেন আনন্দ হচ্ছে—এ কথা সে জানতে চায় নি; কিন্তু যেহেতু আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছিল না, অনুশোচনাই হচ্ছিল, তাই আনন্দিত হবার একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ বিবৃত না ক'রে পারলাম না আমি।

আইনকে আইন দিয়েই জব্দ করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে বইকি।

আবার সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলে, চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

আপনার আত্মীয়স্বজন? তাঁরাও কি আনন্দিত হবেন এ খবর শুনলে?

সম্ভবত হবেন না। কিন্তু তাঁদের জানাবার দরকার কি? জীবনের

অধিকাংশ আনন্দজনক কার্যই অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে করতে হয়ে সকলকে।

আধুনিকতার সুরা পান করেছিলাম বটে, কিন্তু এক চুমুক মাত্র। নেশার চেয়ে ক্ষোভই বেশি হয়েছিল, কিন্তু ভান করতে হচ্ছিল, যেন সত্যি সত্যি নেশা হয়েছে। নেশা যে একেবারে হয় নি, তা নয়; কিন্তু তা আধুনিকতার সুরা পান করে নয়, সনাতন সুরা পান ক'রে। তার সঙ্গে আধুনিকতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, তা যুবতীর সম্পর্কে যুবকের আদিম নেশা। কিন্তু সে উন্মাদনাকে আধুনিকতার ছদ্মবেশে নিস্পৃহ ঔদার্যের ভূমিকা অভিনয় করতে হচ্ছিল মিথ্যা আনন্দের আতিশয্য-সহকারে।

দ্রুতগামী ট্রেন দুলছিল। দু পাশে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ মেঘলা দিনের স্নিগ্ধ আলোকে প্রতীক্ষা করছিল যেন কার। এলোমেলো হাওয়া পাগল হয়ে উঠেছিল তার অলকে আর লাল শাড়িতে, আমি চুপ ক'রে ব'সে দেখছিলাম, তার মখমল-কোমল কালো মুখে অনুদ্ভাসিত অপরূপ একটা অরুণিমা উদ্ভাসিত হবার সাধনা করছে।

৩

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছিল হঠাৎ আর একদিন।

রাত্রি তার বাবার কাছে যায় নি, যেতে চায় নি। তাকে আলাদা একটা বাসা ক'রে দিয়েছিলাম। বাসাটার সামনে ছোট একটুখানি ফাঁকা জায়গা ছিল জায়গাটার ওপারে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িখানা যাঁর, এই ফাঁকা জায়গাটুকুরও তিনিই মালিক। রাত্রিকে প্রায় সমস্ত দিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম —বাসে, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনে। খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল হোটেলে। শোবার জন্যেই কেবল বাড়িটা ভাড়া করতে হয়েছিল রাত্রির অভিপ্রায় অনুসারে। সেদিন বিকেলে রাত্রির আসবার কথা ছিল আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইলাম, তবু সে এল না। যে 'কল' দুটি বাকি ছিল, তা সেরে রাত্রির বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি, সামনের মাঠটায় অসম্ভব ভিড়। তিনতলা-বাড়ির মালিকের পিতৃশ্রাদ্ধ, কাঙালী-বিদায় হচ্ছে। অন্ধ, খঞ্জ, নানা ভাবে বিকৃত নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষ ছেঁড়া কাপড়ে রুক্ষ চুলে কিলবিল করছে মাঠটায়। সমস্ত স্থানটা দুঃশব্দে ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দেখলাম, রাত্রি মাঠের দিকের কপাট জানালা সব বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

সম্ভবত ভিড়ের জন্যে বেরোতেও পারে নি।

কড়া নাড়তেই চাকরটা এসে কপাট খুলে দিয়ে গেল। ওপরে উঠে দেখলাম, রাত্রি পড়ছে। আমার কাছে নানা রকম মাসিকপত্র জ'মে ছিল, তারই এক বোঝা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাকে।

আজকাল সাহিত্য-সমাজেও খুব দলাদলি, নয়?

প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তবু একটা উত্তর দিলাম।

হবে না কেন? মানুষ, বিশেষত সাহিত্যিকেরা স্বাধীন-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। প্রত্যেকেরই স্বাধীন মত আছে এবং তা প্রকাশ করবার অধিকার আছে। সুতরাং দলাদলি তো হবেই।

আপনি কি বলতে চান, স্বাধীন মতের প্রতি নিষ্ঠার জন্যেই এত দলাদলি? আমার তো নানা কাগজের নানা প্রবন্ধ পড়ে মনে হ'ল যে, সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা কারও নেই, সকলেই মতলববাজ ব্যবসাদার।

এ রকম মনে হওয়ার মানে?

মানে, যিনি লিখছেন—দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে যতক্ষণ না সাহিত্য গঠিত হচ্ছে ততক্ষণ তা খাঁটি সাহিত্য নয়, তিনি নিজে হয় প্রকাশক কিংবা কোন প্রকাশকের বন্ধু, এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য—দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে লেখা কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া। আবার এই দেখুন, আর একটা কাগজে দেখছি, একটা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—গণসাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয় নি এ দেশে। এঁর সঙ্গে বোধ হয় প্রথম প্রবন্ধ-লেখকের শত্রুতা আছে। আর একটা কাগজ প্রগতি-সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করছেন, এঁরও উদ্দেশ্য—

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, আহা, এরা সবাই যে মতলববাজ, এ সন্দেহ হল কি করে তোমার? ও-সব প্রবন্ধে যে যুক্তি আছে, সেগুলো কি অর্থহীন?

একটু হেসে রাত্রি বললে, বুদ্ধিমান লোকে যে কোন জিনিসের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনায়াসে একটা যুক্তি খাড়া করতে পারে, ভাল উকিল দোষীকেও মাঝে মাঝে বেকসুর খালাস করিয়ে আনে, তাই ব'লে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। যারা মানুষকে ভালবাসে, তারা যেমন মানুষের জাতবিচার করতে বসে না, তেমনই যারা সত্যিকার সাহিত্য-রসিক, তারা সাহিত্যের জাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানুষের সুখ-দুঃখ প্রেম-ঘৃণা আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মানুষের জীবন নিয়েই সাহিত্য। সে মানুষ ধনী কি গরিব, রাজরাণী কি মেথরানী—এ

নিয়ে যারা বেশি মাতামাতি করে, তারা জানবেন চণ্ডীমণ্ডপবাসী ঘোঁট-পাকানো মতলববাজ চাঁইদের সগোত্র। তারা ব্যবসাদার, সাহিত্যিক নয়।

ওয়েটিং-রুমে রাত্রির সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা হবার পর আর সাহিত্য-প্রসঙ্গ তার কাছে তোলবার সাহস ছিল না আমার। মাসিকপত্রগুলো তার কাছে এনে দিয়াছিলাম অবশ্য ক্ষীণ একটা আশা নিয়ে। সাহিত্যবিষয়ক দু-চারটে প্রবন্ধ ইদানীং লিখেছিলাম এবং প্রোলিটারিয়েট সাহিত্য নিয়েই লিখেছিলাম। রাত্রির মুখে এই মন্তব্য শুনে আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, আমার ওই লোক-ভোলানো সস্তা উচ্ছ্বাসগুলো ওর চোখে যেন না পড়ে। কোন অজুহাতে মাসিকগুলো সরিয়ে নিয়ে যাব আমি এখান থেকে।

জ্যোতির্ময়ের যে ছবিখানা এন্‌লার্জ করতে দিয়েছিলাম, সেটা হয়েছে?

কবে দেবার কথা ছিল?

আজই।

চল, তবে বেরোনো যাক।

ওই নোংরা ভিড় ঠেলে আমার আজ বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনিই গিয়ে নিয়ে আসুন।

তার আদেশ—হ্যাঁ, আদেশই—অগ্রাহ্য করবার মত মানসিক শক্তি আমার ছিল না। সে আদেশ করবে না কেন, কিছুই সে লুকোয় নি, জ্যোতির্ময়ের সম্বন্ধে কোন কথাই সে আমার কাছে গোপন করে নি। সমস্ত জেনে-শুনেই আমি তাকে—না, ভুল বলছি—আমি তাকে প্রশ্রয় দিই নি, সে-ই আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি সব জেনে-শুনেও অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম, সে তা গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করেছিল আমাকে। আদেশ করবে না কেন?

বেরিয়ে এলাম। ভিড় ঠেলে রাস্তায় গিয়ে পড়লাম অনেক কষ্টে। গলির বাঁকে অদৃশ্য হবার পূর্বে ঘাড় ফিরিয়ে যে ছবিটা দেখলাম, তা আমার মনে স্পষ্টভাবে আঁকা আছে এখনও। দোতলার বারান্দায় নির্বিকারভাবে রেলিঙে ভর দিয়ে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পায়ের নীচে অসংখ্য ভিখারী।

৪

টেলিফোনের ঝনৎকারে ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসলাম, তখন রাত দুটো। কলকাতা শহরও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে সহসা বিদ্যুতের চমক দেখতে পেলাম। সোঁ-

সোঁ ক'রে একটা হাওয়া উঠল। সে দিন সমস্ত দিন রাত্রির সঙ্গে দেখা হয় নি। বিকেলে গিয়েছিলাম, দেখা পাই নি—একাই সে কোথাও বেরিয়েছিল। মনে হল, রাত্রিই হয়তো ফোন করছে কোথাও থেকে। গোকুল এসে বললে, নবীনবাবু—

নবীবনবাবু লোকটি কে, ভাববার চেষ্টা করলাম। রোগীদের নাম আর পেটেণ্ট ওষুধের নাম মনে রাখা এমন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! অথচ এই দুটি জিনিসই আমাদের পেশার পক্ষে অপরিহার্য। সহসা মনে পড়ল, নবীনবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর মামাতো ভাইয়ের নাম। নেমে এলাম বিছানা থেকে। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টিও নামল, হাওয়ার বেগ বাড়ল।

ফোনে নবীনবাবু বললেন, দাদা কেমন যেন করছেন, আপনি দয়া ক'রে শিগগির আসুন একবার।

রাত দুটোর সময় যে সব রোগী 'কেমন যেন করে,' তাদের অনেকের কথা জানি, কারও বেলাতেই দয়া করতে ত্রুটি করি নি, কিন্তু—। মনের ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ সুরটা সহসা ভোঁতা হয়ে গেল, যখনই ভাল করে মনে পড়ল, পূর্ণেন্দুবাবু স্বর্ণেন্দুর বাবা।

তাড়াতাড়ি জামা-জুতো প'রে স্টেথস্কোপ আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লাম—হঠাৎ যদি কোন ট্যাক্সি পাওয়া যায় এই ভরসায়। কলকাতা শহরেও অত রাত্রে যানবাহন সুলভ নয়। ফুটপাথ দিয়ে জোরেই হাঁটতে লাগলাম। বিরাট কর্নওয়ালিস স্ট্রীট জনশূন্য। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, হাওয়া বইছিল বেশ জোরে। রাত্রির কথা মনে পড়ল। বিশেষভাবে আরও এইজন্যে মনে পড়ল যে, এসে থেকে রাত্রি পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে যায় নি। কেন যায় নি, এ প্রশ্ন তাকে করেছিলাম। উত্তরে সে যা বলেছিল, তা নিখিল চৌধুরীর কাছে হয়তো সন্তোষজনক বলে মনে হতে পারত, কিন্তু আমার কাছে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। বলেছিল, গেলে উনি হয়তো দাদার কথা জানতে চাইবেন; কিন্তু বলার ধরনে কেমন যেন একটা কপটতা ছিল। এ কপটতার কারণ যে কি তার আভাস আমার অজ্ঞাত ছিল না; অবশ্য তা আভাস মাত্র। রাত্রি এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কেন যে দেয় নি, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম। কতক্ষণ যে চলেছিলাম, তা ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে, টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, ফাঁকা ফুটপাথ দিয়ে রাত্রির কথা ভাবতে ভাবতে একা হেঁটে চলেছিলাম।

শাঁখারিটোলায় নবীনবাবুর বাসায় যখন পৌঁছুলাম, নবীনবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, কেমন যেন নিঝুম হয়ে পড়েছেন। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলাম, জীবন্ত চোখটাও মিনতি করছে ; যাঁর ঘুম হ'ত না, মহানিদ্রা নেমেছে তাঁর চোখে, সমস্ত মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছে। পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেছেন।

ফেরবার সময় একটা ট্যাক্সি পেলাম। মনে হ'ল, রাত্রিকে খবরটা দিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। রাত্রির বাসায় পৌঁছে বিস্মিত হয়ে গেলাম। রাত্রি তখনও জেগে আছে। জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, জোরে হাওয়া বইছিল, গলির মোড়ে অপেক্ষামান ট্যাক্সিটার হেড-লাইটের আলো নিঃশব্দে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছিল, আমি রাত্রির জানলার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িযে ছিলাম। রাত্রি এতক্ষণ পর্যন্ত জেগে আছে কেন? মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব অসম্ভব নানা কারণ মনের মধ্যে ভিড় ক'রে এল, চ'লে গেল। কড়া নাড়লাম।

রাত্রি জানলায় উঠে এল।

কে?

আমি।

আপনি এত রাত্রে?

চাকরটাকে না জাগিযে নিজেই নেমে এসে দরজা খুলে দিলে।

এত রাত্রে হঠাৎ যে?

ওপরে চল, বলছি। তুমি এখনও জেগে আছ কেন?

চিঠি লিখছিলাম।

কাকে?

ফার্নান্‌ডিজকে।

এমন সহজভাবে বললে, যেন ফার্নান্‌ডিজকে আমি চিনি আর সে কথা ও জানে। নিমেষের মধ্যে মানসপটে অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল—কলুটোলার মোড়ে স্বর্ণেন্দু, তার হাতে খবরের কাগজে মোড়া টকটকে লাল খাপে ঢাকা ছোরা, রাত্রির জন্মদিনে ফার্নান্‌ডিজের উপহার।

যেন কিছুই জানি না, এমনই ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ফার্নান্‌ডিজ কে?

ফার্নান্‌ডিজ আমাদের ড্রাইভার ছিল। আমাদের পুরোনো বাসাটার খোঁজ

নিতে গিয়েছিলাম আজ বিকেলে, সেখানে দেখলাম, আমার নামে ফার্নান্‌-ডিজের একটা চিঠি রয়েছে আর এই ফোটোখানা।

টেবিলের ওপরেই ফোটোখানা রাখা ছিল। দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ-গঠন একজন হাবসী। ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম নির্নিমেষে।

হঠাৎ জানলা দিয়ে দমকা একটা হাওয়া ঢোকাতে চিঠি লেখবার প্যাডের পাতাগুলো ফরফর ক'রে উড়তে লাগল। দেখলাম, রাত্রি ফার্নান্‌ডিজকে দীর্ঘ পত্র লিখেছে। কি লিখেছিল, আমি দেখি নি। রাত্রি একটা বই নিয়ে প্যাডটার ওপর চাপা দিলে।

বললাম, পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেলেন এখুনি।

রাত্রি শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তার পর অনেকক্ষণ পরে বললে, শান্তি পেলেন এতদিনে। একটুও কাঁদলে না।

তার পর হঠাৎ বললে, আচ্ছা, একটা স্যুটকেস আপনার বাসায় রেখে গিয়েছিলাম সেবারে, সেটা আছে তো?

আছে।

কাল নিয়ে আসতে হবে সেটা।

আচ্ছা।

পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। বাইরে টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগল, জোরে জোরে হাওয়া বইতে লাগল, প্রকাণ্ড ট্যাক্সিখানা নীরবে অপেক্ষা ক'রে রইল নীচের গলিটাতে খানিকটা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত।

৫

সিনেমায় ভাল একখানা বই ছিল।

সকাল থেকেই কাজকর্ম এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম, যাতে সন্ধ্যাবেলায় অবসর থাকে। পাশাপাশি দুখানা সীট আগে থেকে 'বুক' ক'রে রেখেছিলাম। যথাসময়ে রাত্রির বাসায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোন সাড়া পেলাম না। হাতঘড়িটা দেখলাম, আর মাত্র আধ ঘণ্টা দেরি আছে। ট্যাক্সি ক'রে না গেলে সময়ে পৌঁছনো যাবে না। আবার কড়া নাড়লাম, এবার একটু জোরে জোরে। ছোঁড়া চাকরটা নেমে এল। কবাট খুলে দিয়ে বললে, মায়ের অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে? তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। সামনের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না। ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। শোবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, সেখানেও কেউ নেই। আবার ডাকলাম, সাড়া নেই। এদিক ওদিক খুঁজে শেষে বাথরুমের পাশে অন্ধকার ছোট যে ঘরটা ছিল, সেই ঘরটায় ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরটার অন্ধকার কোণে রাত্রি উপুড় হয়ে প'ড়ে ছিল। প্রসব-বেদনাতুরা রাত্রি। কাঁদছিল না, কাঁপছিল না, নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে ছিল। আমিও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত্রি আমার পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল। বেশবাস সম্বৃত ক'রে আস্তে আস্তে উঠে বসল, তার পর আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ চাহনি নিবদ্ধ ক'রে সহজ কণ্ঠে বললে, আজ হবে। আমি আরও ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আমাকে ডাক্তারী বিবেকের তাড়নায় ছুটে বেরিয়ে আসতে হ'ল। যে ধাত্রীটিকে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, তারই উদ্দেশ্যে ছুটতে হ'ল ট্যাক্সি নিয়ে। রাত্রি বারোটার পর নির্বিঘ্নে রাত্রির সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। আমি তার নামকরণ করলাম, প্রভাত।

দশম পরিচ্ছেদ

এর পর যে সব বর্ণনা গল্পলেখকের লেখনীতে অনর্গলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী, সে সব বর্ণনা আমি করব না। বসন্তের যাদুস্পর্শে শুষ্ক তরু যেমন মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, অদৃশ্য শক্তির লীলায় পাথর বিদীর্ণ ক'রে যেমন নির্ঝর নিঃসৃত হয়, বর্ষাসমাগমে শীর্ণ স্রোতস্বতী যেমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে দু-কূল প্লাবিত ক'রে ছোটে, সন্তান লাভ ক'রে রাত্রিরও মাতৃহৃদয় তেমনই—এই জাতীয় বর্ণনা রাত্রির সম্পর্কে আমি করতে পারব না, কারণ তা মিথ্যা হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সন্তান প্রসব ক'রে রাত্রি মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে নি, নির্ঝরের চপলতা লাভ করে নি, নদীর মত দু-কূলপ্লাবিনী হয় নি। রাত্রি কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল, তার নির্ভীক সত্তা কেমন যেন নির্জীব হয়ে এসেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা আকাশ-চারী ব্যোমযানকে কে যেন গুলি ক'রে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। তার চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে উঠেছিল, তাতে মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধতা ছিল না, ছিল

শরাহত ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের মৌন বিলাপ। তার সারাদিন শান্তি ছিল না, সাররাত ঘুম ছিল না, ওই মাংসপিণ্ডটার প্রতি-মুহূর্তের অসংখ্য দাবি মেটাবার জন্যে অহরহ তাকে যে প্রাণপাত করতে হ'ত, তার মধ্যে মহনীয় কিছু আমি দেখতে পাই নি। আমার মনে হ'ত, অমোঘ আইনের কবলে প'ড়ে সে যেন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে। তার মলিন মুখ, শঙ্কিত দৃষ্টি, শীর্ণায়মান দেহ, অন্তরের নিদারুণ গ্লানি সত্ত্বেও বাইরের ছদ্ম-সপ্রতিভতা—না, মহনীয় কিছুই ছিল না।

প্রভাত কি তার মায়ের বন্দীত্বের ব্যথা অনুভব করেছিল? আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, করেছিল। শিশুকে আমরা যত অবোধ ভাবি, হয়তো সে সত্যিই তত অবোধ নয়। আমার মনে হয়, প্রভাত তার মায়ের ব্যথা বুঝেছিল, কোন নিগূঢ় উপায়ে বুঝেছিল, তাই সে তার মাকে মুক্তি দিয়ে চ'লে গেল। তা না হ'লে অমন সুন্দর সুস্থ শিশুর হঠাৎ মৃত্যু হ'ল কেন?

অসুস্থ হয়ে পশ্চিমের এই শহরটায় বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে এসে স্মৃতি-মন্থন ক'রে যে কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করছি, এখন মনে হচ্ছে, তার কতটুকু আমি জানি! সবই তো অস্পষ্ট। কল্পনায় বাস্তবে, আলোয় আঁধারে মিলিয়ে যে ছবি আমি আঁকলুম, তার কতটুকু কল্পনা, কতটুকু বাস্তব, কতটুকু আলো, কত-টুকু আঁধার, কিছুই তো জানি না—সমস্তটাই আমার মনের বিকার কি না, কে জানে! সবই মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু একটা অবিসংবাদিত সত্যকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, আমি মোহগ্রস্ত। মোহের মায়াময় অঞ্জন চোখে লাগিয়ে হয়তো আমি কুৎসিতকে সুন্দর, পাপকে পুণ্য, অসত্যকে সত্য রূপে দেখেছি এবং অপরকে দেখাতে চেষ্টা করেছি। বর্তমান যুগের এই সর্বনাশা মনোবৃত্তি হয়তো আমাকেও পেয়ে বসেছে। অন্যায়কে অন্যায় জেনেও, নিজের দুর্বলতার জন্যে লজ্জিত না হয়ে তাকে সুন্দর ক'রে আঁকবার চেষ্টা করেছি কেবল আমার লেখবার শক্তি আছে ব'লে। বুঝছি, কিন্তু নিরস্ত হতে পারছি না।

তেতলার একটা ঘরে ব'সে লিখছি। দূর দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ও-পাশের সাদা স্তূপ-মেঘটার সর্বাঙ্গে অভ্র-আবীর। সারি সারি পাখি উড়ে চলেছে, দলে দলে গরু ফিরে আসছে মাঠ থেকে, নদীপারের তালবনে সোনার স্বপ্ন নেমেছে যেন, তালবনের ও-পারে ঘননীল মেঘটার গায়ে আলোর জরি জ্বলছে।

ডি. কে.র কথাগুলো মনে পড়ছে।

"তাঁরা দুজনে পাপ-পুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের

উদ্দেশ্যে চ'লে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দুজনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

হিমালয়ের পথে রাখালবাবু আর স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে ডি. কে.র নাকি দেখা হয়েছিল। আলাপও হয়েছিল। ডি. কে. জানত না যে, আমার সঙ্গেও তাঁদের আলাপ ছিল। তাই সে কলকাতায় ফিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁদের গল্প করছিল আমার কাছে।—

আশ্চর্য লোক ভাই রাখালবাবু, নিজের ভ্রষ্টা স্ত্রীকে ভ্রষ্টা জেনেও একদিনের জন্যে ত্যাগ করেন নি।

আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম, কিছু বলি নি, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিতে, ভ্রূর কুঞ্চনে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না তোর? তুই ভাবছিস, আমি কেমন ক'রে জানলাম? রাখালবাবুর স্ত্রীই নিজে আমাকে বলেছিলেন একদিন। কেদার-বদরির পথে একটা চটিতে ছিলুম আমরা। অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। হঠাৎ রাখালবাবুর স্ত্রী কেমন যেন ক্ষেপে গেলেন। চুল এলো ক'রে, চোখ বড় বড় ক'রে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ভাই! হঠাৎ স্বামীকে বললেন, না, আমি পাপের বোঝা বুকে নিয়ে কেদারনাথে যেতে পারব না, ফেটে ম'রে যাব; তুমি শোন, তোমার কাছে ব'লে হালকা হই আমি। এই ব'লে বলতে লাগলেন, আমার জ্যোতির্ময় যখন এক বছরের, সেই সময় পূর্ণেন্দুবাবু ব'লে একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয় আমাদের। আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। ঘনিষ্ঠতা শেষটা এমন দাঁড়াল যে, নিজের পেটের ছেলেকে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে গেলাম তার সঙ্গে। পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে অনেক দিন ছিলাম, অনেকে আমাকে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী ব'লেই জানে—

এই সময় ফোনটা ঝনঝন ক'রে বেজে উঠেছিল, ধীরেনকেই কে যেন ডাকছিল ফোনে—জরুরি দরকারে। ধীরেন গল্পটা অসমাপ্ত রেখেই চ'লে গিয়েছিল, ব'লে গিয়েছিল, আর একদিন এসে বাকিটা বলবে। এখনও ফেরে নি। শুনেছি, সঙ্গী পেয়ে সে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে গেছে। মানস-সরোবরে যেতে পারে নি ব'লে সক্ষোভে গোড়াতেই রাখালবাবুদের সম্বন্ধে যে কথাগুলো সে বলেছিল, সে কথাগুলোই বার বার মনে পড়েছে আমার—তাঁরা দুজনে পাপপুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশে চ'লে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দুজনে চড়াই ভাঙতে ভঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উত্তর দিকের পালক-মেঘগুলোতেও রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে, দেখতে দেখতে সব গোলাপী হয়ে গেল। তালবনের ও-পারের ঘননীল মেঘটা বেগুনী হয়ে আসছে ক্রমশ, আলোর জরিতে আগুন জ্বলছে। একটা পাঁশুটে রঙের মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর ফিনিক ছুটছে তার চারদিক দিয়ে। •

নিখিল চৌধুরী যেদিন রাখালবাবুর উইলটা আমাকে এনে দেখিয়েছিলেন, সেদিনের কথাও মনে পড়ছে আমার আজ। রাখালবাবু মহাপ্রস্থানে যাবার আগে একটা উইল ক'রে নিখিল চৌধুরীর নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি জ্যোতির্ময় আর রাত্রিকে সমান ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। পূর্ণেন্দুবাবুর জন্যেও ব্যবস্থা ছিল—তিনি যতদিন বাঁচবেন, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার মতন খরচ পাবেন। পূর্ণেন্দুবাবুর মৃত্যুসংবাদ তিনি পান নি বোধ হয়। নিখিলবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন, রাত্রির ঠিকানা আমি জানি কি না! ঠিকানা আমি জানতাম না, তাই বলতে পারি নি। প্রভাতের মৃত্যুর দু দিন পরেই রাত্রি চ'লে গিয়েছিল। কোথায়, তা আমি জানি না।

আজও কিন্তু আমি তার প্রতীক্ষা করি। অসামাজিকভাবে নয়, সামাজিক দাবিতেই। আইনের চক্ষে আমি তার স্বামী। জ্যোতির্ময়ের সন্তানের জারজ-অপবাদ-মোচনের জন্য আইনত আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। আমি জানি, সে আসবে না। এও আমি জানি, আমার জন্যে নয়, নিজের সন্তানের জন্যেই এবং হয়তো আমার প্রবল আগ্রহাতিশয্যে এ বিবাহে সে সম্মত হয়েছিল। আমাকে সে কোনদিনই ভালবাসে নি।

তবু তার প্রতীক্ষা করি।

দূর দিগন্তরেখায় তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তপন ধীরে ধীরে নামছে। অস্তরাগরঞ্জিত মেঘমালার বর্ণ-বৈচিত্র্য নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ক্রমশ। অন্ধকারের আগমনী শুনতে পাচ্ছি।

রাত্রি আসন্ন।

—শেষ—

অগ্নি

উৎসর্গ

অধ্যাপক জগন্নাথ গুপ্ত

কল্যাণীয়েষু

ভাগলপুর

৬ই ফাল্গুন ১৩৫৩

৮

অংশুমান স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন। জেলে ব'সে ব'সে। দেশের জন্য জেলে এসেছে। একখানা বই পড়তে পেয়েছে—ইলেক্‌ট্রিসিটির ইতিহাস। সেইটে কেন্দ্র করেই স্বপ্ন জাগছে নানা রঙের। দেশের, অন্তরার, রূপকথার। মন উড়ে চলেছে জেলের প্রাচীর ভেদ ক'রে দূরদূরান্তে, অতীতে ভবিষ্যতে আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পলোকে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব, ডাক শুনতে পেয়েছি, যাচ্ছি···।" সে চলেছে। অনাদি অনন্ত অতীত থেকে অনাদি অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে অন্তহীন প্রবাহে। তার চলার বেগ, তার আগ্রহ, তার গতি-ব্যাকুলতা যুগে যুগে উতলা করেছে মানুষকে। মানুষ বোঝে নি ঠিক। বিস্মিত হয়েছে, অনুসন্ধান করেছে। আজও করেছে।···

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে ফিরে থাকে অহরহ। কেন? যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে বৈজ্ঞানিক জন্মেছে। সত্য-আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে অবিরাম।

চীন দেশের নাবিকেরা সমুদ্র-লঙ্ঘন করছে চুম্বকের সাহায্যে। গ্রীসের হোমার, থেলিস, পাইথাগোরাস, ইউরিপিডিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল—সকলেরই ধ্যানভঙ্গ হয়েছে মাঝে মাঝে চুম্বকের টানে। লুক্রোটিয়াস, সিসেরো অবাক হয়েছে কাণ্ড দেখে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই উদ্দেশে চলেছি···" এ কথার অর্থ কিন্তু বোঝে নি তখনও কেউ। বোঝে নি, কিন্তু তার গতি-বেগকে কাজে লাগাতেও ছাড়েনি।

একজন চীন-সম্রাট বিধ্বস্ত করছেন তাঁর প্রতিপক্ষকে চুম্বকের সাহায্যে দিক নির্ণয় ক'রে। চলেছে ক্রুজেডাররা ধর্ম-যুদ্ধ করতে। যুদ্ধের অবসরে আহরণ করছে চুম্বক-তত্ত্ব শত্রুপক্ষ আরবদের কাছ থেকেই।···গ্রীসের ওরেক্‌ল্‌কে নিয়ন্ত্রিত করছে চুম্বক।···কে রাজা হবে ঠিক করছে শূন্যে অবস্থিত চুম্বকের আংটি টেবিলের উপর বিছানো বর্ণমালার উপর ঘুরে ঘুরে।

রেশমের কাপড় দিয়ে তৃণমণিকে (Amber) ঘষলে তৃণমণি নানাবিধ হালকা জিনিসের টুকরো আকর্ষণ করে। কেন? সুদূর অতীতে প্রাচীন গ্রীসে সবিস্ময়ে মানুষ ভাবছে, নিশ্চয় ওদের মধ্যেও আত্মা আছে। সুপ্ত আত্মা ঘর্ষণে জেগে ওঠে। তৃণমণি আর চুম্বকে দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে পুজো করছে কেউ কেউ। বিস্মিত মানবের জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা সত্য সন্ধান ক'রে চলেছে তবু। ধার্মিক ধর্ম-তত্ত্ব ভুলে সবিস্ময়ে ভাবছেন। পাদ্রি নিমগ্ন হয়েছেন চুম্বকের গবেষণায়।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, ডাক শুনতে পেয়েছি আমি, যাচ্ছি..." তার গতির স্পন্দন আকুল ক'রে তুলেছে মানুষকে। নানা বিজ্ঞানীর মনে নানা অর্থ বহন করছে। অর্থ অর্থান্তরে পরিণত হচ্ছে। যুগ যুগান্তরে।

রাণী এলিজাবেথের ডাক্তার তিনি। অর্থোপার্জনের দিকে তাঁর মন নেই। ডাক্তারির দিকেও না। রুটির জন্যে ওসব করতে হয়, তাই করা। তাঁর সমস্ত মন প'ড়ে আছে চুম্বকের দিকে। চুম্বকেরই নানা তথ্য খুঁজছেন, ভাবছেন, লিখছেন। চুম্বক আর বিদ্যুৎ·· কি এরা? একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ নয়তো? হযতো···হয়তো···। সারাজীবন কেটে গেল প্রমাণ সংগ্রহ করতে। হঠাৎ মারা গেলেন একদিন। প্লেগে।

সে চলেছে।

শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, মেঘ-মেদুর অম্বর, অন্ধকার রাত্রি, ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি, সমস্ত তুচ্ছ ক'রে রাধা যখন অভিসারে চলেছিলেন, নিকুঞ্জগৃহে অপেক্ষমাণ পীতবসন বনমালী ছাড়া আর কিছুই যখন তাঁর চেতনা-গোচর ছিল না, নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদযতে মৃদুবেণুম্—সেই বাঁশী ছাড়া আর কিছুই যখন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না, তখন নিখিল বিশ্বও কি রোমাঞ্চিত হযে ওঠে নি? আকাশে বাতাসে চন্দ্রে তারায় শিহরণ কি লাগে নি? কবির মনে জাগে নি কি স্বপ্ন? সেদিনকার স্বপ্ন-প্রবাহই কি আকুল করে নি পরবর্তী যুগের চণ্ডীদাস-জযদেবকে?

তার গতির ছন্দও স্বপ্ন জাগিয়েছিল।

বেতার-বার্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন কেউ কেউ সে যুগেও।

অক্ষ-সংলগ্ন বিরাট এক গন্ধক-গোলক বস্ত্রঘর্ষণে বিদ্যুতায়িত হযে উঠেছে।

সশব্দে খানিকটা আলো ছিটকে পড়ল। বিস্ময়ে চমকে উঠলেন আবিষ্কারক। যন্ত্র-যোগে প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণ।

"যাচ্ছি…যাচ্ছি…যাচ্ছি…"

অপরা-তড়িৎ কেবলই মিলতে চায় পরা-তড়িতের সঙ্গে।

রহস্য-লোকে আলোকপাত হতে লাগল ক্রমশ। টোয়াইন সুতো দিয়ে পরীক্ষা ক'রে চমকে গেলেন একজন। সুতো বেয়েও বিদ্যুতের তরঙ্গ চলে। সাত শো পঁয়ষট্টি ফিট দূরেও বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখতে পেলেন তিনি। কৌতূহল জাগল, মানুষের শরীরেব ভিতর দিয়েও এর গতিবিধি আছে নাকি? ছোট ছেলেদের উঁচুতে ঝুলিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, তাদের শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে কি না! ছোট ছেলেরা তাঁকে দেখলেই পালাত। মুরগী নিয়ে পড়লেন শেষটা। সারাজীবন ধ'রে হাতড়ে গেছেন। রহস্যের পর রহস্য, নিত্য নূতন রহস্য। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েও বলছেন, টুকে নাও, টুকে নাও। অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু পেয়েছি, প্রকাশ ক'রে যেতে পারলাম না। টুকে নাও—শিগগির—। বলতে বলতেই অন্তিম নিশ্বাস পড়ল।

এল আবার নূতন মানুষ। বাজল নূতন সুর তার কানে। চোখে ফুটল নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী। দু রকম বিদ্যুৎ আছে—এক রকম কাচ থেকে হয়, আর এক রকম রজন থেকে।

চুম্বক বিদ্যুৎ—কি এরা? সুপ্ত আত্মা? দেবতার প্রকাশ? অশ্রুতিগোচর সুর কিন্তু বাজতেই লাগল—"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাবই।" শুনতে পেলে না কেউ। বিচলিত হ'ল তবু নানাভাবে।

কৃষ্ণের বাঁশী বাজে, তবু যেতে পারে না রাধা। জটিলা কুটিলা আয়ান ঘোষ। রাজপ্রাসাদে ব'সে কাঁদে জাহানারা। নূরমহলের চামেলীকুঞ্জে বর্ষা নেবেছে। সমস্ত অন্তর গ'লে পড়ছে যেন। "দুলেরা, দুলেরা, কোথা তুমি? আমরা জলাশয়, তোমরা মরাল। কেন দূরে স'রে আছ এখনও?" জাহানার কাঁদে, কিন্তু যেতে পারে না। বাধা দুস্তর। জাহানারা পাতশাহ বেগম, দুলেরা সামান্য গায়ক মাত্র। সব বাধা অতিক্রম করা যায় না।

…সব জিনিস বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়—আবিষ্কার করলেন একজন।

দেখা যায়, কিন্তু রাখা যায় না। কাছে আসে, কিন্তু থাকে না।

বাসনালোলুপ মানুষের চিত্ত উন্মুখ হয়ে ওঠে। বাসনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় বুদ্ধি। চিরকাল যুগিয়েছে।

ঘোড়া গরু কুকুর হরিণ পাখি বনচর জলচর খেচর—সমস্ত কিছু উৎসুক করেছিল একদিন মানব-মনীষাকে। এদেরও দেখা যেত, কিন্তু রাখা যেত না। কাছে আসত, কিন্তু ধরা দিত না। মানুষ ফাঁদ পাততে শিখল। খাদ্যের লোভে, সঙ্গীর লোভে, অসংখ্য অদৃশ্য প্রবৃত্তির অমোঘ তাডনায় দলে দলে ধরা পড়ল প্রলুব্ধ পশুর দল। আয়ত্তাতীত ছিল যারা, আয়ত্তাধীন হল। বন্য মানব সভ্য হ'ল। বন্য-পশুর দল ঢুকল এসে মানবনির্মিত পশুশালায়। গ'ড়ে উঠল কৃষি-সভ্যতা।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি…"

সেও যেতে চায়। সুযোগ পেলেই চ'লে যায়। সুযোগ পায় না কিন্তু সব সময়ে। কাচ বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। কাচের কারাগারে বন্দী করলে পালাতে পারে না সে। মানুষ পশুশালা তৈরী করেছিল, হারেম তৈরী করেছিল, লিডেন জারও করলে। কাচের কারাগারে বন্দী হ'ল সে। হঠাৎ অংশুমানের মনে হ'ল, অস্তরাও তো বন্দী হয়ে আছেন বিরাট একটা সামাজিক লিডেন জারে।

প্রথম লিডেন জার আবিষ্কারক প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছিল সে। প্রথম বন্দিনী মানবীও হয়তো প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় তার প্রথম অপহারককে। বন্য মানবীর মনে কি প্রেম ছিল না? সে কি কুক্কুরীর মত বলিষ্ঠতমের কাছেই আত্মসমর্পণ করত জৈবিক প্রেরণায়? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বরং এই কথাই ভাবতে ইচ্ছে করে, আজও যেমন সে প্রেমে পড়ে, তখনও পড়ত। বিচার-বুদ্ধিব মানদণ্ডকে অগ্রাহ্য ক'রে অকারণে তার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠত একটি বিশেষ মানুষের জন্য। সে সুন্দর ব'লে নয়, ধনী বলে নয়, বলিষ্ঠ ব'লে নয়,—সে সে ব'লে। তার বিশেষ একটি রূপ বিশেষ ক'রে তার চোখেই পড়েছিল ব'লে।

অস্তরা কি দেখেছিল তার মধ্যে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান। মনে হ'ল, একটা সত্যের আভাস পেয়েছে সে। জেলে এই একটি মাত্র বই পেয়েছে সে পডবার জন্যে। খবরের কাগজও আসে—ইংরেজ-সম্পাদিত দৈনিক একখানা। এই বইটাই কিন্তু পেয়ে বসেছে তাকে। এর মধ্যেই অভিনব কল্পনার খোরাক পেয়েছে সে। প্রেমের আকর্ষণই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পৃথিবীতে। অপরা-তড়িৎ পরা-তড়িতের দিকে ছুটে চলেছে কিসের আকর্ষণে?

প্রেমের ? কে জানে !

খবরের কাগজ দিয়ে গেল। ইলেক্‌ট্রিসিটির ইতিহাস মুড়ে রেখে খবরের কাগজখানা খুললে সে। মিনিট খানেক পরে হঠাৎ তার গালে ঠাস ক'রে চড় মারলে কে যেন একটা। খবরের কাগজটা তাড়াতাড়ি নাবিয়ে রেখে দিলে সে। না, খবরের কাগজ সে পড়বে না। মিথ্যেয় ভরতি।

"ও, খবরের কাগজ পড়বে না ? শোন তবে। তুমি চোর, তোমার বাবা চোর, তোমার চোদ্দ পুরুষ চোর। এদের জুতো-পায়ের ধুলো মাথায় পড়াতে তবে তোমরা উদ্ধার হয়েছ। তুমি পাজি। এদের সংস্পর্শে এসে তবে তোমরা ভদ্র হয়েছ। তুমি মূর্খ, তোমার বাবা মূর্খ, তোমার চোদ্দ পুরুষ মূর্খ। এদের কাছে লেখাপড়া শিখে তবে তোমরা মানুষ হয়েছ…"

তারস্বরে চিৎকার করছে কানের কাছে। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে। হাত পা মুখ সব বাঁধা। চিৎকার করছে নিজের লোকেরাই—নিজের বাবা, নিজের ভাই, নিজের বন্ধু। কেউ চিৎকার করছে চরিত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে ব'লে, কেউ চাবুকের চোটে, কেউ বকশিশের লোভে। চিৎকার চলেছে দিনরাত। হিমালয় থেকে কুমারীকা পর্যন্ত কোথাও বাদ নেই। তুমুল চিৎকার…বিরাট চিৎকার…চাবুকের চোটে চিৎকার করছে…বকশিশের লোভে…

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। উঃ, কি দারুণ দুঃস্বপ্ন! চোখ চেয়ে দেখলে একবার, চারিদিকে অন্ধকার। চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল। ঘুম আসছে না। তার সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই জাগছে সারা দিন ধ'রে। বিজ্ঞানের এত আবিষ্কার শুধু কি মানব-পশুর পাশবিক শক্তিকে বাড়াবার জন্যেই ? প্রেম নয়, হিংসাই কি তার পরিণতি ? অন্তরার মুখখানা মনের মধ্যে ফুটে উঠল আবার। লজ্জিত হ'ল একটু।

"আমার আবিষ্কারের আসল সত্যটা তো তুমি জান।" চমকে উঠল অংশুমান। একটি হাস্যদীপ্ত মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। তীক্ষ্ণ নাসা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট। মাথার সামনের দিকে টাক। ভয় পেয়ে গেল সে।

কে আপনি ?

আমি গ্যাল্‌ভানি। তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তাই তোমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছি। ভালবেসেছ, তার জন্যে লজ্জা কি ? ভালবাসাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আমি ভালবেসেছিলাম ব'লেই অতবড় আবিষ্কারটা ক'রে ফেলতে পারলাম। স্ত্রীর জন্যে নিজের হাতে যদি ব্যাঙের ঝোল রাঁধতে না যেতাম, তা হ'লে হয়তো

কিছুই হ'ত না...

আর একজন এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক বলেছ। বিয়ে না করলে আমিও হয়তো বৈজ্ঞানিক হতাম না। মাদা-মোয়াজেল জুলিকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম ব'লেই উপার্জনের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক হতে হ'ল। তা না হ'লে হয়তো ল্যাটিন কবিতা নিয়েই মেতে থাকতাম সারা জীবন...

একটু মুচকি হেসে গ্যাল্‌ভানি চ'লে গেলেন। অংশুমান বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল দ্বিতীয় লোকটির মুখের দিকে। একমাথা কোঁকড়ানো বড় বড় চুল। বড় বড় নীল চোখে প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি। বলিষ্ঠ নাক, পুরু ঠোঁট। প্রকাণ্ড কলারওলা বুক-খোলা জামা গায়ে। গলায় একটা মাফলার জড়ানো।

আপনি...?

আমি অ্যাম্‌পিয়র। আমাদের জীবন-চরিত নিয়ে তন্ময় হয়ে আলোচনা করছ তুমি, তাই একটা সাড়া প'ড়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আমরা অনেকেই আসব তোমার কাছে। ভয় পেয়ো না। তার পর একটু হেসে বললেন, ভয় পাবার ছেলে অবশ্য তুমি নও। যা কাণ্ড করেছ! কাণ্ডটা যে কত ভযানক তা আমার অজানা নেই, ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের মধ্যে আমি মানুষ। কিন্তু হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, তুমি যা ভাবছিলে, আজ, যেটাকে সত্যের আভাস ব'লে মনে হচ্ছিল তোমার, সেটা বেশ নতুন কথা, হয়তো সত্য কথাই।

'হয়তো' বলছেন কেন?

সত্যের নানা মূর্তি—কোন্‌টা ঠিক তা কি ক'রে বলব? এই দেখ না, ফেঞ্চ রিভলিউশনকে প্রথমে সত্যের বড় একটা প্রকাশ ব'লে মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু তারা আমার বাবাকে কেটে ফেললে, তখন আমি মুষড়ে গেলাম। সত্যের চেহারা গেল বদলে। হোরেসের ওড টু লিসিনিয়াস তখন একমাত্র সত্য ব'লে মনে হতে লাগল, তার জোরেই বেঁচে উঠলাম আবার। আসল কথা কি জান, যেটাকে সত্য ব'লে মনে হচ্ছে, সেইটেকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাক, যতক্ষণ না সেটা মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়।

চোখ দুটো হাসিতে জলজল করতে লাগল। অকস্মাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন তিনি। অংশুমান প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ভয় কেটে গেল তার। মনে পড়ল, ঠাকুমা একদিন দেখা দিয়েছিলেন তাকে স্কুলে টিফিনের সময়। পরলোক আছে। মানুষ মরে না, কেউ মরে না।

সোৎসাহে বিছানায় উঠে বসল সে। চতুর্দিকে অন্ধকার। অন্ধকারের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে রইল। দেখতে পেল, অন্ধকারের বুক চিরে বিরাট একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রসারিত হয়ে রয়েছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। সেই প্রদীপ্ত ক্ষুরধার আলোক-রেখা ধ'রে চলেছে অসংখ্য নরনারীর জ্যোতির্ময় মিছিল।

২

বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ নির্মেঘ। অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে। সহস্রপাদ সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জ্বলছে যেন অনন্তকালের অগ্নিদীপ্ত ইতিহাস। মাঠের মাঝখানে বটগাছটাকে ঘিরে খদ্যোতকুল শুরু করেছে অগ্ন্যুৎসব। গাঢ় তমিস্রা ভেদ ক'রে পেচকের কর্কশ রব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তা সঙ্গীতে রূপান্তরিত হ'ল পেচকের কর্ণে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর রাত্রি গম্ভীর। সাবধানসঞ্চরণে চলেছে শ্বাপদ, তস্কর, যোগী, ভোগী, দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে। আকাশের অগ্নি মর্ত্যের মৃত্তিকায় নেমে লীলায়িত হয়েছে নব নব রূপে নব নব প্রেরণায়। অন্ধকার পুরীর রহস্যলোকে রূপায়িত হচ্ছে চিরন্তন স্বপ্ন।

রোজ যেমন হয়।

৩

প্রতিদিনের মত তার পরদিনেও যথারীতি জেরা শুরু হয়ে গেল। সি. আই. ডি. দারোগাটি বিনয়ের অবতার। একমুখ হেসে পকেট থেকে পানের ডিবে বার ক'রে একসঙ্গে গোটা-চারেক পান মুখে পুরে ফেললেন। তার পর ডিবেটি অংশুমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, আসুন।

আমি নেব না। ধন্যবাদ।

আজও নেবেন না?

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

দারোগা সাহেব তর্জনীতে খানিকটা চুন লাগিয়ে নীচের দাঁত দিয়ে সেটা কুরে তুলে নিলেন। জরদা খেলেন একটু। তার পরে উঠে জানলা দিয়ে পিক ফেললেন একবার।

আপনি গোড়া থেকেই একটা ভুল করছেন অংশুমানবাবু। আপনি ধ'রে নিয়েছেন যে, আমরা আপনার শত্রুপক্ষ। গভর্মেণ্ট আপনার শত্রু হতে পারে,

আপনারা নিজেরাই শত্রুতা করেছেন তার সঙ্গে ; কিন্তু আমরা আপনার শত্রু নই, অন্তত আমি নই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, যাতে আপনাদের সুবিধে হয়। হাস্যদীপ্ত চক্ষু মেলে চেয়ে রইলেন।

অংশুমান নীরব।

আপনার সঙ্গে আর কে কে ছিল—এই খবরটুকু পেলেই আপনাকে ছেড়ে দেব আমরা। আপনি যে নির্দোষ সে খবর আমরা পেয়েছি। কিন্তু দোষীকেও তো ধরতে হবে। আপনি সে বিষয়ে একটু সাহায্য করুন আমাদের শুধু। সেইজন্যেই আপনাকে আটকে রাখা। নাম কটা ব'লে দিন, বাস্।

আমি তো বলেছি, আমি কিছু জানি না।

দেখুন, ও-সব কথা ব'লে ভোলাতে পারবেন না আমাদের। আপনি যে জানেন তা আমরা জানি।

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

আপনি শিক্ষিত লোক, আপনার অন্তত আইনকে সাহায্য করা উচিত। সমাজকে রক্ষা করবার জন্যেই তো আইন, আপনার অন্তত সে আইনের মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য। একজন লোককে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ন্যাযত হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়া আপনারও কর্তব্য নয় কি? জাস্টিস ব'লে একটা জিনিস আছে তো!

হঠাৎ গ্রীক দার্শনিকের কথাগুলো মনে প'ড়ে গেল তার। লিস্ন্ দেন, আই প্রোক্লেম দ্যাট মাইট ইজ রাইট অ্যাণ্ড জাস্টিস ইজ দি ইন্টারেস্ট অফ দি স্ট্রঙ্গার···। সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্ধদগ্ধ ডেপুটিটার মুখখানাও মনে পড়ল। হাত-পা-মুখ বেঁধে টাঙিয়ে পোড়ানো হয়েছিল তাকে পায়ের দিক থেকে। তার সেই ঠিকরে-বেরিয়ে-আসা লাল বড় চোখ দুটো এখনও যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তারও তো মা বউ ছেলে মেয়ে আছে! তারা কি করছে এখন? তাদের দুঃখে মনটা দ্রবীভূত হচ্ছিল। কিন্তু বহু অসহায় আর্ত নারীকণ্ঠের চিৎকার আবার বেজে উঠল কানে সহসা।···দলে দলে পাঠান-সৈন্য ঘরে ঘরে ঢুকে নারী-ধর্ষণ করছে ওই ডেপুটিটার হুকুমে।

একমুখ হেসে দারোগাবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, বেশ, না হয় ধ'রেই নিলাম, আপনি কিছু জানেন না। আপনি কাকে সন্দেহ করেন তাও বলুন অন্তত।

অংশুমান প্রস্তরমূর্তিবৎ ব'সে রইল, কোনও উত্তর দিলে না।

৪

জেলের বাইরে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের উপর বিশাল একটা শিরীষগাছ। তার উঁচু ডালে ব'সে একটা দাঁড়কাক একটানা ডেকে চলেছে কা—কা—কা—কা—কা—কা···। আর একটি ডালে পাশাপাশি ব'সে আছে একজোড়া ঘুঘু। স্তিমিত-নয়ন নির্বিকার একটি ঘুঘু হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে পিঠ চুলকোতে লাগল। শিরীষগাছের পত্রপুঞ্জে ফুটেছে মরকত-মণির আভা। কাছেই ছোট্ট এক টুকরো ঢালু জমি অপরূপ হয়ে উঠেছে নব-দূর্বাদলশ্যাম কান্তিতে। খঞ্জন-দম্পতি মনের আনন্দে চ'রে বেড়াচ্ছে তার উপরে। তাদের লঘুচপল গতি, পুচ্ছের আন্দোলন নিঃশব্দ-ছন্দে স্পন্দিত করছে পারিপার্শ্বিককে। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের স্বর্ণকান্তি সমুদ্ভাসিত। দ্বিপ্রহরের উগ্র জ্যোতিতে চকচক করছে বেঅনেটের ডগাটা। জেলের গেটে খাকী পোশাক প'রে নিঃশব্দে পদচারণ করছে পাঠান প্রহরী।

৫

অপমানে সমস্ত চিত্ত অবসন্ন, হতশার লক্ষ কণ্টকে বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমাকীর্ণ। তবু সেই কণ্টকবনে ফুল ফুটে রয়েছে একটি। অম্লান কুসুম। অন্তরা।

অন্তরাকে ভালবেসেছিলাম কেন—ভাবছিল অংশুমান। ভালবাসার অর্থ কি? কুসুমের কানে কানে মধুকরের যে গুঞ্জন, কমলকোরকের সুপ্ত পাপড়িতে সূর্যালোকের যে জাগরণমন্ত্র, তাই কি ভালবাসা? লজ্জাবতীর মত স্পর্শকাতর সূর্যমুখীর মত উন্মুখ, আলোকের মত স্বচ্ছ, অন্ধকারের মত নিবিড় কি এ? সহসা তার মনে হ'ল, অন্তরাকে ভালবেসে কি অন্যায় করেছি, অবনত করেছি নিজেকে? যে ভালবাসাকে কোনদিন বিবাহের বন্ধনে বাঁধা যাবে না, যা অসামাজিক, অযৌক্তিক, অহেতুক···। অহেতুক? হঠাৎ মনে হ'ল। অন্তরার সমস্ত মূর্তিটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মানসপটে। ওই তন্বী স্বর্ণলতা, ওকে ভালবাসার হেতু নেই কোনও? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান।···নিশীথ রজনীর তারাভরা আকাশ···দিগন্ত-বিস্তৃত পল্লীপ্রান্তরে ইন্দ্রধনুশোভিত ক্লান্ত-বর্ষণ মেঘপুঞ্জ···বিশাল সাগরের অগণিত ঊর্মি-শিখরে অনাবিল জ্যোৎস্নার লাস্য-লীলা···ছবির পর ছবি জাগতে লাগল মনে।

সহসা মনে হ'ল, সহসা যেন দেখতে পেল সে, দান্তে ছুটে চলেছে বিয়াত্রিচের পিছনে পিছনে নরক পর্যন্ত। নরক···? হ্যাঁ, নরকই তো।

ভালবাসা কি মানুষকে নরকগামী করে? ভাবতে লাগল সে। আমি যা ভোগ করছি এও তো নরক-যন্ত্রণা। অন্তরার জন্যেই তো কারাবরণ করেছি। অন্তরার চক্ষে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করবার জন্যেই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এই পাশবিক ঘূর্ণাবর্তে। তার কাছে আস্ফালন করেছিলাম নিজের পৌরুষ-মর্যাদা, সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাসিয়ে দিয়ে। প্রদীপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দেখেছিল। কোন মন্তব্য করে নি, কোন উৎসাহ দেয় নি, কিন্তু তার মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছিল তাই যথেষ্ট ছিল আমার পক্ষে। তাকে খুশি করবার জন্যে, তার হৃদয় হরণ করবার জন্যেই জীবনমরণ তুচ্ছ ক'রে মেতে উঠেছিলাম আমি। তার স্মিত হাসি, মৌন জয়ধ্বনি পুরস্কৃত করেছিল আমাকে। ধন্য হয়েছিলাম···কিন্তু তার পরিণাম কি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করা? এই অন্ধকার ঘরটায় একা কাটাতে হবে দিনের পর দিন, কতদিন কে জানে! পরক্ষণেই মনে হ'ল, ওই বিয়াত্রিচের প্রেমই দান্তেকে স্বর্গেও নিয়ে গিয়েছিল শেষে।···রুমঝুম রুমঝুম রুমঝুম ···মধুর নূপুররবে অন্ধকার ছন্দিত হয়ে উঠল সহসা।

কে?

আমি বেহুলা। দেবসভায় নৃত্য করছি মৃত স্বামীর গলিত দেহে প্রাণ-সঞ্চার করবার জন্যে।

সব থেমে গেল আবার। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল অংশুমান! অনেকক্ষণ ব'সে রইল। যখন সচেতন হ'ল, তখন তার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। অন্তরা ···অন্তরা···অন্তরা···। পরিপূর্ণ চিত্ত-সাগরের প্রত্যেক ঊর্মিটিই অন্তরা, কিন্তু সাগরের অন্তস্তলে স্রোত বইছে। প্রশ্নের, সন্দেহের। অর্থ কি এ ভালবাসার? বহুর মধ্যে এককে, নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষকে এমনভাবে আবিষ্কার করলাম কেন? অন্তরার মধ্যে যে এত মাধুর্য আছে, তা আমার চোখেই ধরা পড়ল কোন্ মন্ত্রে? অর্থ কি এ আবিষ্কারের···

আবিষ্কারের অর্থ বড় রহস্যময়।

ঘাড় ফিরিয়ে অংশুমান দেখলে, অন্ধকার আলোকিত হয়েছে খানিকটা। একটি মুখ ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। গোঁফদাড়ি নেই। অতিশয় শুচিস্নিগ্ধ। চোখাচোখি হতেই সুমিষ্ট হাসি হেসে বললেন, আমি অরস্টেড। তার পর চুপ ক'রে রইলেন।

নীরবতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। অরস্টেডের দৃষ্টি থেকে একটা নীরব সান্ত্বনা ক্ষরিত হচ্ছিল যেন। মনে হচ্ছিল, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নির্মম পেষণে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, এর জন্যে তিনিই যেন দায়ী, এমনই একটা ভাব ফুটে উঠছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। অংশুমানের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, আবিষ্কারের কাহিনী বড় রহস্যময়। তার দায়িত্ব বা কৃতিত্ব কারও প্রাপ্য নয়। শিশু যখন আবিষ্কার করে যে, মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ আছে, তখন তার কৃতিত্ব কতটুকু! আবিষ্কার করেই বা সে কি ক'রে, কে ব'লে দেয় তাকে?

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার পর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, যে আবিষ্কারের জন্যে আমার এত নাম, তাতে আমার কৃতিত্ব যে কতটুকু তা তো জানই। আমার চোখে পড়েছিল। আমি লেক্‌চার দিচ্ছিলাম, একটা কয়েলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল, কাছেই ছিল একটা ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল! হঠাৎ সেটা ন'ড়ে উঠল, হঠাৎ আমার চোখে প'ড়ে গেল। প্রথমটা পড়ে নি, কিন্তু যতবারই কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেল, ততবারই নড়ল সেটা। কেউ যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বিজ্ঞান-জগতে যেটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, সেটা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। তার জন্যে আমি দায়ী হতে পারি না—না না, কিছুতেই না।

আর্তনাদ ক'রে উঠলেন যেন, তার পর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর্তনাদটা মনে মনে উপভোগ করলে অংশুমান। কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে ঘনিয়ে এল বিষাদের ছায়া। তার আবিষ্কারটা তো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। সে যেচে গিয়ে আলাপ করেছিল। অন্তরার চোখে মুখে কি যেন একটা ছিল। কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি সে। যদিও তার সামনে একটা কথাও বলতে পারত না, কিন্তু দুর্নিবার আকর্ষণে যেতে হ'ত তাকে প্রত্যহ। তার চোখে নিজেকে বৃহৎ প্রতিপন্ন করবার দুর্নিবার প্রলোভনেই সে···

বাজে চিন্তা ক'রে অকারণ শক্তি ক্ষয় করছ।

এলেন আর একজন। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। চমৎকার চোখ দুটি। নাক তীক্ষ্ণ।

অকারণে শক্তি ক্ষয় করছ। তোমার প্রণয়িনীর জন্যে তুমি দেশের কাজে নাব নি, ওটা বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা। দেশই তোমার বরাবর লক্ষ্য, প্রণয়িনীটা উপলক্ষ মাত্র। প্রণয়িনীই যদি তোমার লক্ষ্য হ'ত, তা হ'লে তুমি পাঁচিল টপকাতে, ডেপুটি পোড়াতে যেতে না।

একটা চাপা হাসি উঁকি দিচ্ছিল চোখ দুটি থেকে, কিন্তু নিমেষে সেটাকে

অবলুপ্ত ক'রে ফুটে উঠল অনুযোগমিশ্রিত ভর্ৎসনা।

কক্ষনও যেতে না। মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য কি অর্থাৎ কোন্ রাস্তায় গেলে তার আত্মা সত্যিই পরিতৃপ্ত হয়, তা প্রথমটা সে বুঝতে পারে না। লেখক ডাক্তার হয়, কবি ব্যবসা করতে যায়, দেশপ্রেমিক নারীপ্রেমে কিংবা যশের নেশায় মশগুল হয়ে পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে স্বখাতে ফিরে আসতে হয় বাজে বন্যাগুলো সরে গেলে। এই দেখ না, আমি সোল্‌জার হব ব'লে মেতে ছিলাম…

একটু হেসে তার পর বললেন, না মেতে উপায়ও ছিল না। সোল্‌জার হওয়াটাই তখনকার দিনে ফ্যাশান ছিল যে। ফ্যাশান জিনিসটা হাম-জ্বরের মত, ওর কবল এড়ানো শক্ত। কিন্তু পলিটেক্‌নিকের পরীক্ষায় পাস না করলে সেকালে সোল্‌জার হওয়া যেত না। সেই পরীক্ষা দিতে হ'লে অঙ্ক শিখতে হ'ত। অঙ্ক নিয়ে মাতলাম। সেই যে মাতলাম, ব্যস্। ওরা দেখলে, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো বৃথা। পাঠালে অব্‌জার্‌ভেটরিতে। বিওর সঙ্গে ভাব হ'ল। গ্যাসের রিফ্র্যাক্‌টিং প্রপার্টি নিয়ে পড়লাম। তার পর মেরিডিওনাল মেজার্‌মেণ্ট। পিরেনিজ পাহাড়ের চুড়ায় উঠে…তুমি তো সব জানই।

একটু চুপ ক'রে আর একটু হেসে বললেন, না, জান না, নিদারুণ শীতে পিরেনিজ পাহাড়ের চুড়ায় দাঁড়িয়ে যখন ভৌগোলিক সঙ্কেত করেছিলাম, তখন আমার কষ্ট হয় নি, আনন্দ হয়েছিল—আমার জীবনচরিতকার সে কথাটা লেখে নি। তার পর পাহাড় থেকে নাববার সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডরা আমাকে স্পাই ভেবে যখন তাড়া করেছিল, তখনও আমার ভয় হয় নি, অদ্ভুত একটা আনন্দ হচ্ছিল, এমন কি বেল্‌ভার ক্যাস্‌লে পালিয়ে এসে সেই ভণ্ড পাদ্রিটার পাল্লায় পড়লাম যখন, যিনি আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তখনও আমার রাগ হয় নি, মজা লাগছিল। আমার মনের মধ্যে অফুরন্ত নির্ভীক যে আনন্দের ভাণ্ডার ছিল, সে খবর আমার জীবনচরিত থেকে পাও নি তুমি। ওইটে ছিল ব'লেই কাবু করতে পারে নি আমাকে। বিপদ তো কম হয় নি, সবই তো পড়েছ! পাদ্রির কাছ থেকে পালিয়ে পেয়ে গেলাম একখানা অ্যাল্‌জেরিয়ান জাহাজ, কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই পড়লাম আবার একদল স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুর হাতে। তারা আমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এল স্পেনে। প্রথমে রাখলে একটা উইণ্ডমিলে, তার পর একটা জাহাজের খোলে, প্রায় তোমারই মত অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দমি নি। ওদেরই একজনের সঙ্গে ভাব ক'রে

ফেললাম। হ্যাঁ, ওইটি চাই, দরকার হ'লে শত্রুপক্ষের সঙ্গেও ভাব করা চাই। শত্রুপক্ষের মধ্যেও ভাব করবার মত লোক পাওয়া যায় বইকি। আমি যে লোকটার সঙ্গে ভাব করেছিলাম, সে অতি চমৎকার লোক। এত চমৎকার যে, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আমায় ছাড়িয়ে নিলে, তার পর টিকিট ক'রে তুলে দিলে একটা জাহাজে। কিন্তু কপাল ছিল মন্দ, ঝড় উঠল। আমাদের জাহাজকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে একেবারে আফ্রিকায়। সেখানে আবার স্প্যানিয়ার্ড। কিন্তু এবার ব্যাটারা নিজেদের মধ্যেই এমন মারামারি শুরু ক'রে দিলে যে, আমি পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ছ মাস পরে দেশে ফিরে। এত কাণ্ড ক'রেও কিন্তু সোল্‌জার হলাম না, কিছুই হলাম না, শেষ পর্যন্ত আমাকে ইলেক্‌ট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিজ্‌ম্ নিয়ে পড়তে হ'ল। কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল ন'ড়ে উঠছে কেন—অরস্টেডের এই আবিষ্কার পেয়ে বসল আমাকে। যতক্ষণ না বার করলাম যে, কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে কয়েলটাই ম্যাগ্‌নেট হয়ে যায়, ততক্ষণ আমার শান্তি ছিল না। কিন্তু বার করবার পর কি আনন্দ! তাই বলছি, আনন্দটাই আসল জিনিস, ওটা না থাকলে কিছু হয় না। আমার কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল অরোরা বোরিয়ালিস আর ম্যাগ্‌নেটিক স্টর্মের সম্পর্ক আবিষ্কার ক'রে, মানে, হ'ল কি...

অংশুমান সবিস্ময়ে শুনছিল।

আপনি কি আরোগা?

প্রশ্ন শুনে থমকে গেলেন আরোগা। পর-মুহূর্তেই চ'টে গেলেন কথায় বাধা পড়াতে।—আমি কে তা নিয়ে কি দরকার, যা বলছি শোন না। আনন্দটিই আসল জিনিস, ওইটে না থাকলে তলিয়ে যাবে। তুমি ওই যে একটা থিয়োরি খাড়া ক'রে মন গুমরে ব'সে আছ যে, অন্তরার জন্যেই তুমি এত কাণ্ড করেছ, ওটা একদম বাজে কথা। যা তোমার আনন্দকে ম্লান করছে, জানবে তা বাজে জিনিস—বিষবৎ পরিত্যাগ করবে সেটা। তা ছাড়া সত্যিই ওটা বাজে কথা। অন্তরা হয়তো তোমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে—আমি যেমন সোল্‌জার হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু দেশই তোমার—

তুমি বড্ড বেশি বকবক করছ। ঘুমুতে দাও না বেচারীকে একটু।—আর আর একজন এসে দাঁড়ালেন আরোগার পাশে। প্রশস্ত ললাট, সামনের দিকে টাক থাকাতে আরও প্রশস্ত দেখাচ্ছে। মাথার পিছনে ছোট কাঁচা-পাকা চুল।

কাটা কাটা নাক মুখ চোখ। বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু সমস্ত মুখে বিনীত ভদ্রতা যেন মাখানো।

ঘুমুবে? এর মধ্যেই? এই তো সবে দশটা বেজেছে। অংশুমানের দিকে চেয়ে আরোগা প্রশ্ন করলেন, এঁকে চেনো? তার পর নিজেই উত্তর দিলেন, ইনি স্টার্জন। হাঁ, সেই মুচির ছেলে। এঁরই বাপ কেবল মাছ ধ'রে আর পাখি শিকার ক'রে বেড়াতেন, তাও চুরি ক'রে। পোচিং! ইনিও আর্মিতে ঢুকে কুড়ি বছর কামান দেগেছিলেন। কিন্তু কিচ্ছু হয় নি। হ'ল একদিন, বিরাট এক ঝড় উঠে। বজ্রের গর্জন শুনে আর বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে তাক লেগে গেল ভদ্রলোকের। কামান দাগার অবসরে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে হ'ল। প্রথমে গ্রীক ল্যাটিন অঙ্ক, তার পর ইলেক্‌ট্রিসিটি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ শেষ পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট তৈরি করতে হ'ল।

না না, আমি—

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন স্টার্জন। তার পর সামলে নিয়ে বললেন, এস, চল যাই। ও ঘুমুক এখন—

এই কুনো স্বভাবের জন্যেই তুমি মরেছ। তোমার কীর্তিটা লোকে জানতে পারলে না ভাল ক'রে। ওদিকে আমেরিকায় হেন্‌রির জয়জয়কার। আচ্ছা, হেন্‌রি কোথা গেল বল তো? তারও যে আসবার কথা ছিল! আসবে বোধ হয় এখুনি, দাঁড়াও না একটু, বেশ জমানো যাক সবাই মিলে।

না, চল, যাই আমরা।

হেন্‌রির সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করছে বুঝি? আমি বলছি, ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের কীর্তি তোমারই প্রাপ্য, হেন্‌রির নয়। হেন্‌রিও সে কথা স্বীকার করবে। তার সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার অধিকার আছে তোমার, লজ্জা কি?

আরোগার চোখের দৃষ্টিতে চাপা কৌতুক ফুটে উঠল।

কি যে বলছ, লজ্জা কিসের! তা ছাড়া আমার প্রাপ্য তো আমি পেয়েছি।

কি পেয়েছ?

একটা রূপোর মেডেল। ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট তৈরি ক'রে বিক্রিও করেছি অনেকগুলো। লেক্‌চারার হয়েছিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলাম, আবার কি চাই?

চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। যাঁকে লাজুক ব'লে মনে হচ্ছিল, দেখা

গেল, তিনি বেশ সপ্রতিভ।

অংশুমান আর থাকতে পারলে না।

আচ্ছা, একটা কথা কি আপনাদের কখনও মনে হয় নি, নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি পজিটিভের দিকে যায় কেন ?

যায় কেন ? যায় ব'লেই যায়, যাওয়াই নিয়ম।—ভ্রূযুগল উত্তোলন ক'রে আরোগা বললেন।

স্টার্জন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন।

কেন এমন নিয়ম হ'ল ?

আরোগা 'শ্রাগ' করলেন। তার পর স্টার্জনের দিকে ফিরে বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ, এর ঘুমোনো দরকার এখন।

অংশুমানকে বললেন, ঘুমোও তুমি। আর যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, সেই কথাটা মনে রেখো,—দেশই তোমার আসল প্রেরণা, অন্তরা নয়। একটা বাজে চিন্তা ক'রে মুষড়ে পড়বার দরকার নেই। চললাম। গুড নাইট।

চ'লে গেলেন দুজনেই।

অংশুমানের ঘুম এল না। চোখ বুজে সে শুয়ে রইল চুপ ক'রে। নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার চতুর্দিকে। তার পর ধীরে ধীরে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি···তোমারই দিকে চলেছি অক্লান্ত গতিতে···সত্য পথে··· সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে···"

কে—কে তুমি ?

চিৎকার ক'রে উঠে বসল অংশুমান। কোন উত্তর এল না। হঠাৎ সে দেখতে পেলে, অসংখ্য উজ্জ্বল খদ্যোতপুঞ্জ উড়ে চলেছে অজানা অন্ধকারের দিকে অশ্রান্ত গতিতে তমিস্রাকে তুচ্ছ ক'রে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। চলেছে অন্তহীন প্রবাহে জ্যোতির বুদ্‌বুদমালা। কে ওরা··· কি ওরা···? চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। চেষ্টা করতে লাগল ঘুমোবার। ঘুম কিন্তু এল না। বার বার মনে হতে লাগল, সত্যিই কি অন্তরা উপলক্ষ্য মাত্র, দেশই আসল লক্ষ্য...দুইই এক।

অংশুমান চোখ খুলে দেখলে, আবার দুজন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখেই চিনতে পারলে, দুজনেরই ছবি অনেকক্ষণ ধ'রে দেখেছিল সে আজ সকালে। হেন্‌রি আর ফ্যারাডে।

ফ্যারাডে হেসে বললেন, আমরা দুজনেই প্রমাণ করেছি যে, দুইই এক। ইলেকট্রিসিটি আর ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ। বিদ্যুৎপ্রবাহ লোহার তারকে যেমন চুম্বকে পরিণত করে, চুম্বকও লোহার তারকে তেমনই বিদ্যুতান্বিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এখন আমরা বুঝেছি, একই শক্তির বহু রূপ। বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলো—একই শক্তির বিভিন্ন লীলা। ক্লোরিন গ্যাস যখন লিকুইড হ'ল, তখনও তাই দেখলাম। তোমার প্রেমও তাই। অন্তরা আর দেশ যাকেই ভালবাস, জিনিসটা এক। এটাও এনার্জির আর একটা রূপ বোধ হয়। হঠাৎ থেমে গেলেন ফ্যারাডে, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, তার পর বললেন, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গতি—দ্রুত গতি নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন। চুম্বকের ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে আবর্তিত হ'লে সামান্য ধাতুখণ্ডেও বিদ্যুৎতরঙ্গ বইবে। দ্রুতগামী বিদ্যুৎতরঙ্গের সমীপবর্তী হ'লে সামান্য লৌহখণ্ডও পরিণত হবে চুম্বকে। সামান্য কামারের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডেও জীবনের ঘূর্ণাবর্তে দ্রুতবেগে আবর্তিত হতে হতে চুম্বক হয়ে উঠেছিল, তাই না তার টানে স্বয়ং সার হাম্‌ফ্রি ডেভি এসে হাজির হয়েছিলেন তার দ্বারে। হা-হা-হা-হা—

উচ্চকণ্ঠে হেসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফ্যারাডে।

জোসেফ হেন্‌রি দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ হয়ে। যেন অ্যাপোলো। ঋজু, বলিষ্ঠ, সৌম্য, শান্ত। চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে মনীষা ও মাধুর্যের মিলন-মহিমা। স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ অংশুমানের দিকে।

তার পর বললেন, ফ্যারাডে যা বললেন, তা ঠিক। গতিই আসল। চুম্বকের আবহাওয়ায় অবিরাম বিঘূর্ণিত না হ'লে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইত না, আর তা না বইলে গ'ড়ে উঠত না বর্তমান জগৎ। সবই ঠিক। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত শুধু গতি নয়, গতিপথেরও বিশেষ মূল্য আছে একটা। একই বৈদ্যুতিক শক্তি সোজা তারে যতটা স্পার্ক দেয় তার চেয়ে ঢের বেশি দেয় তারটা কয়েল ক'রে নিলে। তোমাদের পরাধীনতার মোচড় তেমন জোরালো হয় নি বোধ হয়, তার জোরে স্পার্ক দিতে পারছ না···। তাঁর গম্ভীর মুখ হাস্যস্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

জোরালো হয় নি? এর চেয়ে আর কি হবে?—ব'লে উঠল অংশুমান।

তা হলে বোধ হয় লিক করছে কোনখান থেকে। লিক করলে জোর কমে যায়। স্টার্জনের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট যে বেশি ভারী জিনিস তুলতে পারে নি, তার কারণ তারগুলো ইন্‌স্যুলেটেড ছিল না। আমি পাড়ার মেয়েদের

খোশামোদ ক'রে প্রত্যেক তারের গায়ে সিল্কের ওয়াড পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ম্যাগনেট তাই জোরালো হয়েছিল। তোমরা শক্তিকে সংহত করতে পারছ না বোধ হয়। বাজে বক্তৃতার অকারণ লম্ফঝম্পে অনেক শক্তি নষ্ট হচ্ছে সম্ভবত···

কিসের শক্তি আপনি বলছেন ?

ধর, প্রেমেরই। ও, কিন্তু আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

স্ক্রীনিং এফেক্‌ট্‌ হতে পারে। প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারি কয়েলের মাঝখানে যে কোন একটা ধাতুর চাদর রাখলে কারেণ্টের জোর ক'মে যায়। অন্তরা আর তোমার মাঝখানে মাজটা স্ক্রীনের কাজ করছে হয়তো, কিংবা হয়তো, তোমার দ্বিধা। সিমিলার্‌লি, দেশ আর তোমার মাঝখানে বিদেশী শাসন, কিংবা তোমাদের তামসিকতা, কিংবা সাম্‌থিং, ঠিক জানি না...এইগুলো অনুসন্ধান করা দরকার। আচ্ছা, ধর—না থাক্‌, রাত হয়েছে, ঘুমোও তুমি।

আচ্ছা, অন্তরাকে ভালবেসেছি ব'লে দেশের প্রতি আমার একনিষ্ঠতা কি ক'মে যেতে পারে ?—প্রশ্নটা না ক'রে পারলে না অংশুমান।

তা কখনও যায় নাকি ? এই আমারই বেলা দেখ না, আমি তো জীবনে একনিষ্ঠ হতে পারি নি। ছেলেবেলায় একনিষ্ঠ কবি ছিলাম, কাব্য নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকতাম। সেকালের এমন কোন নভেল নাটক ছিল না, যা পড়ি নি। শুধু নিজে পড়তাম না, আর পাঁচজনকে ডেকে প'ড়ে শোনাতাম। থিয়েটার করা একটা বাতিক ছিল। যেখানেই সৃষ্টির মহিমা দেখেছি, মন মেতে উঠেছে। গ্রেগারির বইখানাও যেই হাতে পড়ল, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মন। কল্পলোকের নূতন একটা দ্বার খুলে গেল যেন। কাব্য ভাল লাগল ব'লে বৈজ্ঞানিক হতে আমার আটকায় নি। বস্তুত বড় বৈজ্ঞানিক আর কবিতে কোন তফাতই দেখতে পাই না আমি। অন্তরার প্রতি তোমার প্রেম দেশ-প্রেমকে ম্লান করবে কেন ? বিজ্ঞানের উপমা দিয়েই যদি বলি, বেশি তার জড়ালে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের শক্তি যদি বাড়ে—দেশের বেশি লোককে ভালবাসলে দেশপ্রেমই বা বাড়বে না কেন ? দেশ মানে—দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষ। দেশের মানুষকে ভালবাসি ব'লেই দেশের মাটি ফুল ফল কীট পতঙ্গ পর্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ তো ভালবাসা দিয়েই হয়। সেই যোগসূত্র দিয়েই তুমি তোমার আদর্শ, তোমার আবেগ

সুপ্রসারিত করতে পার নিত্য নূতন লোককে ভালবেসে। যত বেশি লোককে ভালবাসবে, তত বেশি জোর পাবে। আর একটা বৈজ্ঞানিক উপমা মনে পড়ছে। অ্যাম্‌পিয়রই প্রথমে ভেবেছিল যে, বিদ্যুতের তরঙ্গযোগে দূরে খবর পাঠানো সম্ভব। চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু হ'ল না, তার তরঙ্গের জোর ছিল না ব'লে। বার্লো দেখিয়ে দিলে যে, দু শো ফিটের বেশি যাবার শক্তি নেই তার। আমি কিন্তু আমার ইন্‌টেন্‌সিটি ব্যাটারি আর ইন্‌টেন্‌সিটি ম্যাগ্‌নেট দিয়ে এক মাইলের বেশি দূর পর্যন্ত কারেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। এক মাইল দূরে গিয়ে আমার কারেণ্ট ম্যাগ্‌নেটিকে নিড্‌লটিকে ঘুরিয়ে ঠিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল।

কৃতিত্বের আনন্দে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা হ'লে প্রেমের একনিষ্ঠতা ব'লে আপনি কিছু মানেন না?

মানি বৈকি। কাব্য পড়েছি, প্রেমের একনিষ্ঠতা মানি না? কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শক্তি শুধু প্রেম নয়। একটি খাবারের প্রতি তুমি যদি একনিষ্ঠ থাকতে পার, তার জন্যে বাহবা অবশ্যই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু একাধিক খাবার খেয়ে হজম করতে পারলে একনিষ্ঠতা থাকবে না বটে, কিন্তু শক্তি বাড়বে। তা ছাড়া প্রথম জীবনে মানসিক একনিষ্ঠতার অর্থ আছে নাকি কোন? যতটা পার, যেখান থেকে পার, আহরণ ক'রে যাও। সমস্ত পরিপাক ক'রে প্রাণবন্ত জীবনীশক্তির সংহত একনিষ্ঠতা পরে হবে। আমি প্রথম জীবনে কাব্য নিয়ে ছিলাম, তার পর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-জগতেও এক রাস্তায় চলি নি। ইলেক্‌ট্রিসিটি নিয়ে ছিলাম অনেক দিন। তার পর আবিষ্কার করলাম থার্মো-টেলিস্কোপ। সূর্যের গায়ে যে কালো কালো স্পট আছে, তাদের টেম্পারেচার কত—তাই নিয়ে কাটল কিছুদিন। তার পর কোহিশন অব লিকুইড্‌স্‌, ফস্‌ফরেসেন্‌স্‌, শব্দ-বিজ্ঞান—কত কি করেছি, এখনও করছি, কিন্তু লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। না না, ওসব ভুল ভাবছ, অন্তরা তোমার দেশপ্রেমের ক্ষতি করতে পারবে না। ঘুমোও, অনেক রাত হয়েছে, চললাম...

মিলিয়ে গেলেন।

অংশুমানের মনের সমস্ত গ্লানি অপসারিত হয়ে গেল। অন্তরার ভালবাসাটা কাঁটার মত বিঁধে ছিল মনে। দেখতে দেখতে ফুল হয়ে ফুটে উঠল সেটা। চোখ বুজে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, অন্তরাই যেন দেশ-মাতৃকা।

"যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে···"

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল আবার।

৬

ছোট বড় স্তূপ স্তর, নানাবিধ মেঘপুঞ্জ নিঃশব্দ মন্থর গতিতে একত্রিত হয়েছে পূর্বদিগন্তে। রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিক স্তব্ধ। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী স্তম্ভিত হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, কাল-কালিন্দীর কৃষ্ণতরঙ্গমালা মূর্ত হয়ে গেছে যেন সহসা অদ্ভুত কোন মন্ত্রবলে। বেতসবনে অস্ফুট মর্মরধ্বনি উঠছে একটা। অন্ধকার অন্তরের অব্যক্ত বেদনা মূর্ত হতে চাইছে যেন সে অস্পষ্টতায়। কিসের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করছে সব? সারি সারি বাদুড় উড়ে চলেছে। বর্ষা-স্নাত বনানীর বন্য-মদির গন্ধে অন্ধকার ভারাক্রান্ত। ঝিল্লী ডাকছে না। সমস্ত নিঃশব্দ। সেই নিঃশব্দতার পটভূমিকায় অস্ফুট মর্মর-ধ্বনির সূক্ষ্মজাল সূক্ষ্মতর হচ্ছে ক্রমশ অন্ধকারের নিবিড়তায়। কি যেন একটা আসন্ন! সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সবাই। সহসা মেঘের কোলে কোলে লাগল জরির পাড়, বৃক্ষশ্রেণীর শিখরে শিখরে জাগল জ্যোতির আভাস, ঝিল্লীর কণ্ঠে ফুটল ভাষা, আকুল হয়ে উঠল বনমর্মর।

চাঁদ উঠল। চিরকাল যেমন ওঠে।

৭

সি. আই. ডি. দারোগা আবার এলেন।

আর বোধ হয় আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না মশাই।

অংশুমান রোজ যেমন থাকে, আজও তেমনই চুপ ক'রে রইল।

আপনি চুপ ক'রে আছেন, কিন্তু আর কেউ চুপ ক'রে নেই। সবাই আপনার নাম বলছে।

আড়চোখে চাইলেন একবার অংশুমানের দিকে, তার পর পানের ডিবে বার ক'রে চার-পাঁচ খিলি পান কুপকুপ ক'রে খেয়ে ফেললেন।

আসুন।

আমি তো খাই না জানেন।

আরে, নিন না মশাই, এক খিলি খেয়েই দেখুন না। চমৎকার মিঠে পান খাসা লাগবে। নিন, লোকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলে, আপনি এক খিলি পান খেতে পারছেন না?

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

আচ্ছা, পান না নিলেন, আসল কথাটা ব'লে ফেলুন দিকি। আমার কথাটা

শুহুন, যা জানেন ব'লে ফেলুন সব। ব'লে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ঢেকে রাখতে পারবেন না তো কিছু। আপনার বন্ধুরাই ব'লে দেবে সব। দিচ্ছেও। ধরাও পড়েছে অনেক।

অংশুমান নীরব।

বলবেন না কিছু?

বলেছি তো, আমি কিচ্ছু জানি না।

দারোগা সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবার একটু।

আপনি মনে করছেন, আপনি খুব দেশের কাজ করছেন। কিন্তু এর ফলে কি হবে জানেন? দেশই আপনার উচ্ছন্ন যাবে। গভর্মেণ্টের সঙ্গে বেশি চালাকি চলে না। রেল-লাইন উপড়ে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, পোস্ট-আপিস পুড়িয়ে কতক্ষণ জব্দ করবেন আপনি গভর্মেণ্টকে, যখন তাদের হাতে হাজার হাজার এরোপ্লেন আর বোমা রয়েছে? মেরে ধুনে দেবে সব। অতও করতে হবে না, চাবুকের চোটেই সিধে হয়ে যাবে। প্রতি গ্রাম থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় হচ্ছে, গোরা সোল্‌জার দেখেই পেচ্ছাপ ক'রে ফেলছে অধিকাংশ লোক, আপামরভদ্র হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ছে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের পায়ের তলায়। তার পর কন্‌ট্রোলের যে রকম ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম, তাতে একটি লোক খেতে পাবে না, পরতে পাবে না, প্রয়োজনীয় কোন জিনিস পাবে না আর। এক মুঠো চালের জন্যে, এক টুকরো কাপড়ের জন্যে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হবে সবাইকে এই গভর্মেণ্টেরই দ্বারে দ্বারে। আর এসব কেন হবে, জানেন? আপনাদের মত ত্যাঁদড় লোকেদের একগুঁয়েমির জন্যে। আপনাদের কি ক'রে শায়েস্তা করতে হয় তা গভমের্ণ্ট জানে, মাঝ থেকে কতকগুলো নিরীহ লোক মারা যাবে।

উঠে গিয়ে একবার পিক ফেললেন। তারপর অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বললেন; তার চেয়ে ব'লে ফেলুন যে, হীট অব দি মোমেণ্টে ক'রে ফেলেছিলাম, মাথার ঠিক ছিল না, আমরা সামলে-সুমলে নেব সব। ছাড়া পেয়ে যাবেন। সদ্‌বুদ্ধিটা নিন দয়া ক'রে।

আর এক খিলি পান খেলেন।

অংশুমান নীরব।

যা জানেন, অকপটে ব'লে ফেলুন সব। কেন কচলাচ্ছেন মিছে?

আমি কিচ্ছু জানি না।

আচ্ছা লোক আপনি মশায়! ধন্য! ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এমনটি আর দেখি নি। মিছিমিছি কত লোককে কষ্ট দিচ্ছেন বলুন তো! আপনার বুড়ো বাবাকে পর্যন্ত ধ'রে নিয়ে গেছে জানেন? মারধোর পর্যন্ত করছে নাকি।

অংশুমান চমকে উঠল।

বাবাকে ধরবার মানে?

মানে আপনিই।

আর একটু থেমে হেসে বললেন, আর আপনিই এর প্রতিকার করতে পারেন। সত্যি কথাটা বলতে দোষ কি?

অংশুমান নীরব। বাবার শীর্ণ মুখখানা চোখের উপর ভাসছিল তার। সত্যিই নিরীহ লোক। সারাজীবন কেরানীগিরি ক'রে সসঙ্কোচে কাটিয়েছেন। চারটে মেয়ের বিয়ে দিতে আর অংশুমানকে পড়াতেই যথাসর্বস্ব গেছে। ধার হয়েছে কিছু। আশা ছিল, অংশুমান এম. এস-সি. পাস ক'রে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। এম. এস-সি. সে পাস করেছে। কিন্তু সংসারের দুঃখ ঘুচল কি?

কি ঠিক করলেন?

বলেছি তো, আমি কিছু জানি না।

উঃ, সাংঘাতিক লোক আপনি! ডেন্‌জারাস। নিজেই কষ্ট পাবেন। আচ্ছা, এখন উঠি তবে। আবার আসব। সহজে হাল ছাড়বার লোক আমি নই। ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন, ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। সংসারটাকে এমন ক'রে ডুবিয়ে দেবেন না, বুঝলেন, ভেবে দেখুন।

চ'লে গেলেন।

নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল অংশুমান।

৮

কখনও ফুলের উপর বসছে, কখনও পাতার উপর, কখনও বেড়ার শুকনো কঞ্চির ডগায়। ব'সেই উড়ছে আবার। চঞ্চল একদল প্রজাপতি। এক মুহূর্ত স্থির নয়, পাগলের মত উড়ে বেড়াচ্ছে খালি। নানা রঙের। সূর্যালোকের রঙগুলো হঠাৎ যেন স্বাতন্ত্র্য-লাভ করেছে এই নির্জন প্রান্তরে। স্পর্শ ক'রে বেড়াচ্ছে সব কিছু মনের আনন্দে। শিয়ালকাঁটার কণ্টকপল্লবকে মহিমান্বিত ক'রে সোনার বরণ যে ফুলগুলি ফুটেছে, তারা যেন উপভোগ করছে খাম-খেয়ালী

প্রজাপতিদের এই হুড়োহুড়ি। অপরূপ হাসি ফুটেছে তাদের মুখে। কুহু-কুহু কুহু-কুহু কলকণ্ঠে বাহবা দিয়ে উঠল যেন কোকিলটা। বসছে উড়ছে, বসছে উড়ছে—বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। বিচিত্রপক্ষ কতকগুলো খেয়াল মাতা-মাতি ক'রে বেড়াচ্ছে দুপুরের রোদে।...

চিরকালই করে।

৯

অন্ধকার।

অসংখ্য ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত স্বার্থপর ধূর্ত মিথ্যাচারী বিশ্বাসঘাতক বিলাস-লোলুপ কামনা-ক্লিষ্ট আতুর জনতা...হিমালয় থেকে কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম···কোথাও বাদ নেই। অথচ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই দেশ, রামায়ণ মহাভারত জাতক গীতা এই দেশেরই কাব্য, মহত্ত্বই এ দেশের মেরুদণ্ড, পরার্থপরতাই জীবন-মন্ত্র। সেই দেশের এ কি দুর্দশা। আকাশচারী বিহঙ্গম আফিঙের নেশায় অভিভূত, পিঞ্জর-বন্দনা করছে মধুরকণ্ঠে। নাদিরশাহ তৈমুরলঙ্গ বহু ভারতবাসীকে হত্যা করেছিল, বহু বিদেশী দস্যু বহুবার লুণ্ঠন ক'রে গেছে ভারতকে, কিন্তু এমন নিঃস্ব আমরা কখনও হই নি। আজ আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, আদর্শ লাঞ্ছিত, বিবেক মোহগ্রস্ত। যে পদাঘাতে আমাদের সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, সেই পদই লেহন ক'রে চলেছি সগৌরবে। ওই দারোগাটাও আমাদের দেশের লোক।...

উত্তপ্ত মস্তিকে উঠে বসল অংশুমান। মনে হ'ল, যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। বাবার মুখটা মনে পড়ল আবার। মারধোর করছে? ওই নিরীহ বৃদ্ধকে মারতে হাত উঠছে কার? আমাদেরই দেশের লোকের, আবার কার? পাঞ্জাবে জালিয়ানবালাবাগ হয়েছিল, কিন্তু পাঞ্জাবীরাই সবচেয়ে বেশি রাজভক্ত। বাংলা দেশ শ্মশান হয়ে গেল, কিন্তু বাঙালীরাই গোয়েন্দাগিরিতে আজও সবচেযে বেশি দক্ষ। ঘরে ঘরে বিশ্বাসঘাতক, কাউকে বিশ্বাস নেই। না, কাউকে না। কিন্তু সত্যি কি কোনও উপায় নেই? আছে, নিশ্চয় আছে। কোথায় ত্রাণকর্তা, কোথায় তুমি?—আর্তনাদ ক'রে উঠল অংশুমান।

ধীরে ধীরে কারা-প্রাচীরে মূর্ত হয়ে উঠল এক অশ্বারোহী মূর্তি; কৃপাণধারী দিব্যকান্তি পুরুষ। অশ্বটি বড় জীর্ণশীর্ণ। কৃপাণটিও মরচে-ধরা। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি চেয়ে রইলেন অংশুমানের দিকে। প্রত্যাশাভরা প্রদীপ্ত দৃষ্টি।

অংশুমানের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে। মুখে ভাষা ফুটল অনেকক্ষণ পরে।

আপনি কে?

আমি? চিনতে পারছ না?

অংশুমান চেনবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। অথচ অচেনাও নয়, কোথায় যেন…

তোমাদেরই সৃষ্টি আমি। যুগে যুগে তোমরাই সৃষ্টি করেছ আমাকে নানা রূপে। তোমাদের সৃজনীশক্তির মধ্যেই আমার অস্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছে কূর্ম মৎস্য বরাহ অবতারে। নৃসিংহরূপে আমিই হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেছি, বলির গর্ব আমিই চূর্ণ করেছি একদিন, অত্যাচরী ক্ষত্রিয়কুলকে আমারই পরশু নির্মূল করেছিল, দশমুণ্ড রাবণকে আমিই সংহার করেছি একদা, কুরুক্ষেত্র প্রকম্পিত হয়েছিল একদা আমারই পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে, কংস-জরাসন্ধকে আমিই বধ করেছি, আবার অহিংসার বাণী আমিই প্রচার করেছি বুদ্ধরূপে। আমারই চিরন্তন আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়েছে তোমাদের কবির রচনায়।—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কিন্তু তোমাদের পুরুষকারই আমাকে সম্ভব করে। আমি আজও তোমাদের কাছে কল্পনামাত্র, তাই আমার অশ্ব জীর্ণশীর্ণ, কৃপাণ তীক্ষ্ণতাহীন।

অংশুমান সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অশ্বটির দিকে। সত্যিই বড় রুগ্ণ। তার মনের কথা টের পেয়ে সেই দিব্যকান্তি পুরুষ আবার বললেন, আমার অশ্ব রুগ্ণ নয়, ক্ষুধিত। সামান্য ভূমির শস্যে এর পুষ্টি হয় না।

কোন্ ভূমির শস্য চাই তা হ'লে?

তাজা প্রাণের রক্ত যে ভূমিতে সার সিঞ্চন করেছে, সেই ভূমির শস্য চাই এই দেবদত্ত অশ্বকে সঞ্জীবিত রাখার জন্যে। বিদেশীর চর্বিত নানা ইজ্‌ম্ গলাধঃকরণ ক'রে যে পুরীষ তোমরা সৃষ্টি করছ, তাও একপ্রকার সার বটে, কিন্তু সে সারে উৎপন্ন ফসল আমার অশ্ব স্পর্শ করে না, তাই সে দুর্বল। আমার কৃপাণও তাই অতীক্ষ্ণ। ধৈর্যের কঠিন প্রস্তরে সবল হস্তে শান দিয়ে আমার হস্তে এ কৃপাণ তুলে দেবে যে, কোথায় সেই বীরপুরুষ? তাকেই অন্বেষণ করছি। তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি কারা থেকে কারান্তরে। আমি জানি কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই তার তপস্যা,…বন্দিনী জননীর কোলে আমিও

জন্মলাভ করেছিলাম একদিন এই কারাগারেই।

বলুন, কে আপনি ?

আমি তোমাদের অসমাপ্ত কল্কি অবতারের কল্পনা।—মিলিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে।

আবার অন্ধকার।…

তোমাদেরই পুরুষকার আমাকে সম্ভব করে—ধীরে ধীরে এই কথাগুলো মূর্ত হয়ে সকৌতুকে চেয়ে রইল যেন তার দিকে। কি রকম পুরুষকার চাই ? জ্ঞান হয়ে থেকে একদিনও তো অলস হয়ে ব'সে থাকে নি সে। ভাল হব, বড় হব, দেশকে ভাল করব, বড় করব—এই সাধনাই তো করছে অহরহ। তবু কিছু হবে না ?

হবেই। নিশ্চয় হবে। সমস্ত জীবনকে ইন্ধন করেছ, আগুন জ্বলবে না, তা কি হতে পারে কখনও ? জ্বলবেই।

সবিস্ময়ে অংশুমান চেয়ে রইল। নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্বয়ং বিবেকানন্দ সামনে দাঁড়িয়ে।

এক টুকরো চকমকির মধ্যেও আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে ; আঘাত করলেই তা ছিটকে বেরিযে আসে। আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত ক'রে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হ'যো না।

সহসা অন্তর্ধান করলেন।

অন্ধকার হয়ে গেল আবার।

অংশুমানের সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে হ'ল, বিবেকানন্দের এই বাণী নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পথে পথে প্রচার করা উচিত তারস্বরে "আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত ক'রে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হ'য়ো না।"

সহসা উঠে ছুটে বেরিয়ে যেতে গেল সে, বন্ধ দরজায় প্রত্যাহত হয়ে নতুন ক'রে আবার মনে মনে পড়ল যে, সে বন্দী। বন্দী ! তা হ'লে ? মনের মধ্যে যত কথা জ'মে উঠেছে, তা কি কোনদিন বলা হবে না কাউকে ? এই চারটে দেওয়ালের মাঝখানে তা চাপা থেকে যাবে চিরকাল ? সমস্ত ছাপিয়ে এই দুঃখটাই তার মনে বড় হয়ে উঠল, চাপা থেকে যাবে সব ? যা ভাবলাম, যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা বাইরে আর প্রকাশ করতে পারব না হয়তো জীবনে। বাইরের সঙ্গে যোগ-সূত্র ছিন্ন হয়েছে চিরকালের মত।

"একটা কথা শুনলে বোধ হয় আশ্বস্ত হবে—যোগ-সূত্র কখনও ছিন্ন হয় না,

ছিন্ন করা যায় না। আমরাই প্রথমে এর আভাস পেয়ে প্রমাণ করেছিলাম। তার পর আরও অনেকে করেছেন পরে আরও ভালভাবে।”

অংশুমান দেখলে, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। সকলেরই ছবি দেখেছিল, সকলকেই চিনতে পারল সে। ওয়াট্‌সন, সাল্‌ভা, সোমেরিং, স্টিন্‌হীল, মর্স, লিণ্ড্‌সে, হাইটন···। সবাই স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে।

“আগে সকলের ধারণা ছিল যে, তার না থাকলে বুঝি বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে না। আমরা কিন্তু হাতে কলমে প্রমাণ করেছিলাম যে, মাটি এবং জলও বিদ্যুৎতরঙ্গ বহন করতে পারে। এরই জোরে টেলিগ্রাম তৈরী করেছিলাম আমরা সেকালে। সফলও যে হয়েছিলাম, তা তো পড়েছ। তারের অভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি যেমন আটকায় না, প্রচার করবার মত সত্যি যদি কোনও জোরালো বাণী থাকে তোমার, জেলের দেওয়ালও তা আটকাতে পারবে না। অদ্ভুত উপায়ে অদৃশ্য পথে তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনে গিয়ে পৌঁছবেই।”

একটু হেসে ওয়াট্‌সন চ'লে গেলেন। যাবার সময় হাইটনকে কনুই দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে গেলেন। ভাবটা—তোমার বক্তব্যটা এইবার ব'লে ফেল। হাইটন এগিয়ে এসে একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, যখন অক্ষর সৃষ্টি হয় নি, তখনও মানুষ জ্ঞানের চর্চা করত। তাদের জ্ঞানের ধারা কি অবলুপ্ত হয়েছে? তোমাদের বেদ উপনিষদ বেঁচে রইল কি ক'বে?

সাল্‌ভা বললেন, অন্তরা তোমার মনের কথা টের পেয়েছিল কি ক'রে? মুখ ফুটে তাকে বল নি তো কোনদিন কিছু!

পেয়েছিল নাকি?—মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অংশুমানের।

সমস্বরে হেসে উঠলেন সবাই। তার পর চ'লে গেলেন সবাই একযোগে।

অন্ধকার···

বিনা-তারে বার্তা-বহনের আকাঙ্ক্ষা বৈজ্ঞানিকের মনে জেগেছিল তারের অযোগ্যতা দেখে। মানুষ দ্রুত সুনিশ্চিতভাবে বার্তা পাঠাতে চায়, অব্যাহত হবে তার গতি···তারের সে ক্ষমতা ছিল না।

মনে ছবির পর ছবি ফুটতে লাগল।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। রাত্রিকাল। মর্স নদীর ভিতর এক মাইল লম্বা মোটা একটা ইন্‌স্যুলেটেড তার ফেলেছেন এই প্রমাণ করবার

জন্যে যে, জলের ভিতরও তার যোগে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করা সম্ভব। রাত্রে তারটা জলে ফেলে এলেন, সকালে দেখাবেন সকলকে। পরদিন বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে নদীর ধারে মর্সের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দেখবার জন্যে। জলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ আসবে! রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। বিদ্যুৎতরঙ্গ একবার একটু এল, তার পর আর এল না। অনেক চেষ্টা করলেন মর্স, কিন্তু আর সাড়া পাওয়া গেল না। হো-হো ক'রে হেসে উঠল সবাই। যত সব আজগুবি কাণ্ড! এই পাগলাটার পাল্লায় প'ড়ে সমস্ত সকালটাই মাটি। ঠাট্টায় বিদ্রূপে হাসিতে কলরবে পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। মুখ কালো ক'রে ব'সে রইলেন মর্স যন্ত্রটার দিকে চেয়ে। কি হ'ল? এল না কেন? হৈ-হৈ করতে করতে জনতা ছত্রভঙ্গ হ'ল। মর্স বেরুলেন কারণ অনুসন্ধান করতে। কারণ পাওয়া গেল কিছুদূর গিয়েই। একটা নৌকো নঙ্গর তোলবার সময় তারটাকে টেনে তুলেছিল, তারপর সেটার আদি-অন্ত না পেয়ে তা থেকে প্রায় দুশো ফিট কেটে নিয়ে স'রে পড়েছিল। মর্স ভাবলেন, এত বড় লম্বা তার জলের তলায় রাখলে এ রকম নানা দুর্ঘটনা অহরহই ঘটবে। তার সুতরাং চলবে না। জলকেই করতে হবে বৈদ্যুতিক বাণীর বাহক। মর্সের জীবন-কাহিনী মনে পড়ল অংশুমানের। কিছুতেই নিরস্ত হন নি। প্রথম জীবনে হতে চেয়েছিলেন চিত্রকর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-সাদে-ল্যাম্বের বন্ধু বিখ্যাত মার্কিন চিত্রশিল্পী অ্যাল্‌স্টনের শিষ্য ছিলেন তিনি। 'ডেথ অব হার্‌কিউলিস' ছবিখানা এঁকে নামও হয়েছিল। কিন্তু পেট ভরল না তাতে। 'দি জাজ্‌মেণ্ট অব জুপিটার' ছবিখানার ক্রেতাই জোটে নি এক বছর। সক্রিয় মন অলস হয়ে ব'সে থাকে নি। বিজ্ঞানচর্চায় মেতে উঠলেন। নূতন ধরনের পাম্প ক'রে ফেললেন একটা, মিনিটে ৩৬০ গ্যালন জল তুলতে পারে। পেটেণ্ট করলেন সেটা। পেট ভরল। তার পর আকৃষ্ট হলেন ইলেকট্রিসিটির দিকে। অবাক হয়ে গেলেন এর বিচিত্র সম্ভাবনায়। একবার এক জাহাজে আসতে আসতে একজন আরোহীর মুখে শুনলেন যে, যত দূরই হোক না কেন, বিদ্যুৎতরঙ্গ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিমেষেই নীত হয়, তখনই তাঁর মনে হ'ল, তা হ'লে এই তরঙ্গযোগে নিমেষের মধ্যে খবরই বা পাঠানো যাবে না কেন? সাঙ্কেতিক শব্দ সৃষ্টি করলেই যাবে। জাহাজেই তাঁর মাথায় এল ডট্‌ আর ড্যাশের কথা। ...মর্সের টেলিগ্রাফিক কোড আজ বিশ্ববিখ্যাত। যিনি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর হতে পারতেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁকে হতে হ'ল বিশ্ববিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক। মানুষ যা হতে চায়, তা হতে পারে না। অংশুমান আশ্বস্ত হ'ল যেন একটু। মনের মধ্যে একটা সংশয় কাঁটার মত খচখচ করছিল। বারম্বার মনে হচ্ছিল, সামান্য কেরানীর ছেলে আমি, আমার কি উচিত ছিল না লেখাপড়া শেষ ক'রে সংসারের ভার নেওয়া? বাবার বুকের-রক্ত-জল-করা পয়সার লেখাপড়া শিখেছি, কি প্রতিদান দিলাম তাঁকে? পুলিসের হাতে মার খাচ্ছেন আমার জন্যে?…পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ?…হঠাৎ মর্সের মুখখানা ফুটে উঠল চোখের সামনে। মুখময় বলি-রেখা, অধরে বিষণ্ণ হাসি।

হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ। গাছের ফল যখন স্বপ্ন দেখে যে আকাশে উড়ে যাব, তখন মাধ্যাকর্ষণের কথাটা সে ভুলে যায়। এ ছাড়া তোমার অন্য গতি ছিল না।

মিলিয়ে গেল মুখখানা।

অংশুমানের মনে প্রশ্ন জাগছিল একটা। মাধ্যাকর্ষণের টানে যে ফল মাটিতে নেবে আসে, তার ভবিষ্যৎ সার্থক হয় ওই মাটিতেই অঙ্কুরিত বীজের নব নব উন্মেষে। আমার এই অসমসাহসিকতার কি ভবিষ্যৎ আছে কোনও? এই স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রসাধন ··। আবার ছবি ফুটে উঠল একটা। পিঠে কাপড়ের বোঝা, হাতে বই—চলে'ছ বালক লিগুসে। গরিব চাষার ছেলে, তাঁতীর কাজ শিখছে। তাঁত বোনা শেখে, কাপড়ের বোঝা পিঠে ক'রে দোকানে দিয়ে আসে। স্কুলে যাবার সঙ্গতি নেই। অধ্যয়নস্পৃহা কিন্তু প্রবল। পিঠে কাপড়ের বোঝা নিয়ে পথ চলতে চলতে বই পড়ছে…গ্রাম্য মেঠো পথ বেয়ে তন্ময় হয়ে চলেছে লিগুসে। কিছুতেই দমবে না। ছুটিতে কাজ ক'রে ট্যুশনি ক'রে কত কষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলে বাইশ বছর বয়সে। শেষ করলে আর্ট কোর্স, তার পর থিয়োলজি পড়লে, তার পর বিজ্ঞান। কখনও থামে নি, দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি…

লিগুসে সশরীরে এসে সামনে দাঁড়ালেন। চোখ-মুখ দেখে মনে হয় না যে, অতবড় বিদ্বান। সর্বদাই যেন ভীত সঙ্কুচিত হয়ে আছেন, যেন কিছু জানেন না। কথা বলতেও ইতস্তত করছেন, পাছে বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলেন—এই ভয়। অংশুমানের দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলেন, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ল কয়েকবার, তার পর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, তোমার মত আমিও একদিন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। দ্বিধা নয়, ত্রিধাই বলতে পার। ইলেকট্রিসিটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম যে, এর তিনটে সম্ভাবনা আছে। প্রথম, এর শক্তি দিয়ে নানারকম কাজ করানো সম্ভব—এ

চাকা ঘোরাতে পারে, ভারী জিনিস তুলতে পারে। দ্বিতীয়, সংবাদ বহন করতে পারে। তৃতীয়, আলো দিতে পারে। আমি কোন্‌টা নিয়ে গবেষণা শুরু করব, তা ঠিক করতে পারি নি প্রথমে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক করলাম —আলো। যে আলো হাওয়ায় নিববে না, ঝড়ে কাঁপবে না, তারই সন্ধান করতে হবে সকলের আগে। কেন আমার এ ইচ্ছে হয়েছিল জানি না। আলোক-প্রবণতা বোধ হয় মানব-মনের আদিমতম এবং আধুনিকতম বৈশিষ্ট্য···

চুপ করলেন কয়েক মুহূর্ত, চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটু।

ডাণ্ডি জেলের কয়েদীদের পড়াতাম। অনেক কাল পড়িয়েছি। সেখানেও দেখেছি, মানুষের মন আলোর সন্ধান করছে কেবল। আমার একটি ছাত্র বেশ কৃতী হয়েছিল। তারও ঝোঁক হ'ল আলোর দিকে। জ্যোতিষ্ক-বিদ্যায়। অন্ধকার জেলে বছরের পর বছর কাটিয়েছে যে, সে তন্ময় হয়ে গেল আকাশের সূর্যতারার স্বপ্নে। তুমিও বোধ হয় আলোর স্বপ্ন দেখছ। এই ব'লে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন লিণ্ড্‌সে।

আলো!

লক্ষ কোটি সূর্য-তারকা-বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরিত এক মহাকাশ ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠল অংশুমানের মানসদৃষ্টির সম্মুখে।

"আলোর অর্থ অন্ধকারও হতে পারে। অত্যুগ্র-আলোক-বিভ্রান্ত যে মন অন্ধকার-কামনায় আলো নিবিয়ে দিতে চাইছে, সেও এক হিসাবে আলোরই উপাসক। আলো মানে বিদ্রোহ···। প্রকাণ্ড পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি যখন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে পৃথিবীর বিদ্যুতের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করছিলাম, তখন আসলে আমি দূরত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলাম। মানুষ বিদ্রোহী জীব...সে ওলটাতে চায় এবং ওলটাতে পারে।"

লুমিস এসে এই কথাগুলি ব'লে দাঁড়িয়ে রইলেন উদ্ধত ভঙ্গীতে একটা প্রত্যুত্তরের আশায়। অংশুমান কিছু বলবার পূর্বেই আবার বললেন, তুমিও পারবে। চিয়ার আপ।—ব'লেই মিলিয়ে গেলেন।

কমরেড মীনা দত্ত

সুচরিতাসু,

ভাই মীনু, এতদিন আমার চিঠি না পেয়ে আশ্চর্য হয়েছ হয়তো। অনেক আগেই আমার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, সময় ক'রে উঠতে পারি নি। ঘণ্টা মিনিট যে সময়ের মাপকাঠি সে সময় আমার প্রচুর ছিল, আমি ডেপুটি-গৃহিণী, ছেলে-পিলে হয় নি, চাকর-বামুন আছে, স্বামী টুরে টুরে বেড়ান, সুতরাং সময় বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তা আমার যথেষ্ট। সময় ছিল না মনের, যে মন তোমার চিঠির জবাব দেবে। আগস্ট-ডিস্টারবেন্সের তুমুল তুফানে সমস্ত মন এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, চুল বাঁধবার অবসর পর্যন্ত ছিল না। অথচ আমি প্রত্যক্ষভাবে ওতে যোগ দিই নি। ডেপুটি-গৃহিণীর ওসবে যোগ দেবার উপায় নেই। আমাদের প্রতিবেশী অংশুমানবাবুর সঙ্গে ভাসা-ভাসা আলাপ করেছি খালি সংযত ভাষায়, কিন্তু পরোক্ষলোকে আমার মন অলস হয়ে ব'সে থাকে নি। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করছিল, ওই অংশুমানবাবুরই কার্যকলাপ। মুগ্ধ হয়ে গেছি তার বীরত্ব দেখে, মনে মনে প্রণাম করেছি তাকে শতবার। এখন সে জেলে। সুতরাং তোমার চিঠির জবাব দেবার অবসর হয়েছে। অবসর পেলেও এর আগে এমন ক'রে জবাব দিতে পারতাম না, কারণ জবাবটা নিজের কাছে এখন যতটা স্পষ্ট হয়েছে, আগে ততটা ছিল না। সুতরাং আশা করছি, তোমাকে বোঝাতে পারব।

তোমাদের দলে যতদিন ছিলাম, ততদিন বুঝি নি, এখন কিন্তু ভাল ক'রে বুঝতে পারছি যে, আমার অন্তত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা ছিল দেশ-প্রেম নয়, আত্ম-প্রেম। ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করার যে মুখস্থ বুলি আওড়াতাম, তা পরশ্রীকাতরতার তাড়নায়, প্রোলিটারিয়েটদের প্রতি বেদনা-বোধের তীব্রতায় নয়। 'মাদার রাশিয়া'তে যেসব আত্মত্যাগী যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরীর কথা পড়েছি, আমাদের মধ্যে তাদের মত যারা আছে (আছে নিশ্চয়ই, যদিও আমার চোখে পড়ে নি), তারা কই আমাদের দলে যোগ দেয় নি তো! আমার বিশ্বাস, আজকাল এই যে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ ক'রে মেয়েরা, কমিউনিস্ট হচ্ছে, ওটা ফ্যাশানের খাতিরে, কমিউনিজ্‌মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ততটা নয়। এটা বর্তমান যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা অনিবার্য ফল বলতে পার। আমাদের ঘরে ঘরে ছেলেরা বেকার, মেয়েরা অবিবাহিতা।

অথচ তারা বুলি কপচাতে শিখেছে। প্রকৃত শিক্ষা আমরা পাই না। আমরা ডিগ্রী লাভ ক'রেই কুলীন। আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির তোয়াক্কা রাখি না। উদর-সর্বস্ব স্বার্থপর বণিক-সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাদের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রে যে পাঠ নিয়েছি, তার মূলমন্ত্র স্বার্থপরতা। আমাদের ঘরে ঘরে বেকার ছেলে আর অবিবাহিতা মেয়ের দল এই শিক্ষা পেয়ে অসন্তুষ্টির তুষানলে দগ্ধ হচ্ছিল এতদিন। কারণ এই শিক্ষার ফলে বেচারাদের লোভ উদ্দীপ্ত হয়েছে ষোল আনা, অথচ তা চরিতার্থ করবার কোন উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুণে ছেলেরা উপার্জন করতে পারে না, সমাজ-ব্যবস্থার গুণে মেয়েদের বর জোটে না। দুস্তর বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তবু যেসব ছেলে উপার্জন করতে পেরেছে বা যেসব মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাদের সৌভাগ্যে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হওয়া ছাড়া অধিকাংশ বঞ্চিতদের অন্য কোন উপায় ছিল না এতদিন। বিদ্রোহী রাশিয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে এখন তারা সেই পরশ্রীকাতরতার গায়ে লেনিন-স্টালিনের বড় বড় নাম জুড়ে দিয়েছে। জোর-গলায় ব'লে বেড়াচ্ছে, যাদের তোমরা এতদিন বড়লোক ব'লে এসেছ, আমরা ধ'রে ফেলেছি, আসলে তারা ছোটলোক, তারা পুঁজিবাদী, এই দেখ কার্ল মার্ক্‌স্…

যে পরশ্রীকাতরতাটা প্রকাশ করতে আগে লোকে লজ্জিত হ'ত, একটা বড় নামের মুখোশ প'রে তাই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করাটা গৌরবজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। কিন্তু ভেবে দেখ, ধনীমাত্রেই পাজি, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জুয়াচোর—এই নীতি প্রচার করা অন্য যে-কোন দেশের পক্ষে শোভন হোক, ভারতবর্ষের পক্ষে নয়। যে হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের গৌরব, পরমতসহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতবর্ষের ধনীমাত্রেই পাজি—এই মত প্রচার করতে যাওয়া কি লজ্জাকর! একটু যদি ভাল ক'রে ভেবে দেখ, হিন্দুধর্মই প্রকৃত স্বাধীনতার ধর্ম। প্রকৃত সাম্যবোধ আত্মানুসন্ধী হিন্দুধর্মেই আছে, অন্য কোন ধর্মে নেই, কারণ সাম্যবোধ জিনিসটা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক পশু-জগতে ওর স্থান নেই। হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে শ্রদ্ধা করেছে, বেয়নেট উঁচিয়ে বলে নি—তুমি এই ইজ্‌মে বিশ্বাস করবে কি না, যদি না কর, তা হ'লে তোমার বাঁচবার অধিকার নেই। এই সাম্যবোধই হিন্দু-ভারতবর্ষকে আধিভৌতিক জগতে দুর্বল করেছে হয়তো, সে নির্বিচারে

ভিন্নধর্মাবলম্বীকে হত্যা করতে পারে নি ব'লেই এ দেশে এত ধর্ম-বৈচিত্র্য, এত মতানৈক্য। ভারতবর্ষের তথাকথিত রাজনৈতিক একতা নেই, কারণ ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছে, এবং তা করতে গিয়ে আধিভৌতিক জগতে জাতি হিসাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ আধিভৌতিক জগৎটা পশুর জগৎ। মানুষ যেখানে পশু, সেখানেই সে আধিভৌতিক জগতে বিচরণ করে, দেহের ক্ষুধা পাশবিক বাসনা মেটাবার জন্যে মারামারি কাটাকাটি করে, সাম্য-অসাম্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, প্রয়োজনের তাগিদে শক্তির শরণাপন্ন হয়, কেড়ে খায়, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে। তুমি হয়তো বলবে, আধিভৌতিক জগৎটাও তো আছে, ওটাকে তো অস্বীকার করলে চলবে না, বহু লোক দারিদ্র্যের চাপে ম'রে যাবে, আর জনকতক ঐশ্বর্য ভোগ করবে—এ রকম সমাজব্যবস্থাই কি ভাল? কে বলছে, ভাল? আধিভৌতিক জগৎটা যে আছে, তা তো প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি, অস্বীকার করব কি ক'রে? আমার আপত্তি ভণ্ডামিতে। ক্ষুধার আহার, কামনার ইন্ধন সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি যখন, তখন আবার সাম্যের মুখোশ কেন? বিদ্যুতালোকিত সুসজ্জিত ঘরে ফ্যানের তলায় ব'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিষাণদের দুঃখ, শ্রমিকদের কষ্ট নিয়ে অমুক দাদার সঙ্গে উত্তেজিত আলোচনার ছবিটা যে আধুনিক পরিবেশে দুষ্মন্ত-শকুন্তলারই সাবেক ছবি, তা অস্বীকার ক'রে যে ভণ্ডামিটাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি, তাতেই আমার আপত্তি। মাছের লোভে ছিপ ঘাড়ে ক'রে টোপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছি, ওর মধ্যে আবার সাম্যের আস্ফালন কেন? দীনের দুঃখে সত্যিই যারা বিচলিত হয়, তারা অত স্বার্থপর হয় না, হতে পারে না। নিঃস্বার্থপর ত্যাগী কমিউনিস্ট যে নেই তা আমি বলছি না, অনেক আছে হয়তো, কিন্তু আমাদের দলটির যে ছবি দেখেছি তা শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদীর ছবি নয়। কমিউনিজ্‌ম্ জিনিসটা যে খারাপ, তাও আমার বক্তব্য নয়। সাময়িক প্রয়োজনে যুগে যুগে ওর উদ্ভব হয়েছে নানা রূপে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশ অনুসারে ওর চেহারাও হয়েছে নানা রকম। বঙ্গদেশে গোপালদেবের আমলে কিংবা আরও পূর্বে যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল তার পরবর্তী যুগেও যে দীর্ঘকালব্যাপী কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়েছিল, তা মূলত বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান বিদ্রোহেরই পূর্বসংস্করণ। যা একটু তফাত তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্যে। কমিউনিজ্‌ম্ যে অতি আধুনিক অভূতপূর্ব একটা

কিছু, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। মানবের ইতিহাসে এ জিনিস বার বার ঘটেছে ও ঘটবে। সুতরাং কেউ তোমাদের পার্টি পরিত্যাগ করলে বা তোমাদের কথায় সায় না দিলেই তোমরা যে তাকে প্রগতি-বিরোধী, সেকেলে, রিঅ্যাক্‌শনারি প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত কর, সেটা যুক্তি-সহ আচরণ নয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও তোমরা ভুলে যাও, সেকেলে হ'তেই বা দোষ কি, যখন মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে একাল সেকালের চেয়ে এক পাও এগোয় নি।

আমাদের দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সীমা নেই। সে দুর্দশা ঘোচাবার জন্যে যাঁরা জীবন পন করেছেন, তাঁরা পূজনীয়; কিন্তু তোমাদের চেষ্টা, কি ক'রে তাঁদের খেলো করবে, কোন্ আধুনিক মুখস্থ-করা ফর্‌মুল্লায় ফেলে তাঁদের কর্মপদ্ধতির দোষ বার করবে। স্বাধীনতা-অপহারক বিদেশী রাজাই আমাদের দুর্দশার আসল কারণ। সেই বিদেশী রাজা স্বদেশে বিদেশে আমাদের নামে রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে মিথ্যা কথা, তোমরাও তাতে সায় দিয়ে চলেছ ক্রমাগত। তোমরাও বলছ যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন হচ্ছে না ব'লেই আমরা স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত নই; তোমরাও বলছ যে, অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিলে অন্যায় করা হবে, পাকিস্তানই এর একমাত্র সমাধান। তোমরাও বুঝতে চাইছ না যে, হিন্দু-মুসলমান কেন, ইচ্ছা করলে রাজশক্তি পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিতে পারে অনুগ্রহ-নিগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে। তোমরা 'ফুড ফ্রণ্ট' ক'রে এদেশের পুঁজিবাদীদের নাস্তানাবুদ করেছ, কিন্তু আসল পুঁজিবাদীর রোমটি পর্যন্ত স্পর্শ কর নি। ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ করবার জন্যে তোমরা একদা উৎকণ্ঠিত ছিলে, সেই বিদ্রোহ যখন সত্যি সত্যি হ'ল, তখন তোমরা শুধু স'রেই দাঁড়ালে না, তার বিরুদ্ধাচরণও করতে লাগলে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট অজুহাতে। কোন স্বাধীনতাকামী লোকই ফ্যাসিজ্‌মের সমর্থন করে না, কিন্তু তোমাদের অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট আচারণগুলো বড় বেশি রকম পরস্পর-বিরোধী। কেউ যদি মনে প্রাণে জীবহত্যাবিরোধী বৈষ্ণব হতে চায়, তা হ'লে কেউ আপত্তি করবে না, অনেকে তাকে ভক্তিও করতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যদি কসাইখানা নির্মাণে সাহায্য করে, তা হ'লে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। তোমাদের গুরু স্টালিন স্বদেশপ্রীতির জন্য মানবপ্রীতি বিসর্জন দিতে ইতস্তত করেন নি—এক কথায় থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন; কিন্তু তোমরা স্বদেশের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাকে বাধা দিলে বিদেশী ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে ধ্বংস করবার অজুহাতে। এ তোমাদের কেমন গুরুভক্তি বুঝি

না। সুতরাং সন্দেহ হয়, গুরুতর ভক্তি করবার মত কোনও দেবতার সন্ধান পেয়েছ হয়তো কাছে পিঠে। ফ্যাসিজ্‌ম্ ধ্বংস করাই যদি তোমাদের নীতি, তা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের সম্পর্কে ইংরেজও কি কম ফ্যাসিস্ট ? তোমরা বলবে, আমরা তো তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করছি। কিন্তু যার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করছ, সে-ই যখন তোমাদের পিঠ চাপড়াচ্ছে, তার নিজেরই বিরুদ্ধ প্রোপাগাণ্ডা ছাপাবার জন্যে প্রচুর কাগজ দিচ্ছে, তখন ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকে। সামান্য বিরোধিতার জন্যে যারা গুলি চালিয়ে হাজার হাজার লোক মেরে ফেলতে ইতস্তত করে না, মেদিনীপুর চট্টগ্রাম উজার ক'রে দেয়, দেশের নেতাদের বিনাবিচারে আটকে রাখে বছরের পর বছর, তারা তোমাদের সম্পর্কে এমন মহৎ হয়ে উঠল কি ক'রে ? হয়তো এ সমস্তরই উপযুক্ত জবাবদিহি তোমাদের কাছে আছে, হয়তো আমি যা বুঝেছি তা সমস্তই ভুল (আহা, তাই হোক,) হয়তো আমি এত কথা লিখতামও না, কিন্তু আমি কেন তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখতে পারি নি, তা জানতে চেয়েছ ব'লেই অকপটে সমস্ত কথা খুলে বলতে হ'ল, তা না হ'লে এসব অপ্রিয় আলোচনা তোলবার ইচ্ছে ছিল না। কারণ আমি জানি, আলোচনা দ্বারা তোমাদের স্বপক্ষে আনতে পারব না। তোমরা তর্কপটু চীৎকারদক্ষ বিদ্বান লোক, তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভবই হবে না হয়তো। এর উত্তরে তুমি যে কড়া জবাব দেবে, তার প্রত্যুত্তর দেবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তিও আমার আর থাকবে না সম্ভবত। তবু এত কথা লিখলাম, কেবল নিজের আচরণের সঙ্গতি রক্ষার জন্য।

একটা কথা আমি বুঝেছি, কারও উদ্দেশ্য যদি মহৎ এবং আচরণ যদি অকপট হয়, তা হ'লে কেবল মতবিরোধের জন্য কেউ তাকে ঘৃণা করে না। ভণ্ডই ঘৃণ্য। বিয়ে করবার পর আত্ম-আবিষ্কার ক'রে আমি চমকে গেছি। সেজে-গুজে আমি তোমাদের পার্টিতে রোজ যেতাম, এতে আমার মা বাবা আত্মীয় স্বজন কেউ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা আপত্তি করলে তাঁদের মুখের উপর কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে আমারও আপত্তি ছিল না, দিয়েছিও কতরার, গুরুজনদের মুখের উপর কড়া জবাব দেওয়াটাই ছিল আমাদের বাহাদুরি : ঔদ্ধত্য যদিও কোন কারণেই মার্জনীয় নয়, তবু তা মানিয়ে যেত যদি আমার উদ্দেশ্য মহৎ এবং আচরণ অকপট হ'ত। শ্রমিকদের উদ্ধারের ছুতোয় যা করতাম, চলিত ভাষায় তার নাম—আড্ডা দেওয়া এবং অত্যন্ত বাজে কাজে সময় নষ্ট করা। তার মধ্যে ত্যাগ ছিল না, ছিল মুখোশ-পরা স্বার্থপরতা।

তার প্রমাণ, শেষ পর্যন্ত ওই আড্ডা থেকেই স্বামীনির্বাচন ক'রে ঘর-সংসার গুছিয়ে বসেছি, শ্রমিকদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে হঠাৎ। আমার কম্‌রেড স্বামীটিও ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেণ্টের অধীনে চাকরি নিতে তাঁর বাধে নি। এখন তাঁর হুকুমে পুলিস গুলি চালাচ্ছে ওই শ্রমিকদেরই উপর, কিষাণদের কাছ থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করছেন তিনি। গুজব —শীঘ্রই রায় সাহেব হবেন নাকি কর্মপটুতার জন্য। তুমিও তাঁর ভক্ত ছিলে একজন, সেদিন তোমার এক তাড়া চিঠি আবিষ্কার করলাম তাঁর ড্রয়ার থেকে। এখনও তুমি তাঁকে ভক্তি করতে পারছ কি না জানি না (শুনেছি, ভক্তির বিশুদ্ধতা নির্ভর করে ভক্তের একনিষ্ঠার উপর, ভক্তিভাজনের গুণাগুণের উপর নয়), আমি কিন্তু আর পারছি না। আত্ম-আবিষ্কার ক'রে নিজেরই উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি। ছি ছি, কি লজ্জা! এতদিন যেটাকে তরবারি ব'লে আস্ফালন করেছিলাম, দেখছি, তাতে খাঁটি ইস্পাতের নাম-গন্ধ নেই, ঝুটো বীরত্বের রাঙতা দিয়ে মোড়া বাঁখারি সেটা। অশ্রদ্ধায় আত্মগ্লানিতে ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে।

...আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। মানুষের মন শ্রদ্ধা করবার জন্য সতত উন্মুখ। দেহের ক্ষুধার মত এটিও একটা ক্ষুধা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে শ্রদ্ধেয়কে খুঁজে বেড়ায়। সমাজ বা শাস্ত্র যাঁদের শ্রদ্ধা করতে বলেছেন, যেমন পিতা মাতা বা স্বামী, তাঁরা সত্যিই যদি শ্রদ্ধাস্পদ হন, তা হ'লে জীবন চরিতার্থ হয়ে যায়; কিন্তু যদি না হন, তা হ'লে মন ভুল করে না। সমাজ বা শাস্ত্রের শাসন মেনে আমরা লেবেল-মারা পুজনীয়দের প্রতি মৌখিক একটা শিষ্টাচার করি বটে, কিন্তু মনে মনে আমরা সন্ধান ক'রে বেড়াই সত্যিকার শ্রদ্ধেয়কে। নিরন্তর এই সন্ধান চলেছে। দেহের ক্ষুধার মত এও অনিবার্য। এর প্রেরণায় মন ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তের, পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জন্ম থেকে জন্মন্তরেও হয়তো।

অংশুমানবাবুকে দেখে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ হবার কারণ আমার নিজের মধ্যেই ছিল। যে নিজে ভণ্ড, সে সত্যিকার ধার্মিককে প্রথমে চিনতে পারে না, ভণ্ড ব'লে মনে করে। তার নিজের দৃষ্টিই বক্র, মন স্বচ্ছ নয়, সে সহজে প্রসন্ন মনে কারও মহত্ত্ব স্বীকার করতে পারে না, নিজের ক্ষুদ্র চরিত্রের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে গিয়ে সকলকেই সে ছোট ক'রে ফেলে।

অহঙ্কারবশে ভাবতেই পারে না যে, কেউ তার চেয়ে বেশি ভাল হতে পারে। সত্য কিন্তু চাপা থাকে না বেশিদিন। অন্ধকারবিলাসী পেচককেও শেষ পর্যন্ত সূর্যের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়। পেচক বিস্মিত হয় কি না জানি না, আমি কিন্তু হয়েছিলাম, ওইখানেই বোধ হয় আমি পেচকের চেয়ে বড়। পরে ভেবে দেখলাম, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এরাই তো চিরন্তন অগ্রণী, সর্বকালে সর্বদেশে এরাই তো আদর্শের পতাকা বহন করেছে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সমস্ত সত্তা দিয়ে, আষাঢ়ের নবোদিত জলধরের মত আত্মবিসর্জন দিয়ে ধন্য করেছে পিপাসিত পৃথিবীকে। এরা বিশেষ কোন দেশেরও নয়। এরা কংগ্রেসে আছে, কমিউনিস্ট পার্টিতে আছে, হিন্দু-মহাসভায় আছে। প্রাণের আবেগটাই এদের কাছে মুখ্য, দলটা নয়। প্রাণের আবেগে যে কোনও একটা দলে নাম লিখিয়ে এরা প্রাণপণ করে আদর্শ পালন করবার জন্য। আদর্শই এদের লক্ষ্য, দলটা উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক সময় কোনও দলে নাম লেখাবার প্রয়োজনও হয না এদের। এ সবই জানতাম। তবু যখন আগস্ট-আন্দোলনের ঢেউ আলোড়িত ক'রে তুলল চতুর্দিক, বিক্ষুব্ধ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আক্ষেপে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল, দোষী-নির্দোষ বিচার না ক'রে বেপরোয়া মিলিটারি গুলি যখন রক্তস্রোত বইয়ে দিলে দেশের বুকে, ইতরভদ্র সবাই যখন সন্ত্রস্ত—কখন কি হয়, আমাদেরই এই শহরে ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে পুলিস ঢুকে থামে-বাঁধা স্বামীর সামনে ধর্ষণ ক'রে গেল যখন তার স্ত্রীকে, বৃদ্ধ বাপকে মারতে মারতে অজ্ঞান ক'রে দিলে, লোকের ঘর-বাড়ি নীলাম ক'রে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে লাগল, তখন আমরা ঘরে খিল দিয়ে আরামকেদারায় ব'সে ব'সে 'রেন্‌বো' উপন্যাসে নাৎসি জার্মানির অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করতে করতে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম, আর কিছু করি নি। যদিও আমাদের দলের অনেকে বড়াই ক'রে বেড়াচ্ছেন—'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্' করি নি, আমি কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি—করবার সাহস হয় নি। এসব নিয়ে বৈঠকখানায় ব'সে আলাপ করবার সাহস পর্যন্ত হয় নি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে। অন্তরঙ্গদের কাছে নিম্নকণ্ঠে আলাপ করবার আগেও বাইরে গিয়ে দেখে এসেছি, আশে পাশে কেউ আছে কি না! কলেজ-জীবনে যাঁর শ্রমিকদুঃখকাতরতার অন্ত ছিল না, প্রাক্তন কম্‌রেড আমার সেই স্বামী যখন সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত এবং আমি যখন ব্যস্ত সেই স্বামীর পরিচর্যায়, তখন বিস্মিত হলাম অংশুমানবাবুর কাণ্ড দেখে। অতিশয় অপ্রত্যাশিত

ব'লে মনে হ'ল ঘটনাটা। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে সভা ক'রে ওই মুখ-চোরা ছেলেটি ঘোষণা করলে—এর প্রতিশোধ আমরা নেব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, এই হীন অপমান কিছুতেই সহ্য করব না, প্রাণ দিয়েও প্রমাণ করব যে, প্রাণের চেয়েও মান আমাদের কাছে বড়।

…আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দেখলাম—ওর চোখে মুখে অপূর্ব দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠেছে। কেন জানি না, হঠাৎ রাণা প্রতাপসিংহের কথা মনে পড়ে গেল। অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল নিজেকে।…

ও-ই একমাত্র লোক যার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাজনীতি নিয়ে চর্চা হ'ত, দেশের দুঃখ কষ্ট নিয়ে আলোচনা করতাম। আমাদের এ ধরণের আলোচনা যে কি রকম হয়, তা তোমাদের অজানা নেই নিশ্চয়। নিজেকে জাহির করবার আবেগে আত্মপ্রশংসার ফুলঝুরি কাটতে কাটতে এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে, ওর নীরবতাটা প্রথম প্রথম চোখেই পড়ত না। ও নীরবে ব'সে শুনত খালি। এমন একটা বিদ্বান ছেলে নীরবে আমার কথা শুনে যাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে—যদিও এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটে নি, কারণ ইতিপূর্বে যাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাদের মধ্যে শ্রোতা ছিল না, বক্তা ছিল সবাই—তবু ওর নীরবতা বিস্মিত করে নি আমাকে। মনে হ'ত, ওটা আমার প্রাপ্য। সূক্ষ্ম একটা গর্বও অনুভব করতাম। ওর সশ্রদ্ধ নীরবতার অর্থও আমি করেছিলাম—আহা, বেচারা বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষাই পাস করেছে খালি, দেশের কোনও খবর রাখে না, দেশের সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই করে নি বোধ হয়। দরিদ্র মজুর অসহায় কৃষকদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার —এ কথা হৃদয়ঙ্গম করবার মত শিক্ষা হয় নি বেচারার, তাই আমার কথা শুনে তাক লেগে গেছে। ডেপুটি-গৃহিণী আমি, মনোহর শাড়ি ব্লাউজে সজ্জিত হয়ে সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঝনৎকার তুলে গদি-আঁটা সোফায় ব'সে বিলিতি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দেশের দরিদ্র মজুর ও কৃষকদের মর্মস্পর্শী আলোচনা করতাম। ও চুপ ক'রে শুনত।

…তার পর এল আগস্ট-আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পটভূমিকায় অংশুমানবাবুর স্বরূপ দেখে লজ্জায় ম'রে গেলাম। নিমেষে বুঝতে পারলাম, আমি চালিয়াৎ, ও কর্মী; আমি ভীরু, ও বীর; যে পুলিসের সম্বন্ধে কথা কইতে আমার গলার স্বর স্বতই খাটো হয়ে পড়ে, ও এগিয়ে যেতে পারে সেই পুলিসের অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্যে। ওতে আর আমাতে কত তফাত!

মনে হ'ল, এ কথা ওরও নিশ্চয় অবিদিত নেই। না জানি মনে মনে কত হেসেছে আমার লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনে। ওর সামনে দাঁড়াব কি ক'রে—এই সমস্যায় যখন আমি আকুল, ও-ই তখন এসে তার সমাধান ক'রে দিয়ে গেল।

…অন্ধকার রাত্রি। স্বামী টুরে বেরিয়ে গেছেন। কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। বন্দুক ঘাড়ে ক'রে মিলিটারি পুলিস ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। নিঃশব্দচরণে অংশুমান এসে দাঁড়াল। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল, সেই ক্ষণনিবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে কি যে দেখলাম আমি, আমার সমস্ত চিত্ত বিকশিত হয়ে উঠল, মনে হ'ল, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি, চরিতার্থ হয়েছি। তার পর স-সঙ্কোচে সে বললে, তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছি…। আমার এক দূরসম্পর্কে দাদা ওর সহপাঠী ছিল, তাই ও আমাকে 'তুমি' বলত। সেই সূত্রেই আলাপও হয়েছিল।

আমার কাছে কি দরকার ?

সত্যিই অবাক লাগছিল, ভয়ও হচ্ছিল একটু একটু।

যে কাজে নেবেছি, তাতে টাকার দরকার। কিছু দিতে পারবে তুমি ? আমাদের অবস্থা তো জানই, কিছু টাকা পেলে সুবিধা হ'ত। পারবে দিতে ?

সংসার-খরচের কয়েক টাকা মাত্র হাতে ছিল। টাকা কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়। সে কটা হাতছাড়া করবারও উপায় ছিল না, কারণ স্বামী টুরে, ব্যাঙ্ক বন্ধ। সংসার অচল হয়ে পড়বে। তবু কিন্তু এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে হ'ল না। মনে হ'ল, হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের এই একমাত্র উপায়। উঠে গিয়ে দেরাজটা খুললাম। যে জড়োয়া গয়নাগুলো আমার প্রিয়তম সম্পত্তি ছিল, তার বাক্সটা বার ক'রে এনে দিলাম তার হাতে।

টাকা নেই। এইগুলো নিলে যদি হয়, নিয়ে যাও।

সে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইলে আমার মুখের দিকে। তার পর বেরিয়ে চ'লে গেল। আর ফেরে নি।

এই ঘটনাটুকুর যে বৈজ্ঞানিক নির্যাস তুমি বার করবে তা আমি জানি। তবু তোমাকে সব কথা খুলে লিখলাম কেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি, তা হয়তো আমার পক্ষে অপমানজনক (মান-অপমানের প্রচলিত মানদণ্ড অনুসারে); তা হোক, তবু কোদালকে কোদাল বলতে আমি বাধ্য। নিজের এতবড় একটা কৃতিত্বের কথা তোমাকে না জানিয়ে পারছি না তাই কিছুতেই। মনে হচ্ছে, এই বোধ হয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ

কীর্তি। মনে হচ্ছে, এতদিনে নিজেকে ভারতবর্ষীয় নারী ব'লে পরিচয় দেবার সামান্য যোগ্যতা বোধ হয় অর্জন করলাম। তোমরা ইচ্ছে কর তো কম্‌রেড অন্তরার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে পার।

...কিন্তু ভুল বুঝো না আমাকে। মনে ক'রো না যে, আমি কমিউনিজ্‌মের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন। যে সাম্যের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমাদের দলে তার অভাব দেখে সে দলের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি, কিন্তু সাম্যের আদর্শ আমার ঠিক আছে। ওইটেই তো মানুষের চিরন্তন আদর্শ। তা ছাড়া কোন ইজ্‌মের উপরই আমার রাগ নেই, কারণ এটা বুঝেছি যে, সব নদীই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিশবে যদি তার গতি অব্যাহত থাকে। ইজ্‌মটা বাইরের জিনিস, আসল জিনিস মনুষ্যত্ব। আমরা অনেকেই বাইরের খোসাটার নকল ক'রে মরছি, অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের সাধনা করবার ধৈর্য আমাদের নেই—এইটেই আমার দুঃখ। চিরকালই আমরা এই ক'রে এসেছি। আর্য ঋষিদের যজ্ঞক্রিয়া পাঁঠা-খাওয়া উৎসবে পরিণত হয়েছে, বুদ্ধসঙ্ঘ পরিপূর্ণ করেছে অনাচারী শ্রমণ-শ্রমণীর দল, চৈতন্যের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ব্যভিচার হয়ে দাঁড়াল, মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনকে মূলধন ক'রে কতকগুলো খদ্দরধারী গুণ্ডা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ক'রে বেড়াচ্ছে। কমিউনিজ্‌মের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কাস্তে-হাতুড়ির লেবেল মেরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যা ক'রে বেড়াচ্ছে, তা মনুষ্যত্ব-চর্চা নয়, আত্মবিনোদন। জীবনের বাঁধা-ধরা পথে চলবার সুযোগ কিংবা সামর্থ্য এদের অনেকের নেই, অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে অকৃতী। বিয়ে করে নি, নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। বাবা, দাদা বা ওই জাতীয় কারও ঘাড়ে চ'ড়ে পরশ্রীকাতরতার বিষোদ্‌গিরণ ক'রে বেড়াচ্ছে কেবল এবং নিজেদের অক্ষমতার দৈন্যটাকে ঢাকতে চেষ্টা করছে কমিউনিজ্‌মের ঢক্কানিনাদে। বোঝে না যে, অশক্ত অসংযত ভণ্ড বা স্বার্থপর লোক গায়ে একটা লেবেল আঁটলেই লেনিন স্টালিন হয়ে ওঠে না। তার জন্যে সাধনা চাই, চরিত্রবল চাই। যে কোন একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া ফড়ফড় ক'রে কমিউনিজ্‌মের বুলি আওড়ায় যখন, তখন লজ্জা হয় আমার। কবে আমরা বুঝতে শিখব যে, শুধু বুলি আওড়ালেই সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধির জন্য সাধনা চাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেকেই এ দেশে দাড়ি রেখে উপনিষদের বুলি আওড়ালে, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে?...

এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা পেয়েছি একটি কথা ভেবে যে, অধিকাংশই মেকি

হতে পারে, কিন্তু খাঁটি লোকও আছে। এরা আছে ব'লেই আশা আছে। ইতিহাসে এদের কাহিনী পড়েছি, আমাদের দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবে দেখেছি এদের দ্যুতিমান আবির্ভাব। এরা সংখ্যায় কম। তাতে ক্ষতি নেই,, একটি সূর্যই অন্ধকার ধ্বংস করে। আর আমার বেশি কিছু বক্তব্য নেই। আশা করি, যা বললাম তার মধ্যেই তোমার চিঠির উত্তর পেয়েছ। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমারই

অন্তরা

১১

ইলেক্ট্রিসিটির বইখানা নিয়ে গেছে। মনের সঙ্গে যে নির্জনে বোঝাপড়া করবে তারও উপায় নেই। দু ঘণ্টা অন্তর পুলিসের লোক আসছে। প্রতিবারই নূতন লোক। জেরা চলছে ক্রমাগত। সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রশ্ন। গাল দিচ্ছে। তাকে, তার বাবাকে, বংশকে, দেশকে, দেশের নেতাদের। অকথ্য, অশ্রাব্য গালাগালি।...ঘুমে চোখ বুজে আসছে, দেহ অবসন্ন, কিন্তু ওরা থামবে না। দু ঘণ্টা অন্তর নূতন লোক আসছে। জেরার পর জেরা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, গালাগালির ঝড় বইছে। ঘুমুতে দেবে না। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে খালি। নির্বাকও থাকতে দিচ্ছে না...সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রশ্ন...যা-হোক কিছু একটা উত্তর দিতেই হচ্ছে...একই উত্তর সহস্র বার দিয়েছে, আবার দিতে হচ্ছে। চুপ ক'রে থাকলে গাল দিচ্ছে। জানি না, জানি না, জানি না, জানি না—কত-বার বলা যায় এক কথা! কিন্তু ওরা থামবে না। একই কথা শুনবে বার বার। বলছে—ব'লে যাচ্ছে ক্রমাগত। বসতে দেবে না, দাঁড় করিয়ে রেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শরীরের রক্ত ফুটছে টগবগ ক'রে, জিব শুকিয়ে আসছে, জোর ক'রে চাইতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাইরে শান্তভাব বজায় রেখে তবু ব'লে যেতে হচ্ছে—জানি না, জানি না, জানি না।

শেষ সি. আই. ডি. ইন্‌স্পেক্টার বিদায় নিয়ে যাবার আগে ব'লে গেলেন, তিনটে বাজল, এবার উঠি, আবার আসব কাল। ভাল ক'রে ভেবে দেখুন ইতিমধ্যে।

অন্ধকার ঘরে একা ব'সে রইল অংশুমান।

নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকার।

পথ। যে পথ মানুষ সৃষ্টি করে গতিকে মুক্তি দেবার জন্যে, সেই পথই আবার মানুষ বন্ধ করে মানুষেরই গতি-রোধ আকাঙ্ক্ষায়। মানুষই মানুষের সর্বপ্রধান শত্রু···

ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক···সন্তর্পণে, কিন্তু অনবরত পড়ছে আঘাতের পর আঘাত। দশজন অন্ধকারে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে কুড়ুল চালিয়ে যাচ্ছে। গাছ ফেলে রাস্তা বন্ধ করতে হবে। মিলিটারির মোটর না আসতে পারে যেন। ঘর্মাক্তকলেবরে কুড়ুল চালাচ্ছে সবাই, ধরা পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও। হাত কাঁপছে না কারও। দৃঢ়-নিবদ্ধ ওষ্ঠ, চোখে আগুন জ্বলছে সকলের। সকলেই যুবক নয়। বৃদ্ধ আছে, বালকও আছে।

নিন বাবু মশায়, আমার নৌকোটাও।

সারি সারি নৌকো জমা হচ্ছে ঘাটে-আঘাটায়। প্রত্যেকটার তলা ফেঁড়ে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মালিকরা নিজেরাই দিচ্ছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দিতে হচ্ছে সকলকেই। দেশব্যাপী এই অপমানের প্রতিবাদ করতেই হবে। নদী পেরিয়ে পুলিস যেন না আসতে পারে। জনতার বিপুল দাবি, দিতে হবেই নৌকো সকলকে। দেখতে দেখতে সব কটা নৌকো ডুবে গেল। ওপারের দিকে চাইলে অংশুমান। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। আকাশে মনে হ'ল মেঘ করেছে একটু। মেঘের কোলে নক্ষত্র জ্বলছে। এক ঝলক হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে আচমকা। তালগাছের পাতাগুলো হড়মড় ক'রে উঠল। শিহরণ জাগল নদীর জলে। অংশুমান সওয়ার হ'ল বাইকে, অনেক জায়গায় যেতে হবে এখনও।

মার গাঁইতি, হ্যাঁ, দাও আর এক ঘা—

আরে, কোদাল চালাও না ওই দিকটাতে। ভয় কি, ভাবছ কি তুমি?

মায়া হচ্ছে।—হেসে বললে একজন, নিজের হাতে গেঁথেছিলাম একদিন···

হ্যাঁ, চার আনা মজুরির বদলে, সাহেবদের মোটর যাবে ব'লে।

পড়তে লাগল কোপের পর কোপ।

হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল পুলটা।

ছুটল সবাই অন্ধকার মাঠ ভেঙে।

অদৃশ্য হয়ে গেল নিমিষে···

রাস্তায় বড় বড় গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। টেলিগ্রাফের তার একটাও নেই। খুঁটিগুলো পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছে সবাই মিলে। টেলিফোনের তারও কাটা হয়ে গেছে···। অংশুমানের দেখা হয়ে গেল হঠাৎ দারোগারই সঙ্গে।

কে?

প্রদীপ্ত টর্চের আলোটা পড়ল মুখের উপর। পালাবার উপায় রইল না। বাইক থেকে নাবতে হ'ল।

আমি অংশু।

আপনি! এতরাত্রে এ দিকে কোথা গিয়েছিলেন?

মনে হ'ল, কতকগুলো লোক টেলিগ্রাফের তার কাটছে, তাই বেরিয়েছিলাম যদি তাদের ধরতে পারি···

পাগল ক'রে দেবে দেখছি ব্যাটারা। গেল কোন্ দিকে? আমিও তাদের সন্ধানে বেরিয়েছি।

ওই যে ওই দিকে, বাগানের অন্ধকারে স'রে পড়ল সব।

যেদিকে লোকগুলো সত্যিই পালিয়েছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দিলে অংশুমান। বিভ্রান্ত দারোগা ছুটল সেই দিকে···

···পোলাণ্ড!

একটি ছোট বোর্ডিং-স্কুল। পঁচিশটি মেয়ে সারি সারি ব'সে আছে। কুৎসিত-দর্শনা একটি শিক্ষয়িত্রী পড়া নিচ্ছেন। দশ বছরের একটি মেয়ে মেরী স্ক্লাডোওয়াস্কা পড়া ব'লে যাচ্ছে। পোলিশ ভাষায় পোলাণ্ডের একটি রাজার কাহিনী। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই। টুঁ শব্দটি নেই। বে-আইনী কাজ হচ্ছে। জার-শাসিত পোলাণ্ডে পোলিশ ভাষায় কিছু পড়াবার হুকুম নেই। তবু কিন্তু পড়ানো হচ্ছে লুকিয়ে। স্কুলের দারোয়ান থেকে আরম্ভ ক'রে হেডমিস্ট্রেস পর্যন্ত সকলেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্যায় আইন মানবে না তারা।···হঠাৎ ইলেকট্রিক ঘণ্টাটা বেজে উঠল, জোরে নয় আস্তে। সঙ্কেত! চমকে উঠল সবাই। নিশ্চয় আসছে কেউ। নিমেষের মধ্যে চারটি মেয়ে ইতিহাসের বইগুলো কুড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ত্বরিতপদে। সেগুলো লুকিয়ে রেখে ফিরে এল আবার। সেলাই নিয়ে বসল সব, যেন এতক্ষণ সেলাই নিয়ে ছিল সবাই। রাশিয়ান ইন্‌স্পেক্টার ঘরে ঢুকলেন।

শিক্ষয়িত্রীটি উঠে বললেন, এ দু ঘণ্টা আমরা মেয়েদের সেলাই শেখাই···

আপনি কি যেন পড়ছিলেন একটা?

ওদের গল্প প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম। এই যে—

রাশিয়ান হরফে ছাপা কেতাদুরস্ত একখানা গল্পের বই আগে থাকতে টেবিলে রাখাই ছিল, দেখালেন সেটা। সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে সেটা উলটে-পালটে দেখে রাশিয়ান ইন্‌স্‌পেক্টার তার পর পরীক্ষা শুরু করলেন। রাশিয়ার জারেদের নাম, তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠির নাম, তাদের প্রত্যেকের উপাধি কি কি, কটমট নামের বিরাট বিরাট তালিকা আবৃত্তি করতে হ'ল। নির্ভুলভাবে আবৃত্তি ক'রে গেল সেই দশ বছরের মেয়েটি। মেরী স্ক্লাডোওয়াস্‌কা...ভবিষ্যৎ মাদাম ক্যুরি।

শত্রুর কাছে মিছে কথা বলায় পাপ নেই।

...না, না...।

আপনি কি দেখেছিলেন?

আমি দেখেছিলাম যে, উনি বাইক ক'রে এসে ভলান্টিয়ার যোগাড় করছিলেন তার কাটাবার জন্যে। আমাকেও যেতে বলেছিলেন।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অংশুমান। সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে যাচ্ছে। সে কিন্তু কিছু শুনছে না। তার মানসপটে শুধু জাগছে ছবির পর ছবি। আর কানে বাজছে—যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব...। অদৃশ্য অপরা-তড়িৎ ক্রমাগত ব'লে চলেছে পরা-তড়িতের উদ্দেশে—যাব, যাব, তোমারই কাছে যাব...

হ্যাঁ যাবই, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যাব...

এগিয়ে চলেছে জনতা। সামনেই থানা। লাল-পাগড়িতে ভ'রে গেছে চারিদিক। খাকি-পোশাক-পরা মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে বেওনেট উঁচিয়ে। জনতা এগিয়ে চলেছে তবু।

ফায়ার...

শুরু হয়ে গেল গুলি। পতাকাধারী প'ড়ে গেল একজন। পতাকা পড়ল না কিন্তু...ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত বীরের দৃঢ়মুষ্টিতে সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ প্রাণ ছিল, পতাকার মান রেখেছিল সে। গুলি চলছে...লোক মরছে। অগ্রগতি বন্ধ হচ্ছে না কিন্তু...এগিয়ে চলেছে...জনতা...

সর্বাঙ্গে গুলি লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক, গিরগিটির মত হামাগুড়ি দিয়ে বুকের ভরে এগিয়ে চলেছে একজন। দুটো পা-ই জখম হয়েছে, দাঁড়াবার

শক্তি নেই। কিন্তু তবু সে যাবে, মরবার আগে থানায় সে পৌঁছবেই। পণ সে রক্ষা করবেই...

এসেছি, এসেছি এই দেখ, তোমরাও এস...

থানার বারান্দায় উঠে হাসিমুখে ব'লে উঠল সে। রগের উপর একটা গুলি বিঁধল এসে। মুখ থুবড়ে পড়ল। মুখে হাসি।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিস্পন্দ অংশুমান ছবির পর ছবি দেখছে শুধু, হঠাৎ জজ সাহেবের মুখটা চোখে পড়ল। দেশী জজ। যা শুনছে তাই লিখে যাচ্ছে, যে যা বলছে তাই টুকে যাচ্ছে। নির্বিকার। একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল। গল্প নয়, ইতিহাস। ট্রট্স্কির লেখা রাশিয়ান বিদ্রোহের ইতিহাসে আছে—চতুর্দিকে বিদ্রোহ যখন আসন্ন, অত্যাচারে ষড়যন্ত্রে রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত যখন ব্যতিব্যস্ত, ঘরে বাইরে কোথাও স্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই, প্রলয়ের ঢেউ প্রাসাদের সিংহদ্বারে যখন ভেঙে পড়ছে, তখন জার নিকোলাস নাকি নিরতিশয় উদাসীন ছিলেন। প্রমাণ তাঁর তখনকার রোজনামচা। অনেকক্ষণ বেড়ালাম, দুটো কাক মারলাম, দিনের আলোয় ব'সে চা খাওয়া গেল, পাতলা কামিজ গায়ে দিয়ে বেরিয়েছি আজ, নৌকো বাইলাম, একটু পড়েছি—রোজনামচায় এইসব লেখা খালি। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি কথা নেই, স্বাভাবিক ছন্দে জীবন ব'য়ে চলেছে যেন। সামান্যতম উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীরা পোর্ট আর্থার দখল করেছিল যখন, তখনও তিনি নাকি এমনই নির্বিকার ছিলেন। তাঁর পারিষদ্‌রা তাঁর অদ্ভুত আত্মসংযম দেখে অবাক হয়ে যেতেন, অনেকে বলতেন, এ ঔদাসীন্য আভিজাত্যের লক্ষণ। ট্রট্স্কি বলেছেন, এর আসল কারণ আধ্যাত্মিক দৈন্য। উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হতে হ'লে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, নিকোলাসের তা ছিল না। তিনি ছিলেন জন্ম-অসাড়। এ লোকটাও তাই নাকি।...অংশুমান আর একবার জজ-সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। জীবনের কোন লক্ষণ নেই। যে জাল ছিন্ন করবার জন্যে দেশসুদ্ধ লোক বিদ্রোহ করেছে, সে জালে উনিও যে আবদ্ধ তার কোন বোধ ওঁর চোখে মুখে পরিস্ফুট নয়। মানুষ নয়, একটা মুখোশ-পরা যন্ত্র যেন ব'সে আছে কোট প্যাণ্ট প'রে, যে যা বলছে টুকে যাচ্ছে...

মেঘ ক'রে আসছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের খানিকটা। পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন নীল মেঘে ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। তাদের বাড়ির পাশে যে

কদমগাছটা আছে, তার পুষ্পকেশরে কি রোমাঞ্চ জেগেছে! চারিদিক কি স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে আসছে! কি নিবিড়! সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ ···হঠাৎ মেঘদূত মনে প'ড়ে গেল। ত্বামারূঢ়ং পবন পদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তঃ প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বস্যত···আজও কি পথিকবনিতারা বিশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অলকদাম উত্তোলন ক'রে পবনপথারূঢ় আষাঢ়ের মেঘের দিকে চেয়ে থাকে···দেশের কি সে অবস্থা আছে এখন আর? অন্তরা কোথায় এখন কি করছে, ভাবছে, ডেপুটির গৃহিণী হয়ে সুখে আছে কি সে, তার মত মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব কি, জড়োয়া গয়নার কথা তার স্বামী কি টের পেয়েছে?···

দপ ক'রে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্ব'লে উঠল। "যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাচ্ছি, নানা বাধা বিঘ্ন বহু জটিল পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে, কিন্তু তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছবই···"

অপরা-তড়িত পরা-তড়িতের কাছে যেতে চায়, তাই তো আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, এরোপ্লেন ওড়ে, রেডিও বাজে। তার এ আগ্রহ না থাকলে থেমে যেত সব। সহসা অংশুমানের মনে হ'ল, এমনই এক-একটা আগ্রহের টানেই তো গ'ড়ে উঠেছে এক-একটা সভ্যতা। স্বর্গের টানে বৈদিক, ব্রহ্মের টানে ঔপনিষদিক, নির্বাণের টানে বৌদ্ধ, প্রেমের টানে বৈষ্ণব, অপরা-তড়িতের টানেও তেমনই গ'ড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা। অন্তরার টানে সেও হয়তো বড় কিছু একটা করবে। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, কতটুকু ক্ষমতা তার, কি করতে পারে সে!

"...যখন দাদোজির সঙ্গে সহ্যাদ্রির শিখরে দাঁড়িয়ে ভগবানের সমক্ষে আমি শপথ করেছিলাম যে, ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য আমি প্রাণপণ করব, তখন আমার ক্ষমতা কতটুকু ছিল! তখন আমার বয়স আঠারো বছর মাত্র···"

সপ্তদশ শতাব্দীর স্তব্ধতা ভেদ ক'রে ভেসে এল শিবাজীর কণ্ঠস্বর।

তুমি নয়, আমি নয়, জয়ী হয় ধর্ম। ধর্মের ধ্বজাবাহক আমরা, তাই আমাদের একমাত্র ভরসা। ধর্মই আমাদের শক্তি···

রাজদম্পতির প্রকাণ্ড যে তৈলচিত্রটা টাঙানো ছিল সামনে, তা অবলুপ্ত ক'রে ফুটে উঠল ছত্রপতি শিবাজীর ছবি, অশ্বারোহণে ছুটে চলেছেন শত্রুজয় করতে।

আর্তের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

শত্রুর কবলে মরণাপন্ন আমরা নিজেরই ঘরে বন্দী হয়ে আছি, শত্রুর প্রহরী পাহারা দিচ্ছে দ্বারে। অন্ন নেই, পানীয় নেই, কোথায় তুমি ত্রাণকর্তা, ছুটে এস···

ছুটে চলেছে মারহাট্টা বীর হাম্বীর রাও।

প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হ'ল একটা···চমকে উঠল আদালত।

যাবই আমি।—কে যেন বজ্রকণ্ঠে বললে, অংশুমানের মনে হ'ল।

আবেগ যদি প্রবল হয়, দুস্তর বাধাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় নিমেষে।

অংশুমানের সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সহসা। অন্তরা অন্তরা, কোথায় তুমি···? পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। পরস্ত্রীর সম্বন্ধে এ কি চিন্তা! এ কি ভাবছে সর্বদা, ছি ছি! কেন এ দুর্বলতা, কেন, কেন, কেন? এই দুর্বল চরিত্র নিয়ে কোন্ সাহসে এই কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি! এতটুকু মনের জোর নেই, যুঝব কি ক'রে শেষ পর্যন্ত? এমন দুর্বল চরিত্র নিয়ে যুঝতে কি পেরেছে কেউ কখনও? সহসা শম্ভুজীর ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল —চরিত্রহীন মদ্যপ শম্ভুজী। ঔরঙ্গজেবের বন্দী শম্ভুজী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে মৃত্যু। রাজী হ'ল না শম্ভুজী। ইসলাম নয়, মৃত্যুকেই বরণ করবে সে। একে একে চোখ উপড়ে নেওয়া হ'ল, তপ্ত লোহার সাঁড়াশি দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলা হ'ল জিব। চরিত্রহীন মদ্যপটা বিচলিত হ'ল না তবু। শিবাজীর অযোগ্য পুত্র ছিল যে সারাজীবন, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে সে। অন্ধ শম্ভুজী যেন চেয়ে আছে তার দিকে, ঠোঁট দুটো ন'ড়ে উঠল, ···যেন বললে, তুমিও পারবে।

আপনি কি দেখেছিলেন?

ডেপুটি সাহেবকে মোটর থেকে জোর ক'রে নাবাচ্ছেন উনি।

আর কে কে ছিল?

অনেক লোক ছিল। আমিও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, অংশুমানবাবু এগিয়ে গিয়ে ডেপুটি সাহেবের হাতটা চেপে ধরলেন।

সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে, যাচ্ছে।

সকলেরই মুখে এক কথা—স্বচক্ষে দেখেছি।

...আবার সেই নির্জন কারাগার।

সমস্ত মন অসাড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সমস্ত জ'মে গেছে যেন ভিতরে। খটাৎ ক'রে শব্দটা হতেই চমকে উঠল সে। জগদ্দল পাথরের মত অনড় অচল ভাষাহীন যে বোধটা নিদারুণ চাপে নিপীড়িত করছিল মনকে, সজাগভাবে যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার উৎসাহ সে পায় নি এতক্ষণ, তালা-বন্ধ হওয়ার শব্দে

ভেঙে পড়ল সেটা যেন খানখান হয়ে, ছড়িয়ে পড়ল টুকরোগুলো প্রত্যক্ষ চেতনার সামনে। তার স্বরূপ অগোচর রইল না আর। সব দেশী লোক! জজ দেশী, দারোগা দেশী, পুলিস দেশী, জেলার দেশী, দলে দলে তার নামে যারা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে গেল সব দেশী! সে নির্দোষ নয় তা ঠিক, কিন্তু এরা যা ব'লে গেল তা সব বানানো—একটা কথাও সত্য নয়। কিসের লোভে মিথ্যে কথা বললে এরা?

তুমিও তো সত্য কথা বল নি। তুমিও মিথ্যা কথা ব'লে চলেছ ক্রমাগত…

অদৃশ্য বিবেকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল হঠাৎ। চমকে উঠল অংশুমান। নিক্তি ধ'রে এ লোকটি ব'সে আছে তো ঠিক, এত বিপর্যয়েও বিপর্যস্ত হয় নি একটুও। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যেই। পর-মুহূর্তেই ব'লে উঠল, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আমি মিছে কথা বলেছি বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, দুষ্টকে দমন করবার জন্যে, স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায়। যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষের জীবনেই এ রকম প্রবঞ্চনার উদাহরণ পাওয়া যাবে। নির্জন অন্ধকারে কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল। জোরে বলার কোন দরকার ছিল না তো! পোড়া ডেপুটির মুখ-খানা চোখের উপর ভেসে উঠল আবার। দাম্ভিক, বর্বর পাষণ্ড। কামুকও। শুধু যে কর্তব্যকর্মের অনুরোধে বাধ্য হয়ে নারীধর্ষণের হুকুম দিয়েছিল তা নয়, সেটা উপভোগও করেছিল। বহুবার-ধর্ষিতা একটি মেয়ের চেহারা মনে পড়ল। কি অসহায় করুণ দৃষ্টি তার চোখে! মুখে কথা নেই, দাঁড়াতে পারছে না ভাল ক'রে! থরথর ক'রে কাঁপছে, উত্তর দিচ্ছে না কারও কথার…শুনতে পাচ্ছে না বোধ হয়, চেয়ে আছে শুধু। মনে হ'ল, শুধু একজন নয়, সারা দেশ জুড়ে সহস্র সহস্র নারী যেন চেয়ে আছে তার দিকে। এই সব অসহায় মূক-বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে? অসংখ্য রক্তকণা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে সারা দেহে …অগ্নির ঝড় বইছে মাথার ভিতর। ন্যায়পরায়ণ বিবেক কোথায় উড়ে গেল সেই ঝঞ্ঝায়! আচ্ছন্নের মত প'ড়ে রইল অংশুমান। সমস্ত চেতনা জুড়ে একটি কথাই স্পন্দিত হতে লাগল বারম্বার—এই সব অসহায় মূক-বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে?…আমি কি পারব?

না পারবার কি আছে!

হাস্যপ্রদীপ্ত একখানি মুখ ফুটে উঠল চোখের সামনে। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে গেল। প্রদীপ্ত চোখ দুটি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ধপধপে সাদা দাড়ি,

সাদা চুল, সাদা ভুরু। সমস্ত মুখে কিন্তু ফুটে রয়েছে যৌবনের জয়শ্রী। তারুণ্যের তিলক জলজ্বল করছে প্রশস্ত ললাটের মধ্যস্থলে অদৃশ্য অগ্নিশিখার মত।

মূক-বধিরদের নিয়ে অনেক কাল কাটিয়েছি। তাদের মুখে ভাষা দেওয়া সহজ। তারা জীবন্ত, তারা কথা কইতে উৎসুক। তার চেয়েও শক্ত কাজ আমি করেছি, জড়-লোহাকে কথা কইয়েছি বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে। মড়ার কান চিরে যখন দেখলাম যে, সামান্য একটা পর্দার কম্পনই শ্রুতির কারণ, তখন মনে হ'ল, লোহার পাতলা পর্দায় সে কম্পন সঞ্চার করা অসম্ভব হবে কেন বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে? লেগে গেলুম...

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। পর-মুহূর্তেই কিন্তু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

ওই দেখ, স্বভাব না যায় ম'লে! এখনও মনে হচ্ছে, আমি করেছি। পড়েইছো তো, আসলে ব্যাপারটা ভুতুড়ে কাণ্ডের মত অদ্ভুত। ওয়াট্‌সনের ট্র্যান্‌স্‌মিটিং স্প্রিং একটা বিগড়ে গেল, সে সেটা নিয়ে টানাটানি শুরু করতেই আমি পাশের ঘরে শব্দ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, মেক-ব্রেক পয়েণ্ট ছুটো জুড়ে গেছে। বাস, টেলিফোন আবিষ্কারের খেই পেয়ে গেলাম। কি ক'রে জুড়ল, ঠিক ওই সময় জুড়ল কেন, আমারই বা কানে গেল কেন—সেইটেই রহস্য এবং সেইটেই বোধ হয় আবিষ্কারের আসল কারণ। সে যাক, কিন্তু there's a lesson for you—রহস্যটা নয়, ওয়াট্‌সনের ওই গোলমাল ক'রে ফেলাটা—অপ্রত্যাশিতভাবে স্প্রিঙের মেক-ব্রেক পয়েণ্ট ছুটো জুড়ে যাওয়টা। প্ল্যান ক'রে বড় কিছু প্রায়ই হয় না, গোলযোগের মধ্যেই অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে যায়। হিমালয় বা প্রশান্ত মহাসাগর কোন ইঞ্জিনীয়ার প্ল্যান ক'রে করতে পারত না। সুতরাং বিদ্রোহ ক'রে দেশে বিশৃঙ্খলা এনেছ ব'লে তোমাদের খুব বেশি লাঞ্ছিত হবার কারণ নেই। বহু বৈজ্ঞানিক বহু বহু বুদ্ধি খাটিয়ে যে সমুদ্রে পুল বাঁধতে পারে না, সেই সমুদ্র একদিনে শুকিয়ে যেতে পারে খামখেয়ালী ভূমিকম্পের ধাক্কায়, মানে···well, I did not like to talk, but I am talking like a parrot···

হঠাৎ থেমে পিছনে ছু হাত দিয়ে ঘুরে বেড়তে লাগলেন সারা ঘরময়। অস্থির যে যুবক একদা বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভোকাল ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিল, সে-ই যেন আবার মূর্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ গ্রেহাম বেলের মধ্যে। হঠাৎ তিনি ছু হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠি ক'রে ধ'রে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন অংশুমানের মনে হ'ল, কি যেন খুঁজছেন তিনি।

আপনি খুঁজছেন নাকি কিছু ?

হ্যাঁ, শান্তি। আলো নয়, অন্ধকার। শব্দ নয়, নৈঃশব্দ্য। জীবনের শেষে ঘর থেকে টেলিফোন দূর ক'রে দিয়েছিলাম আমি। It is a nuisance... এখন দেখছি, চিন্তার ডাকেও সাড়া দিতে হয়। There is no escape···

তার পর হেসে বললেন, তোমাকে আমার মত হতে বলছি না তা ব'লে। হতে পারবেও না। সেলেনিয়মের উপর আলো পড়লে তার রেজিস্ট্যান্স্ যেমন বদলে যায়, তোমার মনের উপরও তেমনই পড়ছে প্রেরণার আলো। নানা রকম কারেণ্ট পাস করবে এখন। আমার ফোটোফোনের কথা পড়েছ তো, তার নয়—আলোর রেখা বার্তা বহন করেছিল, মনে আছে ?

আছে।

তোমার মনের ওপরও তেমনই ভেঙে পড়েছে অসংখ্য আলোর অসংখ্য রকম তরঙ্গ। অসহায় সোলার টুকরোর মত ভেসে বেড়াও এখন নানা তরঙ্গের শিখরে শিখরে। ডুবতে হবে, উঠতে হবে, ভাসতে হবে। ওর থেকেই কিছু একটা হয়ে উঠবে হয়তো, যদি হবার হয। ভেবে চিন্তে প্ল্যান ক'রে কিছু হবে না। বার্তা বহন ক'রে যাও ক্রমাগত, ঠিক-বেঠিক যা হোক···আঃ, সিকেনিং !

সমস্ত মুখ বিরক্তিতে ভ'রে গিয়ে হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল আবার পর-মুহূর্তেই। যেন সামলে নিলেন।

এই এখন তোমার একমাত্র কাজ। মূক-বধিরদের নিয়ে মাথা ঘামাও যদি, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। Carry on...আমি এখন চলি। আমাকে আর ডেকো না...please, I want peace, nothing but peace. Good night.

চ'লে গেলেন।

অংশুমান বিস্মিত হয়ে ব'সে রইল।

প্ল্যান ক'রে কিছু হবে না ?...

···গ্যাল্ভানি, অর্স্টেড, বেকেরেল, রণ্ট্গ্যেন···সারি সারি আরও অনেকে এসে দাঁড়ালেন। সকলেরই চোখে সকৌতুক দৃষ্টি। এঁদের প্রত্যেকরই আবিষ্কার যুগান্তকারী, কিন্তু প্রত্যেকটা আবিষ্কারই আকস্মিক। সকৌতুক দৃষ্টিতে নীরবে এই তথ্যটুকু নিবেদন ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সবাই আবার···

কারাগারের সূচীভেদ্য অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠল। প্ল্যান ক'রে কিছু হবে না ? আমাদের এই যে এত বছরের এত প্ল্যান, এর কি মূল্য নেই কোনও? সব বিদ্রোহের মূলেই তো প্ল্যান থাকে। রাশিয়ার ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান...বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কার আর রাজনীতি এক নয়···গুলিয়ে ফেলছি আমি···বিজ্ঞান···

যে কোনও বিষয়ের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান।

অংশুমান ফিরে দেখলে, নির্নিমেষ এক জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। বিরাট শ্মশ্রুসমন্বিত গম্ভীর মুখ। অনড় নিস্পন্দ। ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল।

যে কোনও বিষয়ের জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। কোনও নীতিই বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়, রাজনীতিও নয়। জ্ঞানমাত্রেই নিয়মের অধীন, পৃথিবীতে অনিয়ম ব'লে কিছু নেই। যা অনিয়ম ব'লে মনে হয়, আসলে তা জ্ঞানের অভাব, পর্যবেক্ষণ-শক্তির অপটুতা। নেপ্‌চুনকে দেখবার ঢের আগে অ্যাডাম্‌স্ তার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, হ্যালি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাবের, অনেক ধাতু আবিষ্কৃত হবার পূর্বেই তাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিক মলিকিউলার ওয়েট থেকে। কি ক'রে সম্ভব হ'ল এসব? অঙ্ক ক'ষে। সমস্ত বিশ্বব্যাপার নিয়ন্ত্রিত ব'লেই অঙ্ক ক'ষে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভের কথা আমি বলতে পেরেছিলাম, হারৎজ্‌ হাতে-কলমে সেটা প্রমাণ করলেন অনেক পরে। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খল কিছু নেই, থাকতে পারে না। মিস্টার বেলের ভুতুড়ে কাণ্ডটাও বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই ঘটেছিল। আমি আইনজ্ঞ উকিলের ছেলে, বে-আইনী কথা মানি না। মিস্টার বেলের কথায় দ'মে যাবার দরকার নেই, সহস্র উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ ক'রে দেওয়া যায় যে, একটা বিশেষ নিয়ম অনুসরণ ক'রে প্ল্যান অনুযায়ী যাঁরা ঠিকমত চলতে পেরেছেন, তাঁরা অনেক বড় কাজ করতে পেরেছেন পৃথিবীতে। তার পর একটু ভেবে বললেন, এই ধর না যেমন আল্‌ভা এডিসন। ওই বেলের টেলিফোনেরই কত উন্নতি করেছেন তিনি, গ্রামোফোন বানিয়েছেন, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌ তৈরি করেছেন, আরও কত কি করেছেন...

কি বলছ আমার নামে?

আল্‌ভা এডিসন এসে দাঁড়ালেন। গোঁফ-দাড়ি নেই, ভারী মুখ, চোখের দৃষ্টিতে সপ্রশ্ন কৌতুক, বলিষ্ঠ নাকটা নীরবে যেন লোকটার ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করছে। এডিসনের আবির্ভাবে ম্যাক্স্‌ওয়েলের চোখে মুখে প্রাণ সঞ্চার হ'ল যেন। এতক্ষণ তাঁকে মূর্তিমান নিয়ম ব'লে মনে হচ্ছিল। একটু সসম্ভ্রমে তিনি বললেন, মিস্টার বেল এই ছেলেটিকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে গেছেন। ব'লে গেছেন যে, প্ল্যান-ট্ল্যান ক'রে কিছু হবে না, ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে একটা কিছু

আপনিই ঘ'টে উঠবে। আমি তাই একে বলছিলাম যে, ঘূর্ণাবর্তও বিশৃঙ্খল ব্যাপার নয়, তাও বিশেষ বিশেষ বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীন। সেই নিয়মগুলো আগে থাকতে জেনে নিয়ে যদি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করা যায়, তা হ'লে সুবিধাই হয়, ফলাফল আগে থাকতে আন্দাজ করা যায়। এবং সেটা সম্ভব। সেই সূত্রেই আপনার কথা উঠেছিল। আমার মনে হয়, আপনার প্রত্যেকটি কাজ আপনি বেশ প্ল্যান ক'রে করেছেন। আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার এমন জুৎসই যোগাযোগ দেখলে মনে হয় যে, অনেক ভেবেচিন্তে করেছেন সব। তাই এত করা সম্ভবও হয়েছে আপনার পক্ষে—নয় ?

ম্যাক্স্ওয়েলের কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল।

এডিসন হেসে বললেন, আমার কি মনে হয় জান, গার্ডের হাতের চড় খেয়ে সেই যে আমি কালা হয়ে গেলাম, তাই আমার উন্নতির কারণ। তার পর যতদিন বেঁচে ছিলাম, বাইরের কিছু শুনতে পেতাম না, একাগ্র হবার সুযোগ পেয়েছিলাম···

দেখা গেল, ম্যাক্স্ওয়েল এডিসনের জীবনের এ ঘটনাটা জানতেন না। চড় মেরেছিল ? আপনাকে ? কোন গার্ড ? কেন ?···

রেলের গার্ড। ও, তুমি জান না বুঝি ? গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলে আমি একটা খবরের কাগজ ছেপে বিক্রি করতাম। অবসর-সময়ে সেই ট্রেনেই সময় কাটাতাম কেমিস্ট্রির একস্পেরিমেণ্ট ক'রে। একদিন একটা ফস্ফরাসের জার প'ড়ে গিয়ে ট্রেনে লেগে গেল আগুন। গার্ড ট্রেন থামিয়ে কানের উপর প্রকাণ্ড একটি চপেটাঘাত ক'রে দূর ক'রে দিলে আমায়। কানের ড্রামটি ফেটে কালা হয়ে গেলাম জন্মের মত। এখন অবশ্য শুনতে পাই, কারণ যে দেহটা তো এখন আর নেই। একটু হাসলেন, তার পর বললেন, এটা অবশ্য ঠিক যে, সত্যের প্রতি একাগ্র না হ'লে সে ধরা দেয় না কিছুতে। বধির হয়েছিলাম ব'লেই একাগ্রতা বেড়েছিল, অন্যমনস্ক হবার সুযোগ ছিল না। আমার বধিরতার কারণ গার্ডের চপেটাঘাত, তার কারণ ফস্ফরাসের জার প'ড়ে যাওয়া, তার কারণ বোধ হয় ট্রেনের ঝাঁকানি এবং আমার অসাবধানতা—কোন্‌টা যে আসল কারণ তা কি ক'রে বলি, বল ?—দুষ্টুমি-ভরা হাসিতে চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

আসল কারণ অবসর-সময়ে আপনার কেমিস্ট্রি অধ্যয়নের আগ্রহ।—সসম্ভ্রমে বললেন ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল।

এডিসন চুপ করে রইলেন স্মিতমুখে। তার পর বললেন, হ্যাঁ, সত্যকে

জানবার আগ্রহটাই আসল জিনিস। সেই আগ্রহই নানা জনকে নানা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ক'রে…

এডিসনের মুখে "নিয়ন্ত্রিত" কথাটা শুনে ম্যাক্স্‌ওয়েল পুলকিত হয়ে উঠলেন। অংশুমানের দিকে চেয়ে বললেন, শুনলে? নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উপায় নেই। নিয়মই সত্য সত্যই নিয়ম। এ কথা মনে রাখলে মনে জোর পাবে। অনিয়ম সত্য নয়, বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলারই মিথ্যা রূপ। সত্য নিয়মের পরাধীনতাই সত্য স্বাধীনতা। সত্যকেই আঁকড়ে থাক এবং কি ক'রে তা পারবে তার উপায় চিন্তা কর প্রতি মুহূর্তে। এরই নাম প্ল্যান…

হঠাৎ জেলের পাগলা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সাড়া প'ড়ে গেল চতুর্দিকে।

মারো—মারো—মারো…

ওপর-ওলার হুকুমে কংগ্রেসী কয়েদীদের মারা হচ্ছে ঘরে ঢুকে ঢুকে। আর্তনাদ উঠতে লাগল অন্ধকার ভেদ ক'রে। অংশুমানের ঘরের কপাটটা খুলে গেল। ব্যাটন হাতে ঢুকল পুলিস।

১৩

নিজের বৈঠকখানায় লাহিড়ী মশাই চিন্তিত মুখে তামাক টানছিলেন। ছেলের চাকরির জন্য যে দরখাস্তটি করেছিলেন, তা নামঞ্জুর হয়েছে। অনেক তদ্বির করেছিলেন, তবু হ'ল না। আপিসের বড়বাবু তাঁর বন্ধু, তাঁরই থ্রু দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। একটু আগে বড়বাবু নিজে এসে ব'লে গেলেন—না হওয়ার আসল কারণ, সায়েব টের পেয়েছে অংশুমানের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব ছিল। ছিল, অস্বীকার করবার উপায় নেই। হতভাগা ছোঁড়াটা পাড়াসুদ্ধ সবাইকে মজিয়ে গেছে। আঃ! চাকরি তো হ'লই না, এখন পুলিসে না ধরলে বাঁচি। পেন্‌শনটি সম্বল, সেটা বন্ধ ক'রে দিলেই—বাস্‌! হুঁকোয় ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন, ধুমাচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিপাশ, রগের শিরগুলো ফুলে উঠল, চোখ দুটো মনে হ'ল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখুনি। বন্ধু পীতাম্বর প্রবেশ করলেন। গেঁটে-বাতওলা পাকা বুড়ো।

ওহে, খবর শুনেছ?

কিসের খবর?

রামতারণের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় পাকা ক'রে এনেছিলাম, কিন্তু হ'ল না।

কেন ?

রামতারণের মেয়েই বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বলছে, পুলিসের দারোগাকে বিয়ে করব না।

অ্যাঁ, বল কি ?

হ্যাঁ হে। অতি ভয়ঙ্কর কাল এসে পড়ল, বোঝেছ ?

খোঁড়াচ্ছ কেন ?

হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। কদিন থেকে সমানে পুবে হাওয়া যা চালিয়েছে ! ভাবলাম, ব'সে ব'সে কি আর করি, লাহিড়ীর সঙ্গে একদান পাশা খেলে আসা যাক। তামাক রাখ, পাশাটা পাড়।

লাহিড়ী পাশা পাড়লেন। গোমড়া মুখ ক'রে দুজনে পাশা খেলতে লাগলেন। বাড়ির সামনে একটা গাছে অজস্র জবাফুল ফুটে ছিল, তারাই হাসতে লাগল কেবল।

একটা মাসিক-পত্র টেবিলের উপর প'ড়ে ছিল। মলাটের উপরই প্রকাণ্ড একটা সাবানের বিজ্ঞাপন। একটি নারী তার প্রস্ফুটিত যৌবনকে লীলায়িত ক'রে আবক্র ভঙ্গীতে ব'সে আছে। নীচে রবীন্দ্রনাথের দু লাইন কবিতা। অন্তরা কাগজটা হাতে ক'রে ছবিটার দিকে চেয়ে ব'সে ছিল চুপ ক'রে। চেয়ে ব'সে ছিল দেখছিল না। যখন দেখল, তখন সারা মন বিরক্তিতে ভ'রে উঠল। নারীদেহের এই মাংসপিণ্ডগুলোকে যে কোন অজুহাতে যখন-তখন সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে লজ্জাও ক'রে না ! পুরুষদের হয়তো করে না, তারা ওই হয়তো লুব্ধ-দৃষ্টিতে দেখতে চায়; কিন্তু মেয়েদেরও কি করে না ? করে না বোধ হয়। কই, এ বিষয়ে কোনও নারীর প্রতিবাদ তো চোখে পড়ে নি আজ পর্যন্ত ! তারা বোধ হয় এর সমর্থনই করে। করাই স্বাভাবিক, ব্যবসাদার যেমন তার মাল বিজ্ঞাপিত করতে চায়· ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল অন্তরার। তাড়াতাড়ি মাসিক-পত্রিকার পাতাগুলো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উলটে গেল একবার। আবার শেষ থেকে গোড়া পর্যন্ত। তার পর বিতৃষ্ণাভরে সরিয়ে রেখে দিলে সেটা। সদ্য-আসা মাসিক-পত্রের মোড়কটা প'ড়ে ছিল· সামনে, সেটাকে অকারণে কুচিকুচি করলে অনেকক্ষণ ধ'রে। প্রত্যেকটি কুচি পাকিয়ে পাকিয়ে লুফল খানিকক্ষণ। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তার পর। চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিলে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ডান কানের দুলটা এখনও

বেঁকে আছে একটু···স্যাকরাটা ঠিকমত জুড়তে পারে নি···দুলটা কেন ছিঁড়েছিল অনিবার্যভাবে সে কথাটাও মনে পড়ল। কিন্তু সেটাকে সে আমল দিলে না কিছুতেই, জোর ক'রে সরিয়ে দিলে মন থেকে। ও কথা নয়, সে অন্য কথা ভাবতে চায়, অন্য কিছু, যা হোক কিছু। একটা কথা মনে পড়াতে সে বেঁচে গেল।

রামধন!

আজ্ঞে?

ভৃত্য রামধন দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হ'ল।

কই, বাজারের হিসেবটা দিলে না?

এই যে মা, নিন না। চার আনার আলু এনেছি, দু পয়সার সিম, আর আধ সের বেগুন তিন আনার···

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নিতে লাগল অন্তরা প্রত্যেকটি জিনিসের দর ক'রে, প্রত্যেকটি জিনিস ওজন ক'রে। অবাক হয়ে গেল রামধন। কোনদিন তো এমন করেন না, আজ হ'ল কি! তার আত্মসম্মান আহত হ'ল একটু, কিন্তু কি বলবে! পুলকিতও হ'ল, যখন হিসেবে কোন খুঁত ধরতে না পেরে বকশিশ পেলে চার আনা। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কাঠের টুকরোটাকে তুচ্ছ জেনেও প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চায়, রামধন-প্রসঙ্গটাও তেমনই কিছুতে শেষ হতে দিতে চাইছিল না অন্তরা।

লাক্স সাবান বড় প্যাকেট পেলে না একেবারে? বাবুর নাম করেছিলেন?

বাবুর নাম করলে ছোট প্যাকেটও পাওয়া যেত না মা। কোনও 'অপসর'কে কোন জিনিস দিতে চায় নাকি সহজে আজকাল! যেটুকু দেয় কারে প'ড়ে। আমাদের দেখলেই সরিয়ে ফেলে সব, বলে—বিক্রি হয়ে গেছে। হরিয়াকে দিয়ে কিনিয়েছি এটা···

হরিয়া স্থানীয় শশীবাবুর চাকর। শশীবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরকারী ডেপুটি নন। কথাটা ব'লেই রামধন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তখনই সামলে নিয়ে বললে, আমাদের বাবুকে তবু ভালবাসে অনেকে, তাই আমরা কিছু কিছু পাই। এস. ডি. ও. সাহেবের চাপরাসীকে দেখলে তো—। রামধন ভ্রূযুগল উত্তোলন ক'রে প্রকাশ করলে বাকিটা। এই সামান্য কথার ধাক্কায় অন্তরা ছিটকে গিয়ে পড়েছিল, যেখানে তা লক্ষ অপমানের তীক্ষ্ণ কণ্টকে সমাকীর্ণ,—বহু কাঁটা একসঙ্গে বিঁধল সর্বাঙ্গে। অন্তরার মুখের পেশী কিন্তু বিচলিত হ'ল না একটু। অমানুষিক শক্তিবলে কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক আবদারের সুর ঢেলে

সে বললে, একটু গরম জল কর না তা হ'লে লক্ষ্মীটি। সিল্কের শাড়ি একখানা কাচতে হবে। রামধন চ'লে গেল গরম জল করতে। নূতন একটা সমস্যা সৃষ্ট হওয়াতে খুশি হ'ল অন্তরা। কোন্ শাড়িটা কাচতে হবে, সেটা নির্বাচন করা যাক এবার...একটাও ময়লা হয় নি তেমন...তবু বেছে বার করতে হবে একটা। সময় কাটবে।...

...ছোট একটি ঘর। জানলা নেই। ছোট ছোট ঘুলঘুলি। তাও লোহার জাল দেওয়া। কপাট বন্ধ। লোহার গরাদে দেওয়া মজবুত কপাট...সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে...অন্ধকার ঘরে একা চুপ ক'রে ব'সে আছে সে...মুখময় গোঁফ-দাড়ি, পরনে কয়েদীর পোশাক। চোখ দুটো জ্বলছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা...

মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?—কথাগুলো উচ্চারণ ক'রেই অন্তরা আত্মস্থ হ'ল। শাড়ির স্তূপ সামনে রেখে কি ছবি সে দেখছিল এতক্ষণ! হঠাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখলে কেন? জেলে মারধোর করছে নাকি? কই, কোন খবর তো পাই নি! তবে? স্পষ্ট দেখতে পেলে! কেমন ক'রে? ক্লেয়ারভয়েন্স? না, ওসব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস নেই তার। শাড়ির দিকে মন দিতে চেষ্টা করলে আবার। দুরন্ত বন্যা! তবু বাঁধ দিতেই হবে একটা যেমন ক'রে হোক। ভেসে যেতে হবে তা না হ'লে অকূলে। ভয় করে...। সমাজের ভয় নয়, গুরুজনের ভয় নয়, কেমন একটা নামহীন ভয়। গ'ড়ে-তোলা পারিপার্শ্বিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে অভ্যস্ত জীবনকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে কোথায় যাবে সে অনিশ্চিত কোন্ পথে! ভয় বাইরে নয়, নিজের মধ্যেই। নীড়বিলাসী অন্তরাত্মা ঝঞ্ঝার আভাস পেলেই পক্ষ সঙ্কুচিত ক'রে চোখ বুজে ব'সে থাকতে চায় নীড়ের মধ্যে, তা যত তুচ্ছ হোক না সে নীড়। নিশ্চিন্ত আরামই তার কাম্য। এমন কি পরাধীনতার আরামও। পরাধীনতার আরামও চায় সে? বেণী-দোলানো এক কিশোরী গ্রীবাভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠল মনের মধ্যে, কক্‌খনো নয়। অনাবিল স্বাধীনতায় পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে যে আরাম, তাই চাই আমি। সে স্বাধীনতা কোথায়, সে মনুষ্যত্বের অর্থ কি, খুঁজে বার কর সেটা। ঝুটো জিনিসও কখনও চাই নি, কখনও নেব না...বেণী-দোলানো কিশোরীটির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অন্তরা। তার নিজেরই পূর্বরূপ...বয়ঃসন্ধির সেই অপরূপ ছবিটা এখনও মরে নি নাকি...এখনও বেঁচে আছে অবুঝটা! কোন্ স্বপ্নলোকে? সহসা মনে হ'ল, ওই সত্য, স্বপ্নই সত্য। বাকি সব মিথ্যা। স্বাধীনতা কি...মনুষ্যত্ব কি?

অতীতের দিনগুলো এলোমেলোভাবে মনে পড়ল। মা-বাবা ভাই-বোন

জামা-কাপড় ফ্রক-ব্লাউজ টেপ-তেল চিরুনি-স্নো বই-খাতা স্কুলমাস্টার মাস্টারনী বান্ধব-বান্ধবী চিঠি-প্রেম—এই সমস্তকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত সত্তা যে ছন্দে আবর্তিত হয়েছে, তা স্বাধীনতারই ছন্দ। নিজের মতে নিজের পছন্দ অনুসারে সব চেয়েছে সে। সব মানুষই তাই চায়। স্বাধীনতা মানেই মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব মানেই স্বাধীনতা। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি এটা। শৈশব থেকেই মানুষ পার হতে চায় গণ্ডি, লঙ্ঘন করতে চায় বাধা, অমান্য করতে চায় বারণ। এটা ক'রো না, ওখানে যেও না...অনাদি কাল থেকে হিতৈষী গুরুজনেরা বারণ করেছেন আর অনাদি কাল থেকে অবাধ্য শিশুরা তা অমান্য করেছে। দুষ্কর্ম করতেও তার প্রবৃত্তি। সে ঠেকে শেখে, ঠেকে শেখবার স্বাধীনতাই সে চায়। তারই বাধা সে চূর্ণ করেছে যুগে যুগে, বাধা হিতকর হ'লেও চূর্ণ করেছে, চূর্ণ ক'রে মরেছে, তবু থামে নি। পুরাতনকে ওলটপালট ক'রে সে আধুনিক হতে চেয়েছে বারম্বার। মানবজাতির এই ইতিহাস। তার অসংখ্য কামনার অসংখ্য বাধাকে সে অপসরণ ক'রে চলেছে। প্রকৃতির নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা থাকে নি সে। শীতাতপের নির্যাতন সহ্য করে নি, গৃহ নির্মাণ করেছে, অগ্নি আবিষ্কার করেছে, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে নিত্য নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে। দূরত্বের বাধা, সময়ের বাধাও সরিয়েছে সে। আকাশ-যান, বেতার-বার্তা, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ··· মানবসভ্যতার প্রগতি বাধা-অপসারণের ইতিহাস। মানুষ এও আবিষ্কার করেছে যে, আসল বন্ধন বাইরে নয়, কঠিনতম বন্ধন নিজেরই মধ্যে,—ষড়-রিপুর বন্ধন। তাও ছিন্ন ক'রে মানুষ মুক্ত হতে চেয়েছে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে। সে মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়,—স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ।···মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা কেন দেখলাম···স্বাধীনতা-চিন্তার স্রোতকে ব্যাহত ক'রে প্রশ্নটা মনে জাগল আবার···

মা, গরম জল হয়ে গেছে।

খুব বেশি গরম কর নি তো? চল, দেখি।

সাড়ম্বরে শাড়িটা সাবান দিয়ে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

...ভয় করে···হ্যাঁ, ভয় করে সত্যিই। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও কি নেই? অতল গহ্বরটার দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলে···

···ঘূর্ণিপাকের তাণ্ডব চলেছে ওর তলায়···সমুদ্র-মন্থন···ওর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কৌতূহল হয় বইকি···আত্মঘাতী কৌতূহল···

পিপারমিণ্ট আছে আপনার কাছে?

মুন্সেফবাবুর দশ বছরের মেয়ে রেখা এসেছে। ছিমছাম পোশাকপরা মেয়েটি। মাথার চুল সব করা। এর মধ্যেই চোখের দৃষ্টিতে বয়সের ছাপ লেগেছে। সরলতা নেই। কথায় কথায় চোখ নীচু করে···

পিপারমিণ্ট? আছে বোধ হয়। দাঁড়াও, দেখি।

সময় কাটাবার আর একটা অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেল। তন্নতন্ন ক'রে আলমারিটা খুঁজলে নিপুণভাবে, তার পর এ কৌটো সে কৌটো, এ তাক সে তাক···অনেকক্ষণ পরে পাওয়া গেল শেষকালে।

বেশি নয়, একটুখানি আছে।

ওমা, তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছ সেই থেকে?

মেয়েটি কিছু না ব'লে চোখ দুটি নীচু করলে শুধু।

কি হবে পিপারমিণ্ট?

মা পান দিয়ে খাবে।

মৃদুস্বরে কথা কটি ব'লে পিপারমিণ্ট নিয়ে চ'লে গেল মেয়েটি।

অন্তরা আর একবার বসল টেবিলে। আর একবার মাসিক-পত্রখানা ওলটালে। গল্প পড়বার চেষ্টা করলে একটা। বিস্বাদ। কবিতা আরও বিস্বাদ।···উঠে দাঁড়াল। জানলার শার্শির একটা ফাটা কাচ জোড়া হয়েছিল পুরোনো চিঠি দিয়ে। সেইটে পড়ল খানিকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে।···দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ার চিঠি·· বিধবা...চেহারাটা মনে পড়ল···গোলগাল ফরসা বেঁটে হাসিখুশি মানুষটি। নিজের দুর্ভাগ্যকে অতি সহজভাবে মেনে নিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছেন সেটাকে, তা দিয়ে জীবনের স্রোতকে অবরুদ্ধ করেন নি···আনন্দের ধারা বইছে অবারিতভাবে, চোখে মুখে কথায় হাসিতে উপচে পড়ছে তা, অথচ কোনও আতিশয্য নেই, সহজ সুন্দর আনন্দ। "জীবন" বলতে পাশ্চাত্য ধরনে আমরা যে পশুজীবন বুঝি, তার কোন আস্ফালন নেই। সেটা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এক বেলা আহার, পরনে থান, কখন ঘুমোন কখন জাগেন—কেউ জানতে পারে না, মৈথুনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেই গেছে, ও-কথা ভাবেও না বোধ হয়। আধুনিক অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা মোটেই নেই, একেবারে নিরক্ষর। আধুনিক মাপকাঠিতে এত ছোট যে মানুষটি, সে কিন্তু যেখানে থাকে সেখানটা পরিপূর্ণ ক'রে রাখে, সুরভিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আধুনিকামনা অন্তরা দূর-সম্পর্কের এই দুর্গাদিদির সঙ্গ পাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠল মনে মনে। দুর্গাদিদিকে কাছে পেলে সব কথা খুলে বলা যেত হয়তো, তিনি হয়তো বুঝতেন

তার কথা। কোথায় আছেন এখন···অনেক দিন আগে এসেছিলেন একবার··· ফিরে গিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, মানে লিখিয়েছিলেন পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে···উত্তর দেওয়া হয় নি।···কাটা কাচের সবটা জোড়া যায় নি কাগজ দিয়ে ···চিড়-খাওয়া খানিকটা অংশে সূর্যালোকে রঙ ধরেছে···গৈরিক রেখার পাশে অতি-সরু রক্তের আভাস কাঁপছে থরথর ক'রে···বাইরে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর···

ভারতবর্ষের নির্ভীক আত্মার সত্য-রূপটি ওরই মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। তর্কের বিষয় নয়, জানি। অনুভব করছি। হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-নেকটাই-পরা বিদেশী-বুলি-মুখস্থ-করা চাকরের দল ভারতে জন্মেছে ব'লেই কি ভারতীয় ওরা? তিলক-ফোঁটা কেটে টিকি-নামাবলী উড়িয়ে সংস্কৃত মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছে যে আর এক-জাতীয় তোতাপাখির দল, তারাই কি ভারতীয়? জাতীয়তার অভিনয় ক'রে বিজাতীয় বুলি আওড়াচ্ছে যারা, তারাই কি? কিছুই করছে না যারা—অন্ধ মূঢ় জনতার দল, যাদের দুঃখে আমরা অহরহ অভিভূত হয়ে বক্তৃতা-বিলাসের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছি ক্রমাগত, ওই যে শত-করা নিরেনব্বই জন, যারা জন্মাচ্ছে আর মরছে ক্ষুধায় হাহাকার ক'রে লোভে লালায়িত হয়ে রোগে ভুগে ভুগে, যে কোন বক্তার বক্তৃতায় উত্তেজিত হচ্ছে, পুলিসের হুমকিতে পালাচ্ছে, কাবুলীর কাছে ধার করছে, তাড়িখানায় হল্লা করছে, তারা সংখ্যাতে বেশি ব'লেই কি ভারতীয় নামের যোগ্য? না। আর্য বৌদ্ধ মুসলমান ক্রিশ্চান সভ্যতার বহুবিধ বিপর্যয়েও বিভ্রান্ত হয় নি যে ভারতীয় আত্মা, তার স্বরূপ কেবল ওরই মধ্যে ফুটেছে, অন্তরার মনে হ'ল। ওই চিড়-খাওয়া কাচের মধ্যে সূর্যালোকের মত, ভেঙেছে কিন্তু মরে নি, রূপান্তরিত হয়েছে ইন্দ্রধনুতে। পুলিসের ব্যাটনে মাথা ফাটাতে পারে, কিন্তু সেই ফাটল বেয়ে যা বেরুবে তা রক্ত নয়—লাভা-স্রোত, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত নিরুদ্ধ উত্তাপ ···চিড়-খাওয়া কাচের ফাটলে ওই ক্ষীণ রক্তের আভাসে ভেসে ভেসে এসেছে, যেমন আসে জ্বলন্ত সূর্যের বার্তা কোটি মাইল দূর থেকে।

গাড়িটা এসে কাছারিতে যখন দাঁড়াল, তখন অন্তরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। আদালতের বিবিধ বৈচিত্র্য হঠাৎ যেন একটি ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হ'ল সহসা, তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সবিস্ময়ে নির্নিমেষে। নীরব প্রশ্নও একটা মূর্ত হয়ে উঠল সে দৃষ্টিতে—তুমি এখানে হঠাৎ? আস না তো কোনদিন!

চাকরকে দিয়ে গাড়ি ডাকিয়ে সে যখন তাতে চ'ড়ে বসেছিল, তখন সে যেন অন্য লোকে ছিল, এ অদ্ভুত আচরণের অস্বাভাবিকতা তখন চোখে পড়ে নি তার।

গাড়ি ডাকিয়ে অবিলম্বে আদালত অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটাই বরং সঙ্গত মনে হয়েছিল তখন। ওই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও তো খবর পাওয়া সম্ভব নয়। এখন সহসা সে উপলব্ধি করলে, জবাবদিহি করতে হবে একটা। জবাবদিহি না করলে···কিন্তু কি বলবে? মিছে কথা বানিয়ে বলতে হবে একটা? কিন্তু কি বলবে?···মাথায় কিছু এল না; অসহায়ভাবে জনতার দিকে চেয়ে ব'সে রইল সে। যে ঘরটায় তার স্বামীর আদালত, তার সামনে খুব ভিড়···

"রামু মণ্ডল হাজির হো—"

চিৎকার ক'রে উঠল আরদালী।

বিচার হচ্ছে। তার স্বামী বিচারক।

তার সমস্ত মুখ নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। বহু দূরের বহু যুগ পরের অনাগত ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন···সেখানে তার বিচারক স্বামী নেই। অংশুমান? কই, সেও সেখানে নেই। জনতার মধ্যে নেই, নির্বাচিত সুধীদের মধ্যেও নেই। কোথায় সে?···বিরাট বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র একটা, কুচকুচে কালো জল, তার মধ্যে একটা লাল দ্বীপ ··প্রবাল নয়, জমাট রক্ত···বহু যুগের প্রচুর রক্ত জ'মে কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু কালো হয় নি, টকটকে লাল আছে এখনও। সেই দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে অংশুমান একা...মৃত রক্ত কণিকাদের জাগাতে চেষ্টা করছে, ভাবছে, তারা না জাগলে তো সবই বৃথা···

এ কি, বউদি, আপনি এখানে?

নবীন উকিল একটি। ভাব হয়েছে ছেলেটির সঙ্গে কিছুদিন থেকে তার স্বামীর। কমিউনিজম্‌এ আস্থাবান, ভাল ব্রিজ-খেলোয়াড়, মিহি খোশামোদও করতে পারে।

বাজারে যাচ্ছি।

এত ঘুরে?

বীণাদের বাড়িও যাব।

ঠিক সময় মিথ্যে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়াতে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু আগেও মনে পড়ে নি যে, বীণাদের বাড়িটা কাছারির সামনেই। বীণারা সেদিন এসেছিল, গেলেও বেমানান হবে না। কিন্তু সে যাবে না। অজুহাতটা খাড়া করতে পেরে স্বস্তি অনুভব করলে একটু।

বীণারা আজ কলকাতা গেছে সকালের ট্রেনে—

ও, তাই নাকি?

একটু ঝুঁকে গাড়োয়ানকে বললে, তবে বাজারে চল।

গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, তখন দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ অনিবার্য প্রশ্নটা সে ক'রে বসল, আচ্ছা, জেলে নাকি মারধোর করছে?

আপনি কোথা থেকে শুনলেন?

কে যেন বলছিল।

খবর তা হ'লে র'টে গেছে! ওসব খবর কি চাপা থাকে কখনও?

সত্যি তা হ'লে?

উকিল মানুষ, কথায় কিছু বললেন না, কিন্তু মুচকি হাসিতে যা প্রকাশ করলেন তা কথাব চেয়েও স্পষ্টতর। বন্দী হৃৎপিণ্ডটা অনেকক্ষণ থেকেই পঞ্জরকারায মাথা কুটছিল, হঠাৎ সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য।

মফস্বল শহরের বন্ধুর পথে ধুলো উড়িয়ে চলেছে ছ্যাকড়া গাড়িটা। অসাড় অবসন্ন দেহে ব'সে আছে অন্তরা। মন কিন্তু উড়ে চলেছে ঝ'ড়ো হাওয়ার মুখে হালকা মেঘের টুকরোর মত···অদৃষ্ট অতীত থেকে অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকে···

অনেকক্ষণ পরে সামনে এলোমেলো নানা জিনিসের স্তূপ দেখে বিস্মিত হ'ল সে একটু। এগুলো···তখনই মনে পড়ল, নিজেই সে কিনেছে এগুলো বাজারে ঘুরে ঘুরে। ফিতে, চিরুনি, তেল, সাবান, টফি, চায়ের পেয়ালা। খদ্দরের টুকরোটাও চোখে পড়ল। এ বাড়ির কেউ পরবে না জেনেও এটা সে কিনেছে। ওই খদ্দরটুকুকেই বার বার তুলে সযত্নে পাট করতে লাগল সে। ওই খদ্দরের টুকরোর মধ্যেই তার স্পর্শ যেন সে খুঁজতে লাগল। ধরবার মত হাতের কাছে আর তো কিছু নেই···

...অপরাহ্ণ। পড়ন্ত রোদের একফালি এসে ঢুকেছে জানলার ভিতর দিয়ে। পড়েছে তার কোলের উপর। জানলার ধারে চুপ ক'রে ব'সে আছে অন্তরা বাইরের দিকে চেয়ে। বড় একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, চিরকালই সে একা। জীবনে ভিড় জুটেছে, সঙ্গী জোটে নি কখনও। বিশাল সমুদ্রে তৈলকণিকার মত তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে সে কেবল, মিশ খায় নি। সারা জীবন তবু ভান করতে হচ্ছে। নিজের কাছেও। আশেপাশে কেউ নেই। দূর থেকে লোকে দেখে, একটি তারার ঠিক পাশেই আর একটি তারা।···কিন্তু দুটি তারার মাঝে কোটি কোটি যোজনের ব্যবধান। ঠিক পাশে কেউ নেই—শুধু শূন্যতা···

নীহার সেন ডেপুটি হয়েছে ব'লেই যে মত বদলেছে, তা নয়। এখনও সে মনে প্রাণে কমিউনিস্টই আছে। ক্যাপিটালিস্টদের অধীনে চাকরি নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। পেটের দায়ে, সংসারের চাপে। পারিপার্শ্বিককে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলই তো জীবনযাপনের বিজ্ঞান এবং আর্ট। জীবনটা যখন যুদ্ধ, তখন কখনও আক্রমণ, কখনও সন্ধি, কখনও আপোস, কখনও বিরোধ—এ তো হবেই। উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হ'ল। উদ্দেশ্য তার ঠিক আছে। তা ছাড়া এখন···ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সঙ্গে বিরোধিতার কোন হেতু নেই। ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটিশ এখন অ্যাণ্টি-ফাসিস্ট···চার্চিলকে হাত মেলাতে হয়েছে স্টালিনের সঙ্গে। হাত মিলিয়েছে যখন, তখন ঝগড়া নেই আর আপাতত। চাকরি নেওয়ারও কোন বাধা নেই। শুধু তাই নয়, ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ শাসন-বিভাগে চাকরি নেওয়াটা প্রয়োজনও। আগস্ট-ডিস্টার্বেন্সের অর্থ তো পরিষ্কার। ফাসিস্ট জাপানকে আমন্ত্রণ। সেটা যে মারাত্মক। এ মূঢ়তাকে প্রতিরোধ করতেই হবে সুতরাং যেমন ক'রে হোক। আপাতদৃষ্টিতে যতই রূঢ় হোক তার আচরণ, যতই কঠোর হোক সমালোচনা (তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত সংকীর্ণদৃষ্টি স্বদেশ-ভক্তদের ফেনায়িত উচ্ছ্বাসের ধার ধারে না সে), দেশের মঙ্গলের জন্যই এসব দৃষ্টিকটু ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে হবে এখন···রোগীর মঙ্গলের জন্য যেমন তার ফোড়াটায় ছুরি চালাতে হয়, তেমনই জনতার উপর গুলি চালানোই দরকার এখন জনতার মঙ্গলের জন্যে। লোকে যাই বলুক, দেশের এ অবস্থায় স্যাবটেজ মারাত্মক, যেমন ক'রেই হোক দমন করতে হবে।

নীহারবাবু বাইরের ঘরে একা ব'সে ফাইল ক্লিয়ার করতে করতে চিন্তা করছিলেন। আজকাল যখনই একা থাকেন, এই চিন্তাটা তাঁকে পেয়ে বসে। প্রতিপক্ষ কেউ নেই, তবু মনে মনে তর্ক করতে হয়। একা পেলেই চিন্তাটা চুপিচুপি চোরের মত এসে মনের মধ্যে ঢোকে, তর্ক জুড়ে দেয়,...কিছুতেই এড়াতে পারেন না।

দমন করতেই হবে যেমন ক'রে হোক।—আর একবার মনে মনে আওড়ালেন নীহার সেন। আউড়েই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। দ্বিজেন চক্রবর্তীকে দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে।···লোকটা কতক্ষণ এখন বকবক করবে কে জানে! পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, তা ছাড়া একসঙ্গে প'ড়েও ছিলেন কলেজে। সুতরাং তাড়িয়ে

দেওয়া যাবে না সহজে।

কি হচ্ছে? ফাইল ক্লিয়ার? তোমরা খাসা আছ! আমাদের যে কি দুর্দশা…

কি রকম?—একটু কৌতূহল প্রকাশ করতেই হ'ল নীহার সেনকে।

পরশু দিনকার ঘটনাটাই ধর না। একটা নতুন থানায় বদলি হয়েছি, চার্জ নিতে না নিতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জরুরি হুকুম—ওই এলাকায় মিলিটারি নিয়ে গিয়ে একটা গ্রাম খানাতল্লাসী করতে হবে। যারা রেল-লাইন উপড়েছিল, তারা নাকি সেখানে লুকিয়ে আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করবার উপায় নেই। স্টেশনে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সমস্ত ট্রেনখানাই মিলিটারি, মায় ড্রাইভার পর্যন্ত। কম্যাণ্ডিং অফিসারই তার মালিক, কোথায় কখন থামাতে হবে তা ড্রাইভারকে বলা আছে আগে থাকতে। তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হ'ল। বি. এ. পাস করেছি তো, ইংরেজীতে নেহাত কাঁচাও ছিলাম না, কিন্তু ভাই, তাদের একটি কথাও বুঝতে পারি না প্রথমে। ঘুচঘাচ ক'রে কি যে বলে বোঝাই যায় না কিছু। কথা বলে আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচোয়। মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ি শুধু। কি আর করব? একটু পরে বুঝতে পারলাম, গাল দিচ্ছে—আমাদের দেশের লোককে গাল দিচ্ছে। অকথ্য ভাষায়। সন অব এ বিচ, সন অব এ গান, নিগার্‌স, ব্যাস্টর্ড্‌স্—এই সব হল মৃদুতম। এই চলল খানিকক্ষণ। অনবরত সিগারেট টানছে, মদ-মারছে, বিস্কুট চিবুচ্ছে আর আমাদের গাল দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারবার পরও মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে যাই। উপায় কি? কোথায় ট্রেন থামাবে তা আমাকে বলবে না। যদিও আমি পুলিস তাদের সপক্ষে আছি, কিন্তু আমি কালা আদমী যে, আমাকে বিশ্বাস করবে কি ক'রে? একটা ম্যাপ খুলে নিজেই ঠিক করছে সব। কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা থেমে গেল হঠাৎ মাঠের মাঝখানে। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, দু দিকে মাঠ। সায়েব বললে, এইখানে নাবতে হবে। বললাম, এখানে? এখানে নেবে কি হবে, এখানে রাস্তা কোথা? সাহেব বললে, মাঠ ভেঙেই যাবে তারা। সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে হবে। ম্যাপ দেখে বললে, মাইল খানেক গেলেই নাকি সেই গ্রামে পৌঁছানো যায়। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি, কিচ্ছু চিনি না, কারও সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত হয় নি। আমার ঈষৎ ইতস্তত ভাব দেখে সায়েব রূঢ়কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, গেট ডাউন, গেট ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড লীড আস। নাবলাম, মানে নাবতে হ'ল। ভাগ্যে কাছে একটা

টর্চ ছিল। তারই সাহায্যে কোন রকমে ছেঁচড়ে-মেচড়ে তার টপকে মাঠে গিয়ে পড়লাম। আল ধ'রে ধ'রে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, নালা রয়েছে একটা। সোল্‌জারগুলো গাড়ি থেকে নেবে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ। আমি নালার একটা সরু অংশ দেখে লাফিয়ে পার হয়ে গেলাম, তার পর চেঁচিয়ে বললাম, কাম অন দেন। মাঠের মধ্যে নাবল সবাই, বেয়নেট উঁচিয়ে আল ভেঙেই ছুটতে লাগল ব্যাটারা। কিন্তু টর্চ ছিল না ব্যাটাদের, নালাটা দেখতে পায় নি, হুড়মুড় ক'রে পড়ল এসে তার মধ্যে। কিন্তু কিছু কি গ্রাহ্য করে ব্যাটারা! জল কাদা ভেঙে দেখতে দেখতে এপারে এসে উঠল সব। আমি ততক্ষণ ভেবে-চিন্তে উপায় বার ক'রে ফেলেছিলাম একটা, বুঝলে···

এতক্ষণে থামলেন দ্বিজেন চক্র। একবার কথা বলতে আরম্ভে করলে থামেন না তিনি সহজে। এখনও থামতেন না, কিন্তু সিগারেট ধরাবার প্রয়োজন হয়েছিল। ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন করা ছাড়া আর কোন উপায়ে বিরক্তি প্রকাশ করা নীহার সেনেরও সাধ্যাতীত, মার্জিতরুচি ভদ্রলোক তিনি। তাঁর কুঞ্চিত-ভ্রূ দ্বিজেনবাবু লক্ষ্যও করলেন না বোধ হয়। সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করলেন তিনি—

উপায় একটা বার ক'রে ফেলেছিলাম, বুঝলে। কাছেই একটা বাগান ছিল, সম্ভবত আমবাগানই। সাহেবকে বললাম, তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এই বাগানে একটু অপেক্ষা কর, আমি দু-একজন লোক যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি। আমি কালই এখানে বদলি হয়েছি, পথঘাট ভাল চিনি না, তা ছাড়া ভিতরের খবরটা প্রথমে একটু জানলে সুবিধেই হবে। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি লোক যোগাড় ক'রে আনি। সাহেব সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে ব্যস্ত, তার এ সন্দেহও হয়তো হ'ল যে, আমি বোধ হয় আসামীদের সতর্ক করাতে যাচ্ছি। অনেক কষ্টে তাকে বোঝালাম যে, আমরা সার্‌প্রাইজ অ্যাটাকই করব, কিন্তু এলোপাতাড়ি অ্যাটাক করলে অনর্থক একটা প্যানিক হবে, কাজ হবে না। বিভীষণ একটা যোগাড় করতে যদি পারি সুবিধে হবে। অনেক কষ্টে রাজী হ'ল লোকটা। আমি তাদের সেখানে রেখে বিভীষণ যোগাড় করতে বেরুলাম। সোজা খানিকক্ষণ হাঁটবার পর রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, থানা কোন্ দিকে? থানার রাস্তাই জানা ছিল না আমার। সে একটা রাস্তা বাতলে দিয়েই স'রে পড়ল, খাকী পোশাক দেখে সে আর বেশিক্ষণ কাছে থাকা নিরাপদ মনে করলে না। প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে

থানায় পৌঁছলাম। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি। যিনি আমার জায়গায় ছিলেন, তাঁর সেই দিনই সন্ধ্যের ট্রেনে চ'লে যাবার কথা। গিয়ে দেখি, সবাই স্টেশনে গেছে তাঁকে সি-অফ করতে। থানা ভোঁ-ভাঁ। একটি লোক নেই। আমি ভেবেছিলাম, থানার কন্‌স্টেব্‌লদের সাহায্যে যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু গিয়ে দেখি, জনপ্রাণী নেই। অনেক হাঁকাহাঁকির পর চৌকিদার বেরুল একটা। তাকেই সঙ্গে নিয়ে সেই গ্রামটার নাম ক'রে বললাম, চল্ ওই গ্রামেই 'রোঁদ' দেব আজ। তুই সঙ্গে থাক্ আমার। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। আবার মাইল দুই হণ্টন। গ্রামে পৌঁছে দেখি, একেবারে নিষুতি। কেউ জেগে নেই, এক কুকুরগুলো ছাড়া। তারাই ঘেউঘেউ ক'রে সম্বর্ধনা করলে এবং সর্বক্ষণ পিছনে লেগে রইল। চৌকিদারকে বললাম, ডেকে তোল্ একজন কাউকে। কাকে হুজুর ? যাকে হোক। একটা কুঁড়েঘরের সামনে অনেক সোরগোল ক'রে একটা জীর্ণশীর্ণ লোককে টেনে তুললে সে। স্বয়ং দারোগা সাহেব দ্বারদেশে সমুপস্থিত শুনে লোকটা তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেল, তার পর উঠেই সেলাম ক'রে ফেললে একটা—

দ্বিজেন চক্রবর্তী হা-হা ক'রে হেসে উঠতেই নীহার সেন বুঝতে পারলেন, দ্বিজেন মদ খেয়েছেন। ভ্রূ আর একটু কুঞ্চিত হ'ল। দ্বিজেনের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। নীহার ভাবতে লাগলেন, আগে তো খেত না, ধরলে কবে ?

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার শুরু করলেন দ্বিজেনবাবু, সেলাম ক'রে লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল ক'রে। তার পর বার দুই ঢোঁক গিলে সসঙ্কোচে বললে, হুজুর ডেকেছেন আমাকে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, চল্ আমার সঙ্গে। চৌকিদারকে বললাম, তুমি থানায় যাও, আমি আসছি একটু পরে। চৌকিদার থানার দিকে চ'লে গেল, আমি চলতে লাগলাম সেই আমবাগানের উদ্দেশে। এবার পলাশীর আমবাগান নয়, জাফরগঞ্জের আম বাগান। হা—হা—হা—

নেশাটা জ'মে এসেছিল দ্বিজেন চক্রবর্তীর। আবার একটা সিগারেট ধরালেন তিনি।

হনহন ক'রে চলতে লাগলাম। লোকটা কুকুরের মত পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। এত রাত্রে কোথায় কি উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছি তাকে, তা জিজ্ঞেস করবার সাহস পর্যন্ত হ'ল না লোকটার। ভাগ্যে হয় নি···

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আপন মনেই হসেলেন একটু মুখ নীচু ক'রে।

বাগানের অন্ধকারে বীর ব্রিটিশ সৈন্যরা বেয়নেট উচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সারি সারি আমার প্রতীক্ষায়। সেখানে ঢুকে টর্চটা জ্বাললাম দপ ক'রে, বেয়নেটগুলো চকচক ক'রে উঠল। ক্যাপ্টেন সাহেব এগিয়ে এলেন। তাকে চুপি চুপি বললাম, লোক পেয়েছি একজন। তার পর সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি বাঁচতে চাও? ভয়ে কথা সরছিল না তার মুখে, হাত জোড় ক'রে থরথর ক'রে কাঁপছিল শুধু সে। ঠিক তার দুদিন আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মিলিটারি রেড হয়ে গেছে। লোক মারা গেছে, ঘর পুড়েছে, নারীধর্ষণ হয়েছে। যারা পালাবার পালিয়েছে। নিতান্ত অপারগ যারা, তারাই আছে এখনও। এ লোকটা পরে শুনলাম, কালাজ্বররোগী। একে ফেলে পালিয়েছে সবাই। এর ছেলে কোথায় চাকরি করে, তার আশায় ভিটে আঁকড়ে প'ড়ে আছে ও। আমার "বাঁচতে চাও" প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে সে শুধু বললে, হুজুর মা-বাপ। আমি বললাম, দেখ বাপু, ওসব ব'লে কিছু লাভ নেই। যারা রেল-লাইন উপড়েছে, তাদের ঘর দেখিয়ে দিতে হবে—যদি দাও বাঁচবে, তা না হ'লে মৃত্যু। গুলি ক'রে এরা মেরে ফেলবে তোমাকে, কারও কথা শুনবে না। আমি কিছুই জানি না।—করুণকণ্ঠে বললে লোকটা। তা হ'লে মর। লোকটা চুপ ক'রে রইল। অশিক্ষিত বোকা লোক কিনা, মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও চুপ ক'রে রইল। আমি শিক্ষিত এবং চালাক, বুদ্ধি বাতলে দিলাম! বললাম, ওরে ব্যাটা, যে কোনও ঘর দেখিয়ে দে না, তা হ'লেই হবে, কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবি? ক্যাপ্টেন সাহেব অধীর হয়ে উঠছিলেন, আমাদের কথা একবর্ণ বুঝতে পারছিলেন না, গজরাচ্ছিলেন আর হাতঘড়ি দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি হিরোয়িক কাণ্ড ক'রে বসলেন একটা। আচমকা লোকটার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিলেন 'ব্লাডি সোয়াইন' ব'লে। লোকটা প'ড়ে গেল। তার পর উঠেই দৌড়। অন্ধকারে কোথায় সে স'রে পড়ল খুঁজে পেলাম না আর। টমিগুলোও অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। ক্যাপ্টেন সাহেব ক্ষেপে উঠল, মনে হ'ল আমাকেই মেরে বসে বুঝি! বললাম, সাহেব, ঘাবড়াচ্ছ কেন? খবর যোগাড় ক'রে এনেছি, চল আমার সঙ্গে, এস। নিয়ে গেলাম। গিয়ে কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হ'ল। কয়েকটি বুড়ী আর রুগী ছাড়া গ্রামে আর কেউ নেই, সব পালিয়েছে। সশস্ত্র ব্রিটিশবাহিনী নিরস্ত হ'ল না তবু। রুগীগুলোকেই ঠ্যাঙাতে লাগল। মারের চোটে একটা ছোঁড়া রক্ত-বমি করতে শুরু করলে; শুনলাম, থাইসিস। একটা টমি একটা বুড়ীরই কেশাকর্ষণ করছে

দেখলাম। অনেক কষ্টে থামাই তাদের, শেষকালে তারা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে সোনাদানা যা পেলে পকেটে পুরে ব্রিটিশ-প্রতাপের মর্যাদা রক্ষা করলে কতকটা। আর—

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুম হয়ে ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ দ্বিজেনবাবু।

নীহার সেনের কুঞ্চিত-ভ্রূ মসৃণ হয় নি। মুখে ফুটেছিল মৃদু হাস্যরেখা। দ্বিজেনের সব কথা শুনছিলেন তিনি, কিন্তু বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছিল না। স্থির জলাশয়ের জল যেন। উর্মির চাঞ্চল্যও নেই। সূর্যের আলো, মেঘের ছায়া, উড়ন্ত পাখির প্রতিবিম্ব, নক্ষত্রের দীপালী, জ্যোৎস্নার সমারোহ সবই জলে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু জলের জলত্ব নাশ করতে পারে না। ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ হবার পরও জল জলই থাকে। নীহারের প্রসারিত চেতনার উপর তেমনই দ্বিজেন চক্রবর্তীর বর্ণনাটা পরিস্ফুট হ'ল, কিন্তু রেখাপাত করল না। অনুরূপ একটা ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠল বরং। তিনি নিজেই সে ঘটনার নায়ক। একটা গ্রামে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে গিয়েছিলেন। সে গ্রামে পোস্ট-অফিস থানা স্টেশন সব পুড়েছিল। ঘাটে একটা মালবোঝাই ফ্ল্যাট ছিল, সবাই লুট করেছিল সেটা। সুতরাং দশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা অন্যায় হয় নি কিছু। দ্বিজেনের কথা শুনতে শুনতে সেই সম্পর্কে কয়েকটা মুখচ্ছবি পর পর ফুটে উঠল মনে। প্রায়ই ফুটে ওঠে। ভদ্রলোক সব। ডাক্তার জমিদার ব্যবসাদার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বেয়নেট-ধারী মিলিটারি পরিবৃত হয়ে সারিবদ্ধ ব'সে আছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। ভীত, অসহায়। লুটপাট তারা করে নি তা ঠিক, কিন্তু টাকা তাদের দিতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। না দিলে সম্পত্তি নিলাম ক'রে নেওয়া হবে। গ্রাম্য ডাক্তারের দৃষ্টিটা মনে পড়ল, জ্বলছিল যেন। জমিদারের ম্যানেজারটা সেলাম ক'রে খোশামোদ করবার চেষ্টা করছিল। চতুর ব্যবসাদার ঘুষ দেবার প্রস্তাব করছিল আকারে ইঙ্গিতে। বৃদ্ধ গৃহস্থ বেচারা কাঁদছিল। নীহার সেন কিন্তু টলেন নি। পাই পয়সা পর্যন্ত আদায় ক'রে এনেছিলেন। এসব ব্যাপারে টললে চলে না। শেষ লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, তা হ'লে সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ছোটখাটো এমন অনেক কাজ করতে হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে অমহৎ, কিন্তু শেষ লক্ষ্যের মাপকাঠিতে যাচাই করলে ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় তা অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় অবশেষে। লেনিন মানব-প্রেমিক ছিলেন, মনে মনে তিনি যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন, তা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সেই সমাজকে বাস্তবে মূর্ত

করতে গিয়ে নরহত্যায় পশ্চাৎপদ হন নি তিনি। হ'লে চলে না। লক্ষ্যে পৌছনো যায় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ মানুষের ওইখানে তফাৎ। ···দ্বিজেন চক্রবর্তীর কথা শুনতে শুনতে এই সব মনে হচ্ছিল নীহার সেনের। বিচলিত হন নি তিনি, বিচলিত হন নি মোটেই, বিচলিত হতে চান না।···সহসা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, মনে মনে চিৎকার করছেন তিনি। তাঁর নিজেরই সত্তাটা যেন দু ভাগ হয়ে গেছে, এক ভাগ আর এক ভাগের সঙ্গে তর্ক করছে চিৎকার ক'রে। চমকে উঠে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তার পর দ্বিজেনের মুখের দিকে চাইলেন একবার আড়চোখে। মনে হ'ল, কিছু বলা উচিত।

কর্তব্য অনেক সময় কঠোর হয়ই, কি আর করা যাবে···

কর্তব্য? তাই নাকি! তোমার তো কর্তব্যপরায়ণ ব'লে নাম রটেছে খুব, তুমিও অনুভব করছ তা হ'লে! ভাল।

দ্বিজেনের মুখখানা হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল।

এইবার চুটিয়ে কর্তব্য করব ব্রাদার, বুঝলে। এতদিন ডালে ডালে ছিলাম, এবার পাতায় পাতায় বেড়াব। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—কোথায় পড়েছিলাম বল তো? মরুক গে। মোট কথা, চুটিয়ে কর্তব্য করব এবার। প্রোমোশন হয়েছে, শুধু তাই নয়, আই. বি-তে বদলি হয়েছি। সেই সুখবরটাই দিতে এসেছিলাম। উঠি এবার, ফাইল ক্লিয়ার কর তুমি। এক কাপ চা-ও তো অফার করলে না! মিসেস এখানেই তো? গান-টান শোনা যাচ্ছে না যে বড়?

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন দ্বিজেন চক্রবর্তী।

দ্বিজেনের কথায় নীহারের নূতন ক'রে আবার মনে পড়ল, সত্যি, অন্তরা আজকাল বড় বেশি রকম নীরব হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গানে হাসিতে পূর্ণ ক'রে রাখত সে বাড়িটা। আজকাল সাড়াশব্দই পাওয়া যায় না। বাড়ির কোন্ কোণে প'ড়ে থাকে, বোঝাই যায় না যেন। নিয়মিত কর্তব্য সমাপন ক'রে যায় নিক্তির ওজনে নিখুঁতভাবে। মনে হয়, ভেতরের মানুষটা কোথায় চলে গেছে। প'ড়ে আছে শুধু দেহ-যন্ত্রটা। যে অন্তরা একদিন তাঁর প্রেমে পড়েছিল, সে অন্তরা কোথায়? সে যে অন্তর্হিত—এ কথা নীহারের অন্তর্যামী যে বুঝতে পারে নি, তা নয়। কিন্তু অন্তর্যামী ছাড়াও মানুষের মনে আর একজন থাকে, যে অন্তর্যামীর কথা বিশ্বাস করতে চায় না, প্রমাণ চায়। নীহারের মনের এই দ্বিতীয় সত্তাটি প্রমাণ সংগ্রহ করতেও ব্যগ্র নয়। অন্তর্যামী-

আহরিত নিগূঢ় সত্যটি তিনি কেবল অবিশ্বাস করতে চান। অন্তরা তাঁকে আর ভালবাসে না—এ কথা কিছুতেই মানতে চান না তিনি। ইদানীং কিছুদিন থেকে যদিও তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অন্তরার সবটা তিনি পান নি, অন্তরার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কি আছে যা তাঁর আয়ত্তাতীত, বা কিছুতেই তাঁর নিজের নাগালের মধ্যে, তাঁর বিশেষ অধিকারের মধ্যে ধরা দেয় না, ইচ্ছে ক'রে যে লুকিয়ে রেখেছে তা নয়, অন্তরা সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে দিয়েছে (নীহার এই বিশ্বাসটাকেই আঁকড়ে আছেন প্রাণপণে), তিনিই—নীহারই তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে পারেন নি। সূর্যের কিরণ যেন। তাঁরই বাতায়ন-পথে এসে তাঁরই ঘর আলোকিত করেছে, তবু তাঁর নয়। বেলা শেষ হ'লেই চ'লে যাবে, রাখা যাবে না কিছুতে। আকাশ যেমন দিগন্তরেখায় পৃথিবীকে স্পর্শ ক'রে আছে মনে হয়, অথচ কত দূরে···গাছের ফুলকে ছিঁড়ে এনে ফুলদানিতে, এমন কি 'বাট্‌ন্‌হোলে' গুজে রাখলেও ফুলের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করা যায় না যেমন কিছুতে, অন্তরা সম্বন্ধে এই ধরনের একটা বোধ তাঁর হৃদয়কে আকুল ক'রে তোলে ; যদিও ইদানীং কিন্তু অন্তরা তাঁকে আর ভালবাসে না—এ কথা স্পষ্টভাবে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না তিনি। অন্তর্যামীর মুচকি হাসির উত্তরে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি জবাব দেন—আমি ওকে সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছি না, সেটা আমার নিজেরই অক্ষমতা, ও তো নিজেকে উজাড় ক'রেই দিয়েছে। —এই সিদ্ধান্তে এসে শান্তি পেলেন নীহার সেন আবার। তাঁর অন্তরের সুনিভৃত অন্ধকার গুহায় বুভুক্ষু হিংস্র একটা পশুর দুই চক্ষে লেলিহান যে শিখাটা ধকধক ক'রে জ্বলছিল তা যে আরও প্রখর হয়ে উঠল, নীহার সেন টের পেলেন না সেটা। পাবার কথাও নয়। গুহাটার সামনে মার্জিত চিন্তাধারার ঠাসবুনোনি পরদাখানা ঝুলছিল। সেটা তুলে ধ'রে আত্মবিশ্লেষণ করবার উৎসাহ ছিল না নবীন ডেপুটি নীহার সেনের। সময়ও ছিল না। সামনে স্তূপাকার ফাইল। ছুটির দিন, তবু ছুটি নেই। নীহার সেন ফাইলে মন দিলেন।

পাশের ঘরে অন্তরা শুয়ে ছিল। ঘুমুচ্ছিল না, চোখ বুজে প'ড়ে ছিল। তার আপাত-স্থৈর্যের অন্তরালে যে তুমুল আলোড়ন চলছিল, তার ঠিক স্বরূপটা নিজেও সে ঠিক করতে পারছিল না। ভয়, কৌতূহল, স্বাধীনতা-স্পৃহা, চক্ষু-লজ্জা, বিদ্রোহ, সামাজিক কর্তব্য, নীহারের প্রতি মমতা এবং বিতৃষ্ণা—বহু বিচিত্র পরস্পর-বিরোধী মনোভাব প্রবল-হৃদয়াবেগের ঘূর্ণিপাকে তার মনে যে

আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে এমন কিছুই সে খুঁজে পাচ্ছিল না যা নির্ভরযোগ্য, যাকে অবলম্বন ক'রে সে দাঁড়াতে পারে সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে। তুমুল ঝঞ্ঝার মাঝখানে অন্ধকারে সে ছুটে চলেছিল একটা সত্য আশ্রয়ের আশায়, যেখানে তার মন নির্ভয় হবে। যে ভিত্তির উপর সে তার স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করেছিল, তা ন'ড়ে উঠেছে। স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে পড়েছে। তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তবু? নিজেকে বারম্বার এই একই প্রশ্ন ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু থামতে পারছিল না। মনের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে একটা উত্তরও আসছিল, ঠিক উত্তর নয়, পালটা প্রশ্ন আর একটা—ত্যাগ করবে কোন্ অজুহাতে, ত্যাগ ক'রে যাবেই বা কোথায়? এ প্রশ্ন কিন্তু তার প্রথম প্রশ্নকে নিরস্ত করতে পারছিল না কিছুতে। সঙ্গে সঙ্গে এও সে ভারছিল, যা সে আপাতদৃষ্টিতে দেখছে, তাই কি নির্ভরযোগ্য? কিছুদিন আগে যে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সে নীহারের মধ্যেই জীবনের সঙ্গীকে আবিষ্কার করেছিল, সেই বিচার-বুদ্ধিটাই কি নির্ভরযোগ্য? স্বামীর কর্তব্যে নীহারের তো এতটুকু অবহেলা নেই, তাকে বিয়ে ক'রে বরং নিজের আত্মীয়সমাজে সকলের বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি কমিউনিস্ট হয়ে ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেণ্টের অধীনে কেন তিনি চাকরি করছেন তার সপক্ষে নীহারের যুক্তির অভাব নেই, যুদ্ধের প্রয়োজন হ'লে শত্রুর সঙ্গেও আপোস করতে হয়। ক্যাপিটালিজ্‌মের পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ অহরহ চলেছে, এটা তার অংশমাত্র। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখেই অধুনা ক্যাপিটালিজ্‌মের মিত্রের ভূমিকায় অবতরণ করতে হয়েছ কমিউনিস্টদের। এসব কথা নীহার বহু বার বলেছেন, সে বহু বার শুনেছে। এর যৌক্তিকতাও সে অস্বীকার করতে পারে নি—বস্তুত এ নিয়ে তর্কই করে নি সে, নীহার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বার বার নিজের যুক্তিটা আস্ফালন করেছেন তার কাছে কারণে-অকারণে। যুক্তির দিক দিয়ে এসব কথা অকাট্য হ'লেও অন্তরের অন্তস্তলে অযৌক্তিক কি যেন একটা বাষ্পাকারে উঠে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে যুক্তির স্পষ্টতাকে। মনে হচ্ছে যুক্তিই কি জীবনের সব, জীবনযুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করাটাই মানব-জীবনের শেষ কথা, আর কিছু নেই? সামান্যতম পশুর আর বৃহত্তম মানুষের জীবন-দর্শনে কোন তফাত থাকবে না? এক-একবার এও মনে হচ্ছে, দাম্পত্যজীবনে রাজনীতিকে এত বড় স্থান দেওয়ার প্রয়োজন কি?...রাজনৈতিক মতবাদ থাকুক না বৈঠকখানার সুসজ্জিত সোফায় ব'সে...তর্কাতর্কি চলুক না সেখানে, তার আলোড়ন অন্তঃপুরের

শান্তিকে বিঘ্নিত করবে কেন? তখনই আবার ভাবছে, আমার এ দাম্পত্য-জীবন যে ওই সূক্ষ্ম মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত! সমাজের অন্তঃপুর আর এর অন্তঃপুরে আকাশ-পাতাল তফাত যে! এর সবটাই অন্তঃপুর, বৈঠকখানা নেই। সমাজ এ জীবন আমার ঘাড়ে জোর ক'রে চাপিয়ে দেয় নি, আমি নিজে জেনে এ জীবনকে বরণ করেছি। যে আদর্শ স্বপ্ন-জীবনকে মূর্ত করতে চেয়েছিলাম এত সাধ ক'রে, বাস্তবের এক আঘাতে সেই স্বপ্নটাই যদি চুরমার হয়ে গেল, তা হ'লে আর বাকি রইল কি? আদর্শ···স্বপ্ন···এই তো জীবনে চেয়েছি। কৌশল নয়, বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, রূপ নয়, অর্থ নয়, চেয়েছি মহত্ত্ব, বীরত্ব, আত্মত্যাগ। ডেপুটিগৃহিণী হয়ে সকলের উপহাসের খোরাক যোগানোই যদি এর পরিণতি হয়, তা হ'লে লক্ষপতি ধনীর দুলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী যে নাদুস-নুদুস ব্যক্তিটির সঙ্গে তার বাবা প্রথমে সম্বন্ধ করেছিলেন, তার গলায় মালা দিলেই তো হ'ত। জীবন-যুদ্ধের আইন অনুসারে বেশি সঙ্গত কাজই হ'ত। কিন্তু তা না ক'রে সে রূপকথালোকের রাজপুত্রকে বরণ করেছিল···মিনুকে রাগের মাথায় অন্য কথা লিখলেও নীহার তার চক্ষে রূপকথালোকের রাজপুত্রই ছিল সেদিন, যে রাজপুত্র আসাধ্যসাধন করবে, ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলবে সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে। জীবন-যুদ্ধের কৌশলে সেই রাজপুত্র সহসা রূপান্তরিত হয়ে গেল উপহাসাস্পদ কেরানীতে। হতে পারে না···কিছুতে হতে পারে না···

নীহার সেন তন্ময় হয়ে রায় লিখছিলেন। অসহায় কয়েকটা মুখ চোখের উপর ভাসছিল। অভাব—হ্যাঁ, অভাবই আসল কারণ, শুধু অর্থাভাব নয়, শিক্ষারও অভাব। লোকগুলোর চোখে পশুর দৃষ্টি, মানুষের নয়—ক্যাপিটালিস্ট সমাজের দুর্বল মানুষ-পশু। সুস্থ জীবন যাপন করবার সুযোগ পায় নি, চুরি করতে হয়েছে···তা ছাড়া···ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল নীহার সেনের। সত্যি লোকগুলো চুরি করেছে কি?···একের পর এক এতগুলো লোক একবাক্যে যে কথা ব'লে গেল, উকিলের জেরায় টলল না, সে কথা বিশ্বাস করলে চুরি করেছে স্বীকার করতে হয়। এতগুলো লোকের কথা অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। কিন্তু মকদ্দমা দাঁড় করাবার জন্যে পুলিস যে মিথ্যে সাক্ষী সৃষ্টি করে, এ তো জানা কথা। সেদিন একজন পুলিস-অফিসার বলেছিলেন, নিছক সত্যের উপর নির্ভর করতে গেলে কোন দোষীকে সাজা দেওয়া যায় না। আইনের এমনই গড়ন যে, দোষীকে সাজা দিতে হ'লেও সত্যের খানিকটা অপলাপ করতেই হবে। এই আইনের সহায়তা করেছেন তিনি! সাক্ষীর

উপর যেখানে সব নির্ভর করছে, এবং সে সাক্ষী পুলিস যখন নিজের খুশিমত তৈরী করতে পারে তখন…অসহায় লোকগুলোর নিষ্প্রাণ দুর্বল দৃষ্টি আবার মনে পড়ল তাঁর…ওই দুর্বল দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসারও কিছু আভাস ছিল।…সুযোগ পেলে ওরা প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না…হয়তো ওরা নির্দোষ। কিন্তু 'হয়তো'র উপর নির্ভর করতে গেলে কাজ চলে না। পৃথিবীতে সব আইনে ফাঁক আছে, সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ট্রেনে কলিশন হয় জেনেও আমরা ট্রেনে চড়ি। বিবেকের তীক্ষ্ণ চঞ্চু ঠোকর মেরে মনে যে ক্ষতটা করেছিল, এ কথা মনে হওয়াতে তাতে একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল যেন। না, এতগুলো সাক্ষীকে অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। ওদের পক্ষের উকিল তো কম জেরা করে নি। কলম চলতে লাগল নীহার সেনের। সব কটার সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে দিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, যে ডেপুটি যত বেশি সাজা দিতে পারে, চাকরিতে তার নাকি তত বেশি উন্নতি হয়! দু-চারটে উদাহরণও মনে পড়ল। পিওন চিঠি দিয়ে গেল। বাই জোভ, গুজব নয় তা হ'লে, সত্যিই সে রায় সাহেব হয়েছে। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি মনটা শ্রদ্ধাগদগদ হয়ে উঠল…পর-মুহূর্তেই লজ্জা হ'ল, তখনই বিদ্রোহের সুর জাগল আবার…অনুপস্থিত প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য ক'রে মনে মনে আবৃত্তি করলেন—তুমি পাও নি, ঠাট্টা করছ তাই…আঙুর আর শিয়ালের গল্পটা মনে পড়ছে। এতে লজ্জারই বা কি আছে, আমি তো চাই নি, আমার যোগ্যতার জন্য যেচে ওরা দিয়েছে। ক্লাসে যেমন ফার্স্ট প্রাইজ পেতাম। আর একটা সুখবরও ছিল চিঠিতে। সদরে বদলি হয়েছেন তিনি। অন্তরা খুশী হবে বোধ হয়। এই মফস্বলের বুনো আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছে বেচারা। তাই বোধ হয় অত মুষড়ে পড়েছে। আমি কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ওর সঙ্গে গল্প করার পর্যন্ত সময় পাই না—ও-বেচার সময় কাটে কি ক'রে! একটা রেডিও সেট কিনতে হবে এবার। এখনই উঠে গিয়ে অন্তরাকে সুসংবাদটা দিয়ে আসবেন কি না ভাবছিলেন, এমন সময় দরজাটা খুলে অন্তরা নিজেই এসে দাঁড়াল। চোখে অদ্ভুত রকম একটা উন্মুখ দৃষ্টি।

আমার একটা কথা রাখবে?

কি?

চাকরিটা ছেড়ে দাও তুমি। দেবে?

মজ্জমান লোক যে আগ্রহভরে ভাসমান কাঠের টুকরোটাকে অপলকা

জেনেও আঁকড়ে ধরতে যায়, সেই আগ্রহ ফুটে উঠল অন্তরার চোখের দৃষ্টিতে। আবেগভরে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

নীহার সেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

১৫

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অংশুমান চুপ ক'রে শুনছিল।

হার্ৎজ্ বলছিলেন, ব্যাটনের আঘাতটা তোমার মাথায় লেগেছে, তুমি কষ্টও পেয়েছ খুব—এ কথা আমি মানছি। আমি শুধু তোমাকে সেই পুরাতন সত্যটা আবার নূতন ক'রে উপলব্ধি করতে বলছি যে, আমাদের অনুভূতির সীমানা বড় সংকীর্ণ। আমরা যতটা অনুভব করতে পারি, তার বাইরেও ঢের জিনিস আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, যা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর, তারও রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। সাধারণ আলো রূপান্তরিত হয় ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণমহিমায়, সামান্য একটা পরকলার ভিতর দিয়ে দেখলে। সুতরাং অনুভূতির বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে ধ'রে কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কষ্ট পাচ্ছি যে। যা পাচ্ছি তা মানতেই হবে।

আনন্দও পেতে পার, যদি তোমার অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে বিশেষ একটা পরকলার ভিতর দিয়ে চালিত করতে পার।

কোথায় পাব সে রকম পরকলা ?

তোমার মনের ভিতরই আছে। খুঁজে দেখ। পরকলা শুধু কাচেরই হয় না, মানসিকতারও হতে পারে। একটা বিশেষ ধরনের মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে গেলে যন্ত্রণাও যে আনন্দদায়ক হতে পারে, তার প্রমাণ স্যাডিজ্‌মে। বিকৃত মনোভাব হিসেবে ওটা অনেকের কাছে ধিক্কৃত, বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু কোন কিছুই ধিক্কৃত নয়। তা ছাড়া ইতিহাসে যাঁরা মার্টার ব'লে পুজো পান, তাঁরা কোনও অলৌকিক শক্তি-বলে শারীরিক বেদনাকে মানসিক বিলাসের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন হয়তো। তোমাদের দেশেই সেকালে রাজপুত-রমণীরা জহরব্রত করতেন, এখনও চড়কপুজোয় অনেকে পিঠের চামড়ায় লোহার বঁড়শী বিঁধিয়ে বাঁশের ডগায় ঝোলেন শুনেছি। এঁরা নিশ্চয়ই কোন উপায়ে যন্ত্রণাকে মাধুর্যে রূপান্তরিত করতে পারেন, তা না পারলে—

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন হার্ৎজ্।

দেখ, স্নায়ুতন্ত্রীগুলো আঘাতের তরঙ্গগুলোকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে বেদনা-বোধের কেন্দ্রে আলোড়ন তোলে, তাই না আমরা বেদনা বোধ করি। সেগুলো আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে গিয়ে আলোড়ন তুললেই আমরা আনন্দ বোধ করব। যোগাযোগ ঘটানো অসম্ভব কি?—ঘনসন্নিবিষ্ট চাপদাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ক্ষণপরেই আলো চকমক ক'রে উঠল চোখের দৃষ্টিতে।

দেখ, ফ্যারাডের স্বপ্নকে ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল ভাষা দিয়েছিলেন। তিনি অঙ্ক ক'ষে দেখিয়েছিলেন যে, আলো আর বিদ্যুৎতরঙ্গ একই জাতের জিনিস, একই ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মের বিভিন্ন রূপ—ইলেক্‌ট্রিকাল লাইন্‌স্ অব ফোর্স একটি মিডিয়মে মাত্র চলে, তার নাম ঈথর—যা সর্বব্যাপী, যা প্রত্যেক জিনিসের অণুপরমাণুর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, অনেকটা তোমাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত এই ঈথর প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ক'রে রেখেছে —এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তরঙ্গ বহন করে এই ঈথরই। আমি হাতেকলমে প্রমাণ করেছিলাম সেটা। এখন আমাদের অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে যদি ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভ ব'লে মনে কর—খুব সম্ভব তাই ওরা—তা হ'লে তাদের বহন করবার জন্যে স্নায়ুতন্ত্রীর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সর্বব্যাপী ঈথর আছে। সুতরাং তার সাহায্যে বেদনার কম্পনগুলোকে আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেই চেষ্টা কর তুমি। তোমাকে এই এক্স্‌পেরিমেণ্টটা করতে বলেছি এই জন্যে যে, আঘাত পেলেই তুমি যদি কাবু হয়ে পড়, তা হ'লে যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ সে পথে অগ্রসর হতে পারবে না; কারণ যে পথেই তুমি চল না কেন, আনন্দই হ'ল প্রধান পাথেয়। তোমার সশস্ত্র শত্রু অজস্র আঘাত করবে—ওই ওদের একমাত্র শক্তি—ওদের আঘাতকে তুমি যদি আনন্দে রূপান্তরিত করতে পার, তা হ'লেই তোমার জয়। পারবে না কেন?—Theoretically it is quite possible। আকাশের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক তরঙ্গ রেডিও সেটে ঢুকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে, বেদনার অনুভূতিই বা আনন্দের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হবে না কেন মস্তিষ্কের মত অমন একটা বিস্ময়কর যন্ত্রে প্রবেশ ক'রে? চেষ্টা কর, হবে ঠিক।

হার্ৎজ্ চ'লে গেলেন।

অংশুমান অন্ধকারে চুপ ক'রে বিমূঢ়ের মত ব'সে রইল। অকারণে আচমকা মার খাওয়ার পর থেকে তার সমস্ত মন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে।

একটা হিংস্র পশুকে বন্দী ক'রেও লোকে তাকে এমন অকারণে মারে না। জেলে নাকি বিদ্রোহের স্থচনা হয়েছিল! কয়েকজন কয়েদী নাকি জেলারকে তাড়া করে! ইলেকট্রিকের তার কেটে দিয়েছে! কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, রাজনৈতিক বন্দীরাও সংশ্লিষ্ট আছে এতে। তাই এই শাসন।

একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা কে যেন মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে ক্রমাগত। ঘুরিয়েই চলেছে—একদণ্ড বিরাম নেই—অসহায় পশুর মত সহ্য করতে হচ্ছে—উপায় নেই কোনও।

আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে। অসম্ভব যে নয় তা সে নিজেই জানে, কিন্তু নিজেকেও সে জানে যে! আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করতে হয়—এই তার শিক্ষা। অপমানে জর্জরিত হয়ে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিঘাত করবে ব'লেই সে একদা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির নিষ্ঠুর চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা জেনেও। এই প্রত্যাশিত চাপে আর্তনাদ করছে কেন তবে? নির্বিকার থাকতে পারছে না কেন? নির্বিকারই থাকতে পারছে না যখন, আনন্দে রূপান্তরিত করবে কি ক'রে তাকে? হার্‌ৎজের এ উপদেশ পালন করবে কি ক'রে সে? পারলে যুদ্ধজয় স্থনিশ্চিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে যখন সচেতন হ'ল, তখন নিজের ক্ষুদ্রতায় সে সঙ্কুচিত। অযোগ্য, অমুপযুক্ত। সামান্য পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দেবার অতি-পরিমিত সামান্য শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি তার নেই, তাই হাহাকার ক'রে মরছে সারাক্ষণ। মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিষ্পিষ্ট কীটের মতই মরতে হবে এবার। কীটের মতই মনোভাব, কীটের মতই দুর্বল, কীটের মতই মরতে হবে। আত্মিক শক্তি—মহাত্মা গান্ধী যে শক্তির উপর আস্থাবান, হার্‌ৎজ্‌ যে শক্তির কথা ব'লে গেলেন, সে শক্তির চর্চা তো সে করে নি কোনদিন। তার সন্ধানও জানে না। যে আত্মিক শক্তির বলে মানুষ পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব-লোকে উঠে গেছে··· হঠাৎ দধীচির কথা মনে পড়ল— নিজের অস্থি দান ক'রে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন ···এটা কিসের রূপক?···অনেকক্ষণ এই কথাই ভাবলে সে। রূপকের মর্মোদ্ধার হ'ল না, সমস্ত অন্তর জুড়ে ঘনিয়ে উঠল একটা ক্ষোভ। যে ভারতবর্ষে তার জন্ম, সে ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। পাশবিক শক্তির তুচ্ছ আস্ফালন মুগ্ধ হয়ে মনুষ্যত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পশু ছাড়া আর কিছু হয় নি সে। তাও অতিশয় হীন পশু···অতিশয় ছোট।

ছোট জিনিস তুচ্ছ নয়। আমি অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ ধরেছিলাম অতি ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে। গ্যালিনার উপর সরু একটি তার···

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তার পর সাহস হ'ল যেন। ঘোর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল অন্ধকারে, নির্ভর-যোগ্য আত্মীয়ের দেখা পেয়ে শুধু যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা নয়, ম্লানায়মান আত্ম-বিশ্বাসের জ্যোতিটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সহসা অন্তরে। মনে হ'ল, পারব।

জগদীশচন্দ্রও বললেন, ভারতবাসী তুমি, নিজেকে হীন ভাবছ কেন এতটা? তুমি হীন নও। অমৃতের পুত্র তুমি। আদিত্যবর্ণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে উপনিষদের ঋষিকেও তমসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভয় কি, অন্ধকার থাকবে না, আলো দেখা দেবে, সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাক শুধু।

সত্যকে?—সাগ্রহে ব'লে উঠল অংশুমান, কোন্‌টা সত্য ব'লে দিন আমাকে। কাকে আমি আশ্রয় করব, আমি আশ্রয় খুঁজছি।

সত্য কি, তা কেউ কাউকে বলে বোঝাতে পারে না। নিজে সেটা উপলব্ধি করতে হয়। যেটা মিথ্যা ব'লে মনে হচ্ছে, সেইটে পরিহার ক'রে চল শুধু। সত্য-সন্ধানের সেই একমাত্র উপায়। অনেক মিথ্যা সত্যের মুখোশ প'রে থাকে, তাদের চিনতে দেরি হয়, কিন্তু সন্ধানী বেশিদিন প্রতারিত হয় না। রূপে রূপে বহুরূপে যিনি বিচিত্র, জীবনে ও মরণে যিনি নিত্য, সেই স্বয়ম্প্রভ স্বতন্ত্র সত্যের নির্লিপ্ত রূপ দেখতে পাবেই, যদি তোমার নিষ্ঠা আর আকুলতা থাকে।

আমি যে পথের পথিক, সে পথেও কি এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রয়োজন? আমি চাই ক্ষমতা, শত্রুকে শাসন করবার শক্তি—

সত্যের কোন জাতিভেদ নেই। সত্যই শক্তি। আলোকে ভাসমান ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত প্রাণী, আকাশের অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য, শিকারের উপর ঝম্পনোন্মুখ শার্দুল, লজ্জাবতীর সঙ্কোচ, কুমুদিনীর নিশি-জাগরণ, বনচাঁড়ালের নৃত্য, উদ্ভিদের হৃৎকম্পন, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত যা কিছু তা শক্তির বিকাশ, এবং তার মূলে আছে সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তাও এরই মধ্যে নিবদ্ধ। কোন পথই এর বাইরে নেই। যম নচিকেতাকে বলেছিলেন—তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন···সকল দেবতা এঁর মধ্যেই প্রবিষ্ট—এঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। জড়, জীব, উদ্ভিদ, প্রাণী, বিদ্যুৎ, আলো—সমস্ত অনুশীলন ক'রে সকলের মধ্যে যে বিরাট ঐক্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে বুঝেছি যে, আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনশীল ব'লে মনে হ'লেও

অন্তর্নিহিত সত্য এক এবং অভিন্ন। এবং এ উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তিনি অজেয়।...

বলতে বলতে ধীরে ধীরে অন্তর্নিহিত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল, যাচ্ছি যাচ্ছি, তোমরাই কাছে, সত্যপথে অনিবার্য গতিতে—

তার পরদিন সকালেই অংশুমান খবর পাঠালে যে, সে দোষ স্বীকার করবে। তার স্বীকারোক্তি শুনতে এলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেন! ঠিক আগের দিন তিনি সদরে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

১৬

শেষরাত্রি!

ঘন কুয়াশায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে পরিচিত ছিল, তা অবলুপ্ত হয়েছে। কুহেলিকা নয়, যেন প্রহেলিকা। জীবনের কোন লক্ষণ কোথাও নেই, বৈচিত্র্যহীন, সব একাকার! বিরাট একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহকে মুড়ে রেখেছে যেন কে—চাদরটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অস্তমান শশীর পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় হাসি নেই, আছে সকরুণ আক্ষেপ। নীরব ভাষায় যেন বলছে, তোমরা যখন জাগবে তখন আমি থাকব না, আমার সময় ফুরিয়েছে, আমি চললাম। একটা সবেদন সান্ত্বনাও যেন ক্ষরিত হচ্ছে ম্লানায়মান সেই আলো থেকে। চন্দ্র অস্ত গেল। ধার-করা আলোর জ্যোতিটুকুও নির্বাপিত হ'ল। নিবিড় অন্ধকার। মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী...কালের প্রবাহও থেমে গেছে...নিস্পন্দ অসাড় সব...বিরাট একটা অন্ধ জঠর গ্রাস ক'রে জীর্ণ করছে যেন চরাচর নিখিল বিশ্ব। আশার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই ব'লে মনে হচ্ছে যখন, তখন অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল একটা। তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে বাঁশি বেজে উঠল অন্তরীক্ষে। সু-উচ্চ দেবদারু-শাখাসীন শকুন্ত আলোকের অরুণাভাস দেখতে পেয়েছে পূর্বদিগন্তের চক্রবাল-রেখায়। এসেছে, সে এসেছে। নিস্পন্দ স্পন্দিত হ'ল, অসাড়ের সাড়া জাগল। নিষ্প্রাণ ঘুমন্ত পুরীতে লাগল যেন সোনার কাঠির স্পর্শ। সহস্রকিরণের সহস্র স্বর্ণশরজালে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুয়াশার মোহ-আবরণ। স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হতে লাগল চতুর্দিক। পাহাড়ের চূড়া জাগল, দেখা দিল বনস্পতির শীর্ষদেশ, মন্দিরের ললাটে পড়ল আলোকের তিলক, কলরব ক'রে উঠল পক্ষীকুল বন থেকে বনান্তরে। ফুল ফুটল, হাওয়া বইল, অনুরূপ বর্ণবিচ্ছুরিত শোভাযাত্রায় প্রবেশ করল আলোকের বিজয়-রথ। প্রভাত হ'ল।

মোটরের চারটে টায়ারই ফেটেছে।

পথের অনেকখানি জুড়ে ঘন ঘন লোহার পেরেক পোঁতা। আশেপাশে কোন গ্রাম নেই, চারিদিকে ধু-ধু করছে মাঠ। আমরা যে এই পথ দিয়ে যাব, তা কি ক'রে জানলে ওরা, কে ওদের খবর দিলে ?—ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু বিস্মিত হবার চেষ্টা করলেন নীহার সেন। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করছিল, একটু ঝুঁকে সেটাতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন, পট ক'রে হাফপ্যাণ্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল একটা। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাড় কপাল মুছলেন ভাল ক'রে। হাতঘড়িটা দেখলেন একবার। আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। সহসা চোখের উপর হাতটা একবার বুলোলেন, বুলিয়েই ভুলটা বুঝতে পারলেন। ছবিটা চোখের সামনে নেই, মনের ভিতর আঁকা হয়ে গেছে। কতকগুলো পা, মোটর-লরি থেকে ঝুলছে—মড়ার পা। মিলিটারির গুলিতে মরেছে। মোটর-লরিতে বোঝাই ক'রে এই কিছুক্ষণ আগে সেগুলোকে ফেলে আসা হ'ল ওই নদীতে। প্রকাণ্ড মাঠটার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে নদীটা। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নীহার সেন। যদিও নদীটা দেখা যাচ্ছিল না, দেখা যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তবু চেয়ে রইলেন পাগুলো ঝুলছিল—দশ বারোটা পা। হঠাৎ রাগ হ'ল—অনির্দিষ্ট ধরনের রাগ। তার পর সেটাকে নির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকেই কেন এ অপ্রীতিকর কাজটা দিলেন এত লোক থাকতে ? তাঁকে বদলি ক'রে আনার কি দরকার ছিল মফস্বল থেকে ? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলছিলেন, তিনি বেশি কার্যদক্ষ—ক্রাইসিসের সময় 'এফিশেণ্ট' অফিসার দরকার। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, মিলিটারিদের গুলি চালাবার হুকুম দেওয়া ছাড়া দক্ষতা দেখবার আর কোন উপায় নেই। সত্যিই নেই, সবাই কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—জেলের কয়েদীরা পর্যন্ত। দু-দুজন জেলের অফিসারকে খুন ক'রে পুড়িয়ে ফেলেছে, ফায়ার করবার অর্ডার না দিলে কি রক্ষা ছিল কারও ? সমস্ত জেলখানাটা পুড়িয়ে ফেলত। জন চল্লিশ মরেছে—বেশ হয়েছে—ক্রিমিনাল গুণ্ডা যত। আর একটু রাগবার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু পাগুলো আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে—দ্রুত ধাবমান লরির পিছন থেকে ঝুলছে। রাগটা একটু ফিকে হয়ে গেল। মনে হ'ল, কই, এতদিন তো ওরা বিদ্রোহ করে নি, নিশ্চয় রাজনৈতিক বন্দীদের ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। অংশুমানের মুখটা মনে পড়ল।

অদ্ভুত ছেলে! চোখের দৃষ্টিতে কোন উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, উত্তেজনা নেই। পরিপূর্ণ শান্তিতে স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি। নির্বিকার চিত্তে স্বীকার করলে যে, ডেপুটির অমানুষিক অত্যাচারে বিচলিত হয়ে সে তাকে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে। এর জন্যে সে একটুও অনুতপ্ত নয়, এতদিন মিথ্যে কথা ব'লে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে ব'লেই সে অনুতপ্ত। তার মৃত্যুর জন্যে সে-ই সম্পূর্ণ দায়ী, আর কাউকে জড়াতে সে চায় না। অকম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করলে যে, সে একাই দায়ী; অকম্পিত হস্তে সই ক'রে দিলে স্বীকার-পত্রে। মুখের ভাব শান্ত, স্নিগ্ধ। বাইরে থেকে কিছু বোঝাবার উপায় নেই এদের। আগেও অনেকবার দেখেছিলেন একে তিনি, কতবার তাঁর বাড়িতেই এসেছে। মুখচোরা ভালমানুষ ব'লে মনে হ'ত। ভাবতেই পারা যায় নি তখন যে, এই লোক আগস্ট-ডিস্টার্বেন্সের পাণ্ডা হয়ে জলজ্যান্ত একটা লোককে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। এতদিন ধ'রে ক্রমাগত দোষ অস্বীকার ক'রে এসেছে—হিমশিম খেয়ে গেছে এতগুলো ঝানু দারোগা। সবাই হার মানল যখন, তখন হঠাৎ নিজে যেচে দোষ স্বীকার করছে। অদ্ভুত! ভয় পেয়ে করছে যে, চোখের দৃষ্টি থেকে তা মনে হয় না। মিলিটারি ফায়ারিং হবার আগেই স্বীকার করেছে। না, ভয় নয়—আসলে ওরা ··আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিন্তা করতে লাগলেন, এই ধরনের লোককে ঠিক কোন্ শ্রেণীতে ফেললে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। কারও প্রতি অবিচার করতে চান না নীহার সেন, প্রত্যেক জিনিসকে ঠিক প্রপার পার্স্পেক্টিভে ফেলে বিচার করাই তাঁর রীতি—একটু ভেবে তাই ঠিক করলেন, না, ঠিক ক্রিমিনাল ওরা নয়, বাহাদুরি করবার জন্যেও এসব করে নি, আসলে ওদের মনের সমতা নেই, আন্ব্যাল্যান্স্ড্ মাইণ্ড—এরাই বোধ হয় পাগল হয় শেষ পর্যন্ত। একটু দুঃখ হ'ল—ছেলেটা পড়াশোনায় ভাল ছিল নাকি···

আর কত দেরি হে?

এখনও বহুৎ দেরি হুজুর। চার-চারটে টায়ার—। হাসিমুখে জবাব দিলে ড্রাইভার।

আকাশে বেশ মেঘ করেছে। ঘন-নীল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ছেলেবেলার একটা কথা মনে প'ড়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁদের একটা ময়ূর ছিল। মেঘ দেখলে ময়ূরটা পেখম তুলে নাচত, আর নাচত তাঁর ছোট বোন মালতী। গানও গাইত একটা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে।

ময়ূরটা উড়ে পালিয়ে গেল একদিন। মালতীও মারা গেছে! হঠাৎ মনে হ'ল, বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশের দিকে চাইলেন একবার। শঙ্কা ঘনিয়ে এল চোখের দৃষ্টিতে। অসহায়ভাবে চারদিকে চাইলেন—ধু-ধু করছে ফাঁকা মাঠ—কোথাও আশ্রয় নেই—মনে হ'ল, আশ্রয় থাকলেও কেউ কি অভ্যর্থনা করত তাঁকে? মোটরে উঠে বসলেন।

আকাশে বহু বিচিত্র মেঘ থাকলে অকাশটা যেমন চোখে পড়ে না, তেমনই নানা চিন্তার ভিড়ে আসল চিন্তাটা আড়ালে প'ড়ে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্তরা চ'লে গেছে। কোথায়, কেন, কিছুই ব'লে যায় নি। ভ্রূকুঞ্চিত করে অপটুভাবে শিস দেবার চেষ্টা করলেন। হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস উঠল একটা।

১৪

চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটাকে লঘু-হাস্যভরে উড়িয়ে দিলেন যখন নীহার সেন, তখন অন্তরার দাম্পত্য-নীড়ের শেষ খড়টুকুও যেন উড়ে গেল। যে ডালে সে নীড় ছিল, সেই ডালটাকে আঁকড়ে থাকবার আর কোন অজুহাত সে আবিষ্কার করতে পারলে না। সেটা ভদ্রভাবে ত্যাগ ক'রে যাওয়াই স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল তার। আদর্শকেই সে বরণ করেছিল, নীহার সেনকে নয়। নীহারের চেয়ে দেশই তার কাছে বড়। কোন ইজ্‌মের খাতিরে সে দেশদ্রোহী হতে পারবে না। প্রথম যৌবনে কমিউনিজ্‌মের যে স্বপ্ন তার কল্পলোকে মূর্ত হয়ে ছিল, তা আজও অম্লান আছে—সে কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি দেশ—দেশেরই দরিদ্র জনসাধারণ। তাদের উপর গুলি চালাবার, তাদের অবলা নারীদের ধর্ষণ করবার যে যুক্তি নীহারকে মুগ্ধ করেছে, সে যুক্তি নিয়ে নিজের মতে নিজের পথে সে একাই চলুক। প্রত্যহের কুশাঙ্কুর সহ্য ক'রে সে ও-পথে সঙ্গী হতে পারবে না।...

একটা ছোট স্যুটকেসে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সে গুছিয়ে নিলে। স্যুটকেসটা পরে ফেরত দিলেই হবে। কিছু টাকাও নিযে যাচ্ছে, সেটাও ফেরত দিতে হবে। চিঠিও লিখতে হবে একটা পরে। নিহার নীজের পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাক, আমি স'রে দাঁড়ালাম তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই না ব'লে...এই সব লিখতে হবে।—আরও অনেক কথা লিখতে হবে।...

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু নীহারের কথাই মনে হতে লাগল বার বার। বিদ্বান বুদ্ধিমান তর্কপটু রাজনৈতিক নীহারকে নয়। সেই অসহায় পুরুষটাকে, যার

অন্তরা না থাকলে এক দণ্ড চলে না; তাকে, যে দাড়ি কামিয়ে বুরুশটা ধুতে ভুলে যায়, হাতঘড়িটা হারায় ক্ষণে ক্ষণে, আপিসের কাগজ কোথায় রাখে ঠিক থাকে না। মনে পড়ছিল, মায়া হচ্ছিল; কিন্তু আর ফিরবে না সে। মা-বাবাকেও সে কম ভালবাসত না, কিন্তু নীহারের জন্য তাদেরও ছেড়ে এসেছিল একদিন। আদর্শের জন্যেই নীহারকেও ত্যাগ করতে হ'ল। কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু সে আর ফিরবে না। স্টেশনের দিকেই চলেছিল সে হাঁটাপথে। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। কলকাতায়ই যাওয়া যাক আপাতত। হঠাৎ মনে হ'ল, তার আদর্শকে রূপ দেবে কে? অংশুমান? সে তো নাগালের বাইরে, জীবনে আর হয়তো দেখাই হবে না। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে—দ্রুতবেগে চলতে লাগল অসমতল কঙ্করাকীর্ণ পথে। সমস্ত দেহ-মন একাগ্র হয়ে উঠল যেন। কেন, কিসের উদ্দেশ্যে, তা সে বুঝতে পারলে না। চলতে লাগল শুধু, দ্রুতবেগে চলাটাই একমাত্র করণীয় ব'লে মনে হ'ল। যেতে হবে—কোথায় সে আদর্শলোক জানা নেই—তবু যেতে হবে। চলতে লাগল। অনির্দিষ্ট নামহীন একটা আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে টেনে নিয়ে চলল তাকে।

মনের প্রত্যক্ষ প্রদেশে কিন্তু যে হাহাকারটা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগল, জীবনে সে কাউকে ভালবাসতে পারে নি, এক নিজেকে ছাড়া। সে ভালবাসা চেয়েছে, ভালবাসা পেয়েছে ব'লে ভান করেছে, মাঝে মাঝে উতলা হয়েছে, স্বপ্নকে জড়িয়ে ধরতে গেছে—কিন্তু আসলে পায় নি কিছু। সত্যি যদি ভালবাসা পেত, তা হ'লে কেরানী স্বামী নিয়েও সুখী হ'ত সে। ভালবাসার স্পর্শে দাসত্বও মহনীয় হয়ে উঠত। হৃদয়সিংহাসন শূন্যই আছে, কোনও মহারাজার স্পর্শে ধন্য হয় নি তা এখনও। কোথায় সে মহারাজা, কবে আসবে, কোন্ গুণে চেনা যাবে তাকে? একটি গুণই তো সে চেয়েছে সারা প্রাণ দিয়ে, সারাজীবন শ্রদ্ধেয় হবে সে—যার পায়ে সমস্ত দেহ-মন উজাড় ক'রে দেবে, তার মহত্ত্ব যেন মেকি না হয়—দুদিন যেতে না যেতেই তার গিলটি ধরা না পড়ে! বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান নয়, ধনী নয়, রূপবান নয়, সে চেয়েছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে—যার মহত্ত্বের ঔজ্জ্বল্যে মরচে পড়বে না কখনও। তখনই মনে হ'ল, তার নিজের কি এমন গুণ আছে যে, এমন খাঁটি সোনার দাবি সে করতে পারে অসঙ্কোচে? কি মূল্য দেবে সে—এর যোগ্য মূল্যই বা কি? মনের ভিতর থেকে উত্তর এল, আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে সে। কিন্তু কোথায়—কি ভাবে?...

আরে, রোকো রোকো···

গর্জন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটরটা।

মিসেস সেন ? কোথায় চলেছেন ? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে আমি।

মোটর থেকে নামলেন ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী।

এক মুখ হেসে প্রশ্ন করলেন, কোথায় চলেছেন ?

এই ট্রেনে কলকাতা যাব।

ও, তা হ'লে তো আরও সুবিধে হ'ল। আমিও যাচ্ছি কলকাতা। ট্রেনের এখনও দেরি আছে আধ-ঘণ্টাটাক। স্টেশনে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা সেরে যাব ভেবেছিলাম। আপনিও কলকাতা যাচ্ছেন, ভালই হ'ল। আসুন তা হ'লে, উঠুন। স্টেশনেই যাওয়া যাক সোজা—

আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার ?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে অন্তরা। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল একটু।

রাদার ইণ্টারেস্টিং—ধীরে সুস্থে বলব এখন। সঙ্গেই তো যাচ্ছেন ! উঠুন। আপনার জিনিসপত্র কই ?

এই ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু নেই।

আসুন। মিস্টার সেন সদরে জয়েন করেছেন গিয়ে ?

হ্যাঁ।

আপনি যাচ্ছেন কবে ?

আমার কলকাতায় একটু দরকার আছে। সেটা সেরে তার পর যাব।

আই সি। আসুন।

ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ ক'রে। ঠিক আগের স্টেশনে কামরাটা খালি হয়ে গেছে। ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী ও অন্তরা ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই। একটা কপাট খারাপ, ভাল ক'রে বন্ধ হয় না। দ্বিজেনবাবু সেটাকে ভাল ক'রে খুলে দিয়ে তার সামনেই বসেছেন নিজের ট্রাঙ্কের ওপর, ভালভাবে হাওয়া পাবেন ব'লে। তাঁর মনে হ'ল, এইবার কথাবার্তা শুরু করা যাক, পরের স্টেশনে আবার লোক উঠবে হয়তো।

একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে মিসেস সেন। আই হোপ, ইউ উইল স্পিক দি ট্রুথ—অংশুমান বাবুকে আপনি কি সাহায্য করেছিলেন কিছু ?

অন্তরার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল।

সাহায্য? কি রকম সাহায্য?

আর্থিক।

না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে দ্বিজেন চক্রবর্তী বললেন, আমরা কিন্তু একটা বাড়ি সার্চ ক'রে এক সেট জড়োয়া গয়না পেয়েছি, তার প্রত্যেকটাতে নাম খোদাই করা আছে—অন্তরা সেন।

অন্তরার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু সে সপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য অন্তরা সেন থাকাও সম্ভব।

কোয়াইট, খুবই সম্ভব। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু যে দোকান গয়নাগুলো বিক্রি করেছে, গয়নার গায়ে দোকানের নামও ছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, এক আপনি ছাড়া অন্য কোন অন্তরা সেনকে গয়না বিক্রি করে নি তারা।

আমার সে গয়নার স্যুট্ চুরি হয়ে গেছে।

কবে?

ঠিক মনে নেই।

পুলিসে খবর দিয়েছিলেন?

না।

দেন নি কেন?

পুলিসের ওপর আস্থা নেই ব'লে।

আপনার স্বামী কি এই চুরির কথা জানতেন?

তিনি রাগারাগি করবেন---এই ভয়ে তাঁকেও জানাই নি।

দ্বিজেন চক্রবর্তীর মুখ হাস্য-প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে উঁকি দিতে লাগল প্রচ্ছন্ন কৌতুক। পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, অন্তরার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলছে। এক ঝলক হেসে বললেন, কিন্তু আপনার বান্ধবী কম্‌রেড মিনা দত্তকে এসব কথা লেখেন নি তো?—সে চিঠিখানাও দেখেছি আমি।

অন্তরায় চোখ দুটো দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল।

দ্বিজেনবাবু বললেন, আই অ্যাম সরি, কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হ'ল। কর্তব্যের খাতিরে, বিলিভ মি। মিস্টার সেন, আই হোপ, উইল অ্যাপ্রি-সিয়েট মাই লাভ ফর ডিউটি।

একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল চোখ দুটোতে। অন্ধকার ভেদ ক'রে ট্রেন ছুটতে লাগল।

১৯

অন্ধকারে একা ভাবছিল অংশুমান।

…ওরা ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবে। বার বার নিয়েছে, এবারও ছাড়বে না। ছাড়বে না, কারণ ওরাও ভীত। ভীত বন্য বরাহ যেমন দুরন্ত বেগে তেড়ে আসে, নখদন্ত বিস্তার ক'রে বাঘ যেমন সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ীর বুকে, সাপ যেমন ফণা তোলে, এরাও তেমনই নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করবে আমাদের। ভয় পেয়েছে ব'লেই অস্ত্র চালাবে, চোর যেমন ছোরা চালায়। না, ছাড়বে না। কখনও ছাড়ে নি। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।—

…গাছের ডালে ডালে মড়া ঝুলছে। ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

…হাত-পা বাঁধা সারিবদ্ধ সিপাহী। একের পর এক গুলি করা হচ্ছে। মড়ার স্তূপ। দুটো কূপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

…প্রকাণ্ড একটা কামান দাগা হ'ল। আওয়াজটা হ'ল চাপা গোছের, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল চতুর্দিকে মাংসের টুকরো, কাটা আঙুল, রক্তাক্ত হাত-পা, ঝলসানো থ্যাতলানো মাথা। কামানের ভিতর মানুষ পুরে কামান দাগা হয়েছে।

…একটা পোড়া দুর্গন্ধ উঠছে চতুর্দিকে। একটা জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে মন্দ আঁচে ধীরে ধীরে পোড়ানো হচ্ছে। তার আগে তাকে প্রহার করা হয়েছে প্রচুর। বেয়নেটের খোঁচায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

…একটা লম্বা ঘরে সারি সারি শোয়ানো আছে হাত-পা বাঁধা অপরাধীরা। সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তপ্ত লোহা দিয়ে আপাদমস্তক দেগে দেওয়া হচ্ছে সকলের একে একে। চড়চড় ক'রে শব্দ হচ্ছে—তপ্ত লোহায় কাঁচা মাংস পুড়ছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে সকলে। আর্তনাদ যখন বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল, তখন গুলি চালিয়ে নীরব ক'রে দেওয়া হ'ল তাদের।

…মুসলমানের মুখে জোর ক'রে মাখানো হচ্ছে শূকরের চর্বি, শূকরের চামড়ায় পুরে সেলাই করা হচ্ছে তাদের, তার পর হত্যা করা হচ্ছে নির্মমভাবে। ফাঁসি দিয়ে, গুলি ক'রে, কামানের ভিতর পুরে, পুড়িয়ে, ঠেঙিয়ে—যেমন খুশি। হিন্দুর বেলাতেও ঠিক অনুরূপ আচরণ। আগে ধর্ম নষ্ট, তার পর অপমান, তার পর হত্যা।

দিল্লী শ্মশান হয়ে গেছে। একটি পুরুষ নেই। সব মরেছে। হাজার হাজর গৃহহীন স্ত্রীলোক আর শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে লুঠ করেছে···

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ রাজপুরুষেরা যেভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, তার এই সব বর্ণনা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই* নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। ভয়াবহ বর্ণনা। অনেকদিন আগে পড়েছিল। প্রতিটি বর্ণনা মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে। এ দেশের লোককে লাথি মেরে, চাবকে, জেলে পুরে, গুলি ক'রে, ফাঁসি দিয়ে, আগুনে পুড়িয়েও তৃপ্তি হয় নি এদের। একজন লিখেছেন—আমার যদি আইনত ক্ষমতা থাকত, জীবন্ত অবস্থায় এদের চামড়া ছাড়িয়ে নিতাম। তার পর দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, কাবুল বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহও দমন করেছিল এরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, হাজার হাজার লোক হত্যা ক'রে। শক্তিমান জাতি, প্রতিশোধ নিতে এরা ছাড়ে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর—ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলের সেলে সেলে···। সহসা চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল অংশুমান, তবু ভয় খাব না, তবু অন্যায় সহ্য করব না, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা নেবই। ব'লে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—কোথাও কেউ নেই। চুপ ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। এত অন্ধকার কেন? একটু আলো, এতটুকু আলো পেলে যে বেঁচে যায় সে! কোথাও আলো নেই। চোখের সামনে অন্তরের নিবিড় গহনে কেবল অন্ধকার। ঘন গাঢ় পুঞ্জীভূত তমিস্রা। মৃত্যুর আঁধার এখনই নামল নাকি?

শান্ত স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে ব'সে ছিল অংশুমান। চোখের সম্মুখে প্রসারিত তিমির-যবনিকা সামান্য একটু কাঁপল যেন, ক্ষীণ একটু আলোর আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।—আবার অন্ধকার—একটু পরেই আবার সেই আলোর আভাস, এবার যেন একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী—আবার মিলিয়ে গেল তাও। একাগ্র আগ্রহে স্তব্ধ নিমীলিত নেত্রে ব'সে রইল অংশুমান। প্রদীপের শিখার মত ওই যে—স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল ক্রমশ—কম্পিত শিখা স্থির হ'ল। সহসা সে শিখা থেকে আবির্ভূত হলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। বললেন, ভয় কি, আমি আছি। অন্ধকার মিথ্যা।

*The Other Side of the Medal by Edward Thompson.

কে আপনি ?

আমি নির্বাণ অগ্নি। তোমার মধ্যে চিরকাল আছি এবং থাকব। ভয় আমাকে আবৃত করে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না। ভয় অপসারিত কর, আমাকে দেখতে পাবে। ভয়ই অন্ধকার।

ধীরে ধীরে শিখার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন আবার।

অংশুমানের কানে কানে কে যেন বলতে লাগল, আমি দাবানল, আমিই বাড়বানল, আমিই আবার কৃশানু। মৃণ্ময় প্রদীপের ভীরু কম্পিত শিখায়, বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রকাশে, ইন্দ্রের বজ্রে, মদনের কুসুমশরে, নক্ষত্রের কিরণে, খদ্যোতের দীপ্তিতে, তপস্বীর তপস্যায়, প্রেমিকের প্রেমে, কবির প্রেরণায়, বীরের বীরত্বে, বৃক্ষ লতায় জড়ে চেতনে অণুতে পরমাণুতে সর্বত্রই আমার প্রকাশ। ইলেকট্রনের যে রূপে তোমরা বিস্মিত, তা আমারই রূপ। নেগেটিভ ইলেকট্রন চিরকালই পজিটিভের দিকে ধাবিত। আমারই এক অংশ আর এক অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ হতে চায়। স্বাহা আজও আমার অনুগামিনী, তাই পৃথিবী অজর অমর অক্ষয় শাশ্বত—

নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল—যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে অনিবার্য গতিতে—সত্য পথে—

২০

তিন মাস কেটে গেছে।

সব রকম চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। অংশুমানকে পাগল প্রতিপন্ন করা যায় নি। হাইকোর্টের বিচারেও তার প্রাণদণ্ড বাহাল আছে। প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন হিতৈষীরা। অংশুমান তাতে সই করে নি। অংশুমানের বাবা পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন রাজদরবারে। মঞ্জুর হয় নি। কাল ভোরে অংশুমানের ফাঁসি হবে। জেলারবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

আপনার শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে বলুন, তা আমরা সম্ভব হ'লে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। মানে, যদি কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান—

কার সঙ্গে দেখা করবে সে ? মা বাবা ? কি হবে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে ? তাঁরা তো খালি কাঁদবেন ! অজানা পথে অশ্রুর পাথেয় নিয়ে কি করবে সে ? হঠাৎ মনে হ'ল যদি—

একজনের দেখা পেলে সুখী হতাম, কিন্তু তা কি সম্ভব হবে এখন ?

কার সঙ্গে বলুন, চেষ্টা করতে পারি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেনের স্ত্রী অন্তরা দেবীর সঙ্গে।

তিনিও তো আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন।

মানে ?

সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অংশুমান।

কাল তাঁরও ফাঁসি হবে।

কেন, কি করেছিল সে ?

একজন পুলিস অফিসারকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ? দেখি—

জেলারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

২১

সেদিন পূর্ণিমা। শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অন্তরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে। অনাবিল জ্যোৎস্নায় মহাকাশ পরিপ্লাবিত। পৃথিবীর ধূলিতে লেগেছে আকাশের স্পর্শ, জেগেছে অনাগতলোকের স্বপ্ন। রূপসাগরের কানায় কানায় অপরূপ সৌন্দর্য-সুধা যেন টলমল করছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উড়ে যেতে চাইছে যেন পৃথিবীর দৃষ্টির ওপারে চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে। ওটা মেঘ নয়—নৌকোর পাল··· ভারতের স্বর্গীয় অমরবৃন্দ বোধ হয় যাত্রা করেছেন আজ মর্ত্যের দিকে··· ক্ষুদিরাম-কানাইলালের দল···ওটা তাদেরই পাল-তোলা নৌকো—পালে লেগেছে পারিজাতগন্ধী হাওয়া—দুলছে তাতে নন্দনবনের মন্দারমঞ্জরী···

—শেষ—

মৃগয়া

উৎসর্গ

মুঙ্গের কলেজের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সরকার এম.এ.

করকমলেষু

কালীবাবু,

আশা করি আপনার মনে আছে, 'মৃগয়া' লিখিবার বীজ আপনিই আমার মনে একদা বপন করিয়াছিলেন। আপনি সে সময়ে ভাগলপুরে না আসিলে হয়তো এ গল্প আমি লিখিতামই না।

'মৃগয়া'র জন্ম-ইতিহাসের স্মৃতিটুকু জাগরূক রাখিবার জন্য প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পুস্তকখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। ইতি

ভাগলপুর
১৫, ৫, ৪০

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রামে

হিরণপুর গ্রামে জেগেছে সাড়া,
বিপিন ঘোষ, হরু মণ্ডল, জগদেও পাঁড়ে থেকে শুরু ক'রে
ঝাংরু সর্দার, বাদল ডাক্তার, লাহিড়ী, তিনু চাটুজ্জে,
তালুকদার মশাই, হরিশ খুড়ো,
এমন কি ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত নিতাই পর্যন্ত
উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।
বস্তুত, না হয়ে উপায় নেই।
স্বয়ং জমিদারবাবুরা যখন উৎসাহিত হয়েছেন
এবং নানা ভাবে তা প্রকাশ করছেন,
তখন
বাকি সকলকেও
বাধ্য হয়েই
জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে
উৎসাহ-ঐকতানে সুর মেলাতে হচ্ছে।
পুষ্করিণী আলোড়িত হ'লে
পুষ্করিণীবাসী শামুক, গুগলি, পানা, শ্যাওলা,
কমল, কুমুদ, কহ্লার—
সবাইকেই সামলাতে হয় সে আলোড়নের ধাক্কা।
সুতরাং রোগা নিতাই ভান করছে বীরত্বের।
বিভিন্ন শিকার-অভিযানে
বিভিন্ন রকম বিপদের সম্মুখবর্তী হয়ে
তার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও
স্বকীয় বীর্যবলেই কেবল
কার্যোদ্ধার করেছে কি ক'রে সে
শীর্ণ হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত ক'রে

তারই বর্ণনা করছে।

খাজনাপ্রপীড়িত অতিস্থূল ক্ষিপ্রতাবিলাসী তিনু চাটুজ্জে
হয়ে উঠেছেন ক্ষিপ্রতর।
মেদবহুল স্বেদলাঞ্ছিত বপুটি আস্ফালিত ক'রে
ক্ষত্রিয়সুলভ উল্লাসহকারে বলছেন তিনি,
নিশ্চয়ই,
যেতে হবে বইকি শিকারে,
আলবৎ যেতে হবে।
বাঘকে ভয় করলে মানুষের চলে!
উদাহরণ দিচ্ছেন হিট্‌লার-মুসোলিনির।
কিন্তু তাঁর এই অতি-মানবীয় উত্তেজনার অন্তরালে
নিতান্ত-মানবীয় যে মতলবটি ঢাকা আছে,
সেটির খবর জানেন কেবল নীলু দত্ত।

হরিশ খুড়োর কল্পনার
নব-পক্ষোদ্গম হয়েছে।
খুড়ো জীবনে কখনও বাঘ দেখেছেন কি না সন্দেহ,
কিন্তু বাঘের থাবার, গোঁফের,
ডোরা ডোরা কালো দাগের
এমন নিখুঁত রকম বর্ণনা ক'রে চলেছেন যে,
টোকন, চাঁপা তো বটেই,
বড়বাবু পর্যন্ত মুগ্ধ।

দু হাতে কেরোসিন তেল মেখে
তালুকদার মশাই সাফ করতে লেগে গেছেন
তাঁর উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া
সাবেককালের গাদা বন্দুকটা।
একনলা বটে,
মরচেও পড়েছে,

কিন্তু আসল 'স্টীল'।
একালে নিতান্তই দুর্লভ।

বাদল ডাক্তার
শব্দসহকারে কিছু বলছেন না বটে,
কিন্তু ভারী মুখখানাতে
ফুটিয়ে রেখেছেন এমন একখানা হাসি,
যার নীরব মুখরতা
সত্যই শিল্পীজনোচিত।

বুড়ো হরু মণ্ডল বর্শা শানাচ্ছে
এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলছে,
এই বর্শায় ভালুক গেঁথেছি, শূয়োর মেরেছি,
ঘায়েল করেছি ময়াল সাপকে,
পাগলা হাতীর মাথা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছি,
মানুষও নিস্তার পায় নি।
বাকি ছিল শুধু বাঘ,
জামাইবাবুর কল্যাণে সেটাও হবে এবার।
হরু মণ্ডলের কুচকুচে কালো রঙ,
প্রশস্ত ছাতি,
রক্তাভ টানা টানা চোখ,
পেশীবহুল দেহসৌষ্ঠব,
পুষ্ট পাকানো ধবধবে সাদা এক জোড়া গোঁফ ;
কথায়
চোখে
বলিষ্ঠ পৌরুষ-ভঙ্গিমা।
তার কথায় খুশী হচ্ছিল সবাই,
কেবল একটি লোক ছাড়া,
সে তার তৃতীয় পক্ষের বালিকা বধূ কুসুম।
বড় ভীতু সে।

মসলা বাটতে বাটতে
ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে
সে চেয়ে চেয়ে বর্শা-শানানো দেখছিল।
ভাবছিল,
বাপের বাড়িতে সবাই 'অপয়া' বলত তাকে,
জন্ম হবামাত্রই মাকে খেয়েছে,
কিছুদিন পর বাপকে,
ভাইগুলিও নেই।
নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই
বিয়ে করেছে তাকে মণ্ডল।
শেষে কি—!
আর সে ভাবতে পারলে না,
বহির্মুখী নিশ্বাসটাকে নিরুদ্ধ ক'রে
সে সবেগে ঘষতে লাগল কঠিন নোড়াটা
লঙ্কা-মাখা শিলের বুকে।
তার বড় বড় চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি
অবলুপ্ত হয়ে রইল
অবগুণ্ঠনের তলায়।

মুশকিলে পড়ছে ঝাংরু সর্দার।
সেই চিরন্তন মুশকিল!
ঝাংরুর চেহারাটিও দেখবার মত—
মাথায় বাবরি চুল,
বেঁটে, বলিষ্ঠ,
কষ্টিপাথরে কোঁদা চেহারা।
রক্তজবার প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ
কানে চুলে সর্বদাই জলজ্বল করছে।
তালরস-রসিক।
কিন্তু ওর সাঁওতালত্ব নিখুঁত থাকতে পায় নি
সভ্যতার আওতায়।

ঢুকতে আর তৃপ্তি হয় না,
বিড়ি খেতে হয়, সিগারেটের প্রতিও মোহ আছে।
বাঁশী, মাদল এখনও বাজায় বটে,
কিন্তু গ্রামোফোন কেনবার শখ আছে প্রচুর,
পয়সা নেই ব'লেই কিনতে পারে না।
কিন্তু সব চেয়ে মুগ্ধ হয়েছে ওকে মোহিনী গোহমনা।
গোহমনা মানে গোখরো সাপ,
গোখরো সাপের সঙ্গে সাদৃশ্যও আছে মেয়েটির।
মেটে মেটে রঙ,
রেগে গেলে
নীল চোখে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত ক'রে
পাতলা কোমরে হাত দিয়ে
গ্রীবা উদ্যত ক'রে যখন দাঁড়ায়,
তখন সত্যিই মনে হয়, গোখরো সাপ ফণা ধরেছে।
জন্মেরও একটা ইতিহাস আছে।
মা খাঁটি মেথরানী,
বাপ খাঁটি সাহেব।
জন্মের সময় আঁতুড়-ঘরে গোখরো সাপ বেরিয়েছিল,
তাই ওর নাম গোহমনা।
নামের মর্যাদা ও রক্ষা করেছে ;
ওর বিষদন্তের তীক্ষ্ণ আঘাতে
মারা গেছে এবং জখম হয়েছে
হিরণপুর গ্রামের অনেকে।
জমিদারের বড় ছেলে,
ম্যানেজার,
নায়েব,
জমাদার,
পিয়াদা—
সকলকেই এক আধ বার ছুবলেছে গোহমনা ;
কিন্তু ধরা পড়ে নি কোথাও।

এমন সময় সাঁওতাল-পরগনার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে
হাজির হ'ল এসে ঝাংরু—
ভ্রমরকৃষ্ণ কালো বাবরিতে জবাফুল গুঁজে
হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে
বাবুদের বাড়ির নতুন হাতীটার মাহুত-রূপে।
ধরা পড়ল গোহুম্‌না,
গৃহস্থালীর চুপড়িতে গিয়ে ঢুকল বন্য সর্পিণী।
বিষদন্তের বিষ
রূপান্তরিত হ'ল অমৃতে,
জাগল নূতন জগতে,
লাগল নূতন রঙ।
কিন্তু তবু গোহুম্‌না তো,
ফণা-তোলা স্বভাবটা গেল না।
মাঝে মাঝে ফণা তোলে,
ফোঁস ক'রে ওঠে।
ঝাংরু মনে মনে হাসে,
কিন্তু বাইরে ভান করে, ভয় পেয়েছে।
ভান না করলে উপায় আছে!
এলিয়ে-পড়া মাথার খোঁপাটা দু হাতে জড়াতে জড়াতে
গোহুম্‌না বললে,
আমি যাব না।
যাবি না কেন?
আমি গিয়ে কি করব? শিকারের আমি কি বুঝি?
ঝাংরু হেসে জবাব দিলে,
তোর চেয়ে বড় শিকারী
আছে নাকি আর কেউ হিরণপুরে?
পা পড়ল পুচ্ছে,
ফোঁস ক'রে উঠল গোহুম্‌না,
গ্রীবাভঙ্গী ক'রে বললে, তার মানে?
ঢোঁক গিলে থতমত খেয়ে বললে ঝাংরু,

মানে, মন কেমন করবে।
কদিন থাকতে হবে বাইরে তার ঠিক নেই,
দূর তো কম নয়,
পাকা দশটি ক্রোশ।
কলমিপুরের মাঠ পেরিয়ে,
ময়না নদীর ওপারের সেই জঙ্গলটায় যেতে হবে।
পারব না তোকে ছেড়ে থাকতে এতদিন।
কোমর ঘুরিয়ে বললে গোহুম্‌না,
আমায় নতুন শাড়ি কিনে দে তবে।
এই ময়লা শাড়ি প'রে আমি যাব না।
মুশকিলে পড়ল ঝাংরু।
দুললিচাঁদের দোকানে ধার তো বেড়েই চলেছে।
দ'মে গেল মনে মনে,
তবু বললে, আচ্ছা, দেব, তাই দেব।
আমি যাব কিসে চ'ড়ে ?
তুই তো যাবি হাতীতে।
হাতীর পিঠে থাকবে বাবুরা,
আমি কি ন্যাজ ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে যাব নাকি ?
হেসে লুটিয়ে পড়ল গোহুম্‌না।
ঝাংরু বললে, তার জন্যে ভাবনা কি,
গরুর গাড়ি যাবে পঁচিশখানা।
তাঁবু,
বাসনকোসন,
আসবাবপত্তর
সব যাবে তো !
তুই তারই একটাতে চ'ড়ে বসিস।
বিরিঞ্চিকে ব'লে দেব আমি।
নিজে যাবেন হাতীতে,
আমার বেলায় গরুর গাড়ি !
ইস, ভারি আমার —!

যে কথাটি দিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করলে গোহম্না,
ভদ্রসমাজে তা প্রচলিত নয়।
ঝাংরু তখন মোক্ষম অস্ত্রটি হানলে,
গম্ভীর হয়ে গেল।
বার দুই আড়চোখে ঝাংরুর দিকে চেয়ে
ফিক ক'রে হেসে ফেললে গোহম্না,
বললে,
ইস, পুরুষের রাগ দেখ না!
ঝাংরু তবু গম্ভীর।
যাব, যাব, যাব গো,
তোমার বিরিঞ্চির গাড়িতে চেপেই যাব,
তুমি একটু হাস দিকিনি।
হেসে ফেললে ঝাংরু।

•

পাঁজির পাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি
ব'সে ছিলেন নীলাম্বর দত্ত,
ভুরু কুঁচকে।
বার্তা শুভ নয়।
কিন্তু আজকালকার বাবুরা,
বিশেষ ক'রে ওই বিলেত-ফেরত জামাইবাবুটি,
মানবেন না পাঁজির বারণ।
ত্র্যহস্পর্শের তীব্রতা
স্পর্শ করতে পারবে না ওঁদের হৃদয়কে।
যখন ঠিক করেছেন,
তখন নির্ঘাত ওই দিনেই বেরুবেন,
এবং নীলু দত্তকেও হতে হবে সহযাত্রী।
নীলু দত্ত শিকারী নন—মুহুরী।
শিকারীরা করবেন শিকার,
নীলু দত্তকে করতে হবে আয়োজন।
লোকও এক-আধজন নয়,

সবসুদ্ধ মিলে শতখানেকের কাছাকাছি যাবে।
এত লোকের খাবার আয়োজন,
শোবার আয়োজন,
স্নানের আয়োজন,
তা ছাড়া
বড়বাবু, মেজোবাবু, ছোটবাবু প্রত্যেকের জন্যেই
'বিশেষ' একটু আয়োজন
করতে হবে গোপনে গোপনে।
সব ভার নীলু দত্তের ওপর।
কিন্তু পাঁজির দিকে চেয়ে
চিন্তিত হয়ে পড়লেন দত্ত মশাই।
একদিন আগেই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়!
বড়বাবুকে বুঝিয়ে বললে
আপত্তি করবেন না বোধ হয় তিনি।
তাঁবু-টাঁবু গাড়াতে হবে,
মাচান তৈরি করাতে হবে,
যোগাড় করতে হবে একটা মোষের বাচ্চা,
একদিন আগে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।
যুক্তির সূর্যকে কিন্তু আবৃত ক'রে রেখেছে
ছোট একখানি মেঘ।
একদিন আগে গেলে
লাহিড়ীটা অব্যাহতভাবে গ্রাস ক'রে থাকবে বড়বাবুকে।
অতিশয় কষ্টদায়ক চিন্তা।
অথচ পাঁজিকেও—!
নীলু দত্তের ভুরু আরও কুঁচকে গেল।
পাশের ঘরে ভাইপো দুটো হুড়োহুড়ি করছিল,
রোজই করে,
আজ কিন্তু তা অসহ্য হয়ে উঠল;
উঠে গিয়ে
ঠাস ঠাস ক'রে চড়িয়ে দিলেন তাদের।

তারপর হঠাৎ তাক থেকে পাড়লেন
খেরো-বাঁধানো চটি একখানা খাতা,
কি খানিকক্ষণ দেখলেন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে,
তারপর উঠে পড়লেন ;
পায়ে দিলেন ময়লা ক্যাম্বিসের জুতোটা,
তালি-দেওয়া ছাতাটা বগলে ক'রে
বেরিয়ে পড়লেন খাতাটা নিয়ে।
নীলাম্বর এককালে সুদর্শন ছিলেন
এবং সেজন্য গর্বও ছিল তাঁর মনে মনে।
কিন্তু পরিহাস-রসিক বিধাতা
পরিহাস করলেন।
যদিও একটু স্থূলগোছের,
কিন্তু দত্তের পক্ষে মর্মান্তিক।
হঠাৎ মাথায়, দাড়িতে, গোঁফে
খাবছা খাবছা টাক প'ড়ে গেল।
কামিয়ে ফেলতে হ'ল সব
বৃহৎ নাকটা বৃহত্তর হয়ে গেল,
অনাবৃত হ'ল মুখের বলিরেখা,
স্পষ্টতর হ'ল মুহুরীয়ানা চোখের দৃষ্টিতে,
শরীরটা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ল সামনে দিকে।
তবু বাবুরা প্রসন্ন আছেন আজও—
এইটুকুই ভরসা নীলু দত্তের।
বাবুদের অনুগ্রহে সে কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না,
না, লাহিড়ীকেও নয়।
হ'লই বা সে বড়বাবুর বন্ধুর ভায়রাভাই
এবং এম. এ. পাস।
খেরোর খাতা বগলে ছুটতে লাগলেন নীলাম্বর দত্ত
বাবুদের বাড়ির দিকে।
এই শিকার-অভিযানের জন্যে যা যা দরকার
এবং কত রকম যে দরকার

এবং কত রকম ভাবে তার বন্দোবস্ত করতে হবে,
তা সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি
খেরোর খাতাখানায়।
সেটা বাবুদের দেখাতে হবে বইকি।
দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদ্দুর মাথায় ক'রে
ছুটতে লাগলেন নীলাম্বর দত্ত।

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী
এ বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন আত্মীয়তার দাবিতে,
কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন মোসায়েবের পদবীতে
দিলদরিয়া বড়বাবুর আসরে।
বড়বাবু যে তাঁর জাতি-নির্ণয়ে অসমর্থ হয়েছিলেন তা নয়,
মদ্য-পিপাসু ব্যক্তিটির স্বরূপ ঠিক চিনেছিলেন তিনি
এবং সেইজন্যেই
অসীম করুণাভরে সহ্য করতেন তাঁকে।
লাহিড়ীর যোগ্যতাও ছিল কিঞ্চিৎ,
শুধু যে সুকান্তি, সুকণ্ঠ, সুবিদ্বান তাই নয়,
সুপারিষদও।
গলায় কাপড় দিয়ে, হাতজোড় ক'রে
হেঁ-হেঁ করেন না তিনি।
যখন খোশামোদ করেন,
চট ক'রে বোঝা যায় না যে খোশামোদ করছেন।
ভর্ৎসনা, অনুযোগ, বিস্ময়, নীরব হাস্য, আক্ষেপ,
নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর খোশামোদ।
এই শিকার-ব্যাপারে
বড়বাবুর ভগ্ন স্বাস্থ্য,
নিদারুণ গরম,
নতুন হাতীটার বদমেজাজ
এবং আরও অনেক রকম কারণ দেখিয়ে
আপাতদৃষ্টিতে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন সকলকে।

কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বড়বাবু
এই ছদ্মবেশী হিতৈষণার অন্তরালে
প্রত্যক্ষ করেছেন অসহায় লাহিড়ীকে—
ষড়রিপুবিধ্বস্ত আদর্শচ্যুত বিদ্বান ব্যক্তিটিকে,
যার শখ আছে, কিন্তু শক্তি নেই,
যে গলগ্রহ হয়েও
প্রাণপণে চেষ্টা করছে আত্মসম্মানের মুখোশটা আঁকড়ে থাকতে,
যার বিকশিত দন্তের অত্যুচ্ছ্বসিত প্রাণহীন হাসি
ঢেকেও ঢাকতে পারছে না অন্তরের অন্তহীন ক্রন্দনকে।
উপভোগ করছেন বড়বাবু
লাহিড়ীর এই হিতোপদেশ-জারিত খোশামোদ—
সেই চিরন্তন খোশামোদ,
যা চিরকাল খুশি ক'রে এসেছে
উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মন।

বুড়ো জগদেও পাঁড়ে
এই শিকার ব্যপদেশে
বীরত্ব প্রকাশ করেছে শুধু টোকনের কাছে,
তাও অতি নিভৃতে।
বুড়ো জগদেও পাঁড়েকে
উর্দি-টুর্দি পরলে খানিকটা জমকালো দেখায় বটে,
কিন্তু সাজ-পোশাক খুলে নিলে
পালক-ছাড়ানো হাঁসের মত অবস্থা তার।
লিকলিকে রোগা,
নিদারুণ লম্বা,
মুখখানাতেই একটু জাঁকজমক আছে এখনও।
দ্বিধা-বিভক্ত পাকা দাড়ি
গুম্ফ সহযোগে
এখনও কর্ণ পরিক্রমা করছে বটে,
কিন্তু সাবেককালের সে জলুস আর নেই।

সেকালের কৃষ্ণকুঞ্চিত বিভীষিকা
রূপান্তরিত হয়েছে
শুভ্র সুন্দর প্রশান্তিতে।
চোখের দৃষ্টিতে যৌবনকালের সিংহসুলভ দীপ্তি আর নেই।
তার বদলে
একটা সকৌতুক ছেলেমানুষী হাসি
চিকমিক করছে সর্বদা।
জগদেও পাঁড়ে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি,
চারিদিকে গজিয়েছে এখন সবুজ ঘাস।
কেউ আর মানে না তাকে।
কিন্তু এখনও
এই জগদেও পাঁড়ে
কারও হাত যদি একবার চেপে ধরে,
ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব।
সরু সরু আঙুলগুলোতে এখনও আছে
বজ্রের মত শক্তি।
স্বর্গীয় কর্তা মশাই,
অর্থাৎ বর্তমান বাবুদের পিতাঠাকুর,
বাহাল করেছিলেন জগদেওকে।
এ বাড়ির অনেক নিমক ও ধমক
পরিপাক ক'রে
জগদেও বর্তমানে পরিপাক করছে পেন্‌শন।
ওর স্থানে
বড়বাবু
বাহাল করেছেন যে নাবালকটিকে,
তার নানা প্রকার অপটুতা
অনুকম্পার চক্ষে দেখে জগদেও।
এই কিশোর সিংকেই কাজকর্মে ওয়াকিবহাল ক'রে দেবার ছুতোয়
জগদেও
দেউড়ি আঁকড়ে প'ড়ে আছে এখনও।

আসলে,
এতকালের পুরনো দেউড়ি ছেড়ে যেতে প্রাণ চায় না।
প্রথম যৌবন থেকে শুরু ক'রে
সারা জীবনটাই তো এইখানে কাটল।
চম্পারণ জেলায় কে চেনে তাকে!
আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই,
সব ম'রে-হেজে গেছে;
এইখানেই শতবন্ধনে সে জড়িয়েছে নিজেকে।
বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু—
তার সামনেই বড় হ'ল সবাই।
ওদের নানা বয়সের
কত দৌরাত্ম্যই না সহ্য করেছে সে!
এই জগদেও পাঁড়েই বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে সকলের।
বহুমায়ীদের পালকির পেছনে পেছনে
সগর্বে এসেছে লম্বা লাঠি ঘাড়ে ক'রে।
তাদের মেয়ে হ'ল, ছেলে হ'ল,
তারাও আবার দৌরাত্ম্য করতে লাগল পাঁড়ের ওপর।
উষাদিদির বিয়েও সে দেখলে।
তারও আবার ছেলে হবে,
সেও হয়তো একদিন এসে চড়বে
জগদেও পাঁড়ের কাঁধে,
টানবে দাড়ি ধ'রে।
ভারি ভাল লাগে ছোট ছেলেদের।
ভাব তাদের সঙ্গেই,
ছোটবাবুর ছোট ছেলে টোকনের সঙ্গে বিশেষ ক'রে।
তাকেই সে গোপনে বলেছে,
বাঘকে হাতের কাছে পেলে
তার পুছড়ি পাকড়ে
এইসা এক পটকান দেবে
যে, জান নিকেলে যাবে বাছাধনের।

টোকন শিশুমহলে
চোখ বড় বড় ক'রে
প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে বার্তাটা।

বিপিন ঘোষ
গ্রামের সরকারী ঠাকুরদা।
আবালবৃদ্ধবনিতা।
সকলের সঙ্গেই ইয়ার্কি আদান-প্রদান করেন,
এমন কি স্বকীয় বৃদ্ধা গৃহিণীর সঙ্গেও।
হাজির হলেন তিনি মেজবাবুর বৈঠকখানায়।
বললেন,
তোমাদের জামাই-হিট্লারের ভয়ে
ব্যাঘ্রসমাজ চেম্বার্লেন পাঠিয়েছেন আমার কাছে।
তোমার ঠানদি বুঝতে পারেন নি বটে,
আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম।
মেজবাবু বললেন, কি রকম ?
কাল থেকে
একদম অচেনা একটা রোগা বেড়াল এসে জুটেছে।
ভিজে ভিজে ভাব,
মাঝে মাঝে সকরুণভাবে চাইছে।
আমার বিশ্বাস,
ব্যাঘ্রসমাজের দূত ও,
আমার মারফত সন্ধির প্রস্তাব করতে চায়
তোমাদের জামাইয়ের কাছে।
আমি হয়তো রাজীও হয়ে যেতুম,
কিন্তু কাল একটু যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি,
টপ ক'রে মাছটি তুলে নিয়েছে পাত থেকে।
সুতরাং অ-ক্ষম হয়ে পড়েছি,
ও পাষণ্ডদের আর ক্ষমা করতে পারব না।
এমন কি মনস্থ করেছি,

আমিও তোমাদের অভিযানে যোগদান করব।
মেজবাবু বললেন, ঠানদি ?
তাঁর জন্যেই যাচ্ছি তোমার দাদার কাছে।
হেলে দুলে হাসতে হাসতে গেলেন ঠাকুরদা
বড়বাবুর কামরায়।
বললেন,
দেখ ভায়া,
আমিও যাচ্ছি,
কিন্তু হাতীতে, ঘোড়াতে অথবা গরুর গাড়িতে যাব না,
আমার চাই পালকি।
অর্থাৎ তোমার ঠানদিও যেতে চাইছেন,
পতিব্রতা নারীকে ঠেকানো মুশকিল।
বড়বাবু হেসে বললেন, বেশ তো।
গলার স্বর একটু খাটো ক'রে বললেন ঠাকুরদা,
সুবিধেও হবে।
তোমাদের ঠানদিকে চেনো তো ?
রিজার্ভ ফোর্স।
তোমাদের জামাইয়ের বন্দুক ফেল করলেও করতে পারে,
তোমাদের ঠানদি ফেল করবেন না কখনও।
ওইটুকু ছোট্ট মানুষ তো,
কিন্তু একবার গাছকোমর বেঁধে দাঁড়ান যদি,
বাঘেরও আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।
বড়বাবু তাঁর স্বাভাবিক দরাজ কণ্ঠে
অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন।
ঠাকুরদা গেলেন তারপর ছোটবাবুর কাছে।
ছোটবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন,
ভায়া,
তোমাদের নীলু দত্তকে ব'লে দিও,
একটু নিরিমিষ-টিরিমিষের ব্যবস্থাও যেন রাখে,
তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে

বাগান-বাড়িতে লুকিয়ে-চুরিয়ে যা-ই করি,
সকলের সামনে ম্লেচ্ছাচরণ করতে পারব না।
বিশেষত,
তোমাদের ঠানদিও সঙ্গে যাচ্ছেন যখন
কোষাকুষি তাম্রকুণ্ড প্রভৃতি নিয়ে।
দেখো ভায়া,
ডুবিও না আমাকে যেন শেষকালে।
ছোটবাবু বলেন,
ঠানদিকেও আমরা দলভুক্ত ক'রে নেব,
ভাবছেন কেন আপনি !
ঠাকুরদা হেসে বললেন,
ঠানদি তোমাদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন হয়তো,
কিন্তু আমাকে তোমাদের দলভুক্ত দেখলে
খুশী হবেন না একটুও।
বাইরে থেকে আমার দুরবস্থাটা
তোমাদের নয়নগোচর হবে না ভায়া,
কিন্তু গজভুক্ত কপিত্থবৎ
আমার শূন্যতাটা অনুভব করতে থাকব আমিই কেবল।
ছোটবাবু চক্ষু দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে বললেন,
এত ভয় করেন আপনি ঠানদিকে ?
ঠাকুরদা বললেন,
বিয়ে করেছ তরঙ্গিণীকে,
ক্ষেমঙ্করীর খবর জানবে কি ক'রে বল ?
মোট কথা,
বিপদে ফেলো না আমায় ভাই।
হেলে দুলে চ'লে গেলেন ঠাকুরদা।
নাতিদীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি,
নগ্নগাত্র,
বুকময় কাঁচাপাকা চুল,
দক্ষিণ বাহুমূলে একটি রুদ্রাক্ষ,

পরনে থান,
পায়ে চটি ।

অন্তঃপুরেও চঞ্চলতা জেগেছিল ।
বৃদ্ধা গৃহিণী সেকেলে মানুষ,
মনে মনে তিনি সমর্থন করছিলেন না
মেয়েদের এই হুজুগ-প্রবণতা ।
বর্তমান যুগের মেয়েদের ওপরই
কেমন যেন অপ্রসন্ন তিনি ।
তাদের আদিখ্যেতা,
বেহায়াপনা,
তাদের খুরওলা জুতো,
সুরওলা কথা,
তাদের কাঁধকাটা জামা,
নানা ছাঁদের শাড়ি,
অ্যাটাচি কেস, সুট কেস, ব্লাউজ কেস, ভ্যানিটি ব্যাগ,
ক্রীম, স্নো, রুজ, পাউডার,
যখন তখন গুনগুনিয়ে গান গাওয়া,
খুকীপনা,
ন্যাকামি,
ধিঙ্গির মতন ঘুরে বেড়ানো—
কিছুই ভাল লাগে না তাঁর ।
সব যেন বদলে যাচ্ছে ।
তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছিল—
সংস্কৃত মন্ত্র, লাল চেলী, পুজো-হোমের আবহাওয়ায় ;
একশোটা ঢাকী এসেছিল,
একশোটা ঢুলী,
রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, নহবৎ, যাত্রা, ঢপ,
বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীতে মারামারি হয়েছিল,
লোক খেয়েছিল এক মাস ধ'রে,

চারটে বড় বড় হাঁড়া,
ছখানা পরাত
হারিয়ে গেছল গোলমালে।
এখন সে-সব উঠে যাচ্ছে নাকি!
সোমত্ত সোমত্ত মেয়েরা
চুপিচুপি বিয়ে ক'রে আসছে আদালতে নাম সই ক'রে
কালে কালে কতই যে হবে!
এই তো নিজের নাতনী উষা,
তাকে কলেজেও পড়াতে হ'ল,
বিয়েও দিতে হ'ল এক বিলেত-ফেরতের সঙ্গে।
তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছিল ন বছরে
কুল, গোত্র, কুষ্ঠি বিচার ক'রে।
এর বিয়ে হ'ল উনিশ বছরে
কিচ্ছু বিচার না ক'রেই।
সবাই দেখলে কেবল ছেলের উপার্জন-ক্ষমতাটা।
ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে না কেউ,
নিজেরাই সব দেখে-শুনে দিতে চায়।
অন্য কিছু দেখে না কিন্তু আজকাল,
দেখে কেবল টাকার দিকটাই।
কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ সবাই দেখছে টাকা,
টাকা না হ'লে বিয়ে হবে না।
ওই যে উষার কলেজী বন্ধুটি এসেছে,
তার এখনও বিয়ে হয় নি,
অথচ একটা মাগী!
নামেরই বা ছিরি
—মীনা!
বীণা হ'লেও বা মানে বোঝা যেত।
নাতজামাই বাঘ শিকার করতে আসছে,
আসুক না!
গুষ্টিসুদ্ধুর মেতে ওঠবার কি আছে তাতে!

আগেও তো কর্তারা শিকারে যেতেন,
বড় বড় বাঘও মেরেছেন কত,
কিন্তু কই,
মেয়েরা কখনও তাঁদের সঙ্গী হতে চায় নি তো!
শিকারে সঙ্গী হওয়া দূরে থাক্,
পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত
ঘোমটা খোলবারই সাহস হ'ত না কারও।
মেয়েদের জগৎই ছিল আলাদা।
জা, ননদ, শাশুড়ী, ছেলে, মেয়ে,
দূরসম্পর্কের পোষ্য-আত্মীয়ার দল,
পাড়াপড়শী,
অতিথি-ভিকিরি,
পুজো-পার্বণ,
এদেরেই কেন্দ্র ক'রে জীবন কাটত।
পুরুষদের বার-মহলের খবর
মাঝে মাঝে পৌঁছত এসে বটে অন্তঃপুরে—
কখনও আবছাভাবে,
কখনও অতিরঞ্জিত হয়ে,
আন্দোলিতও করত মনকে,
কিন্তু ওই পর্যন্তই।
সেকালের মেয়েরা
পুরুষদের সঙ্গে
এমন ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে,
এমম লেপটে থাকতে পারত না।
তারা অবলা অশিক্ষিতা ছিল হয়তো,
কিন্তু তাদের এমন একটা মৌন মর্যাদা ছিল,
যা একালের মেয়েদের নেই।
এরা মুখে বাহাদুরি করে বটে—
আমরা তোয়াক্কা করি না পুরুষদের,
আমরা স্বাধীন,

আমরা স্বাবলম্বী ;
কিন্তু ওটা যে শুধু ওদের মুখেরই কথামাত্র,
তা ওদের চোখের দৃষ্টিতে লেখা রয়েছে।
ছুং ছুং ক'রে বেড়াচ্ছে যেন সব।
আমাদের কালে
'পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ' ব'লে একটা কথা ছিল বটে,
কিন্তু পেটে ক্ষিধে মুখে অ-ক্ষিধের আস্ফালন—
একটা নতুন ব্যাপার।
বৃদ্ধা গৃহিণী
ঠাকুরঘরে ব'সে ব'সে
হরিনামের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে
এই সব চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।
এমন সময়
ছোট বউ তরঙ্গিণী এসে বললেন,
ও মা, শুনছেন—
সুরেন চিঠি লিখেছে
আপনাকে সুদ্ধু যেতে হবে শিকারে
আপনি না গেলে ও যাবেই না লিখেছে
এই নিন চিঠি।
বৃদ্ধা গৃহিণী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ
তারপর বললেন,
ক্ষ্যাপা, না, পাগল!
সবাই কি ক্ষেপে গেলি নাকি তোরা!
আমি বুড়ো মানুষ কোথায় যাব!
তরঙ্গিণী মুখ টিপে একটু হেসে চ'লে গেলেন।
গৃহিণী ব'সে ব'সে ঘোরাতে লাগলেন মালা,
কিন্তু তাঁর অন্তরের নিভৃত প্রদেশে
ঘুম ভেঙে জেগে উঠল
বেণী-দোলানো এক খুকী,
যে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে

বায়না করত নাগরদোলায় চড়বার জন্যে,
মেলায় যাবার জন্যে,
যাত্রা শোনবার সময় আসর ঘেঁষে বসবার জন্যে,
যে নাক বেঁধাতে আপত্তি করে নি নোলক পরবার জন্যে,
যে পুকুরে ঝাঁপাই জুড়ত,
ঝড় উঠলে আমবাগানে ছুটত,
সামান্য পুঁতির জন্যে লালায়িত হ'ত,
পুতুলের সংসার নিয়ে মেতে থাকত,
দাদার সঙ্গে লুকিয়ে আচার চুরি করত—
সেই খুকী।
কোথায় ছিল এ ?
বিধবা বৃদ্ধা গৃহিণীর
মরচে-পড়া কড়া-পড়া মনের তলায়
ঘুমিয়ে ছিল বুঝি এতদিন,
কঠিন বীজের ভেতর কচি অঙ্কুরের মত।
অনুকূল আলো-বাতাসে
কচি কচি পাতা দুটি মেলে
আকাশের দিকে তাকাল আজ।
নাত-জামাইয়ের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনে
বৃদ্ধা গৃহিণী চেয়ে দেখলেন নিজের মনের দিকে,
কুচকুচে কালো কচি এক জোড়া চোখ
আনন্দে উৎসাহে ভাষাময় হয়ে উঠেছে।
অবাক হয়ে গেলেন তিনি মনের কাণ্ড দেখে,
প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলেন সবেগে
হরিনামের মালাটা।

ছোট বউ তরঙ্গিণী,
সত্যিই যেন তরঙ্গিণী।
কথায়-বার্তায়
হাব-ভাবে

এমন একটা তরল প্রাণোচ্ছলতা বড় দেখা যায় না।
হাসিতে গিটকিরি আছে,
হাসতে গেলে গালে টোল পড়ে,
মুখ টিপে মুচকি হাসে যখন,
তখন আরও বেশী ক'রে পড়ে।
চলনে আছে ভঙ্গিমা,
বলনে রঙ্গিমা,
ছিপছিপে দোহারা গডন
টিকোলো নাক মুখ চোখ,
টকটকে রঙ,
মাথায় চওড়া সিঁদুর,
পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি,
ঠোঁট দুটি পানের রঙে টুকটুক করছে সর্বদাই।
পঁচিশ বছর বয়স হ'ল,
তবু এখনও কাঁচপোকার টিপটি পরা চাই।
বছর আষ্টেক আগে টোকন হয়েছিল,
আর ছেলেপিলে হয় নি।
তরঙ্গিণী
মেজ জা হিরণ্ময়ীর মহলে গিয়ে উঁকি দিলেন।
বললেন,
মেজদি, মাকে দিয়ে এলুম খবরটা।
মুখে যদিও আপত্তি করলেন,
কিন্তু মুখ দেখে মনে হ'ল নিমরাজী।
খুব মোক্ষম বুদ্ধিটা বার করেছিলে যা হোক!
ঊষাটাকে কিন্তু সামলে রেখো—
যা বকর বকর করে ও,
সব কথা ফাঁস না ক'রে দেয় শেষকালে!
কলেজে পড়লে কি হবে,
কিচ্ছু বুদ্ধি নেই ওর!
ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারটায় চাবি দিতে দিতে

হিরণ্ময়ী বললেন,
তুই নিজেকে সামলে রাখ্ দিকি।
ঊষাকে আমার তত ভয় নেই,
যত ভয় তোকে।
ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে
চ'লে গেলেন তরঙ্গিণী নিজের ঘরে।
ঘরে গিয়ে
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিতে নিতে
কল্পনায় দেখতে লাগলেন—
প্রকাণ্ড একটা মাঠ,
তাতে তাঁবু,
তাঁবুর ভেতর আর কেউ নেই,
কেবল—।
মুচকি হাসি ফুটে উঠল মুখে,
টোল পড়ল গালে।

হিরণ্ময়ীর গায়ে অন্যান্য বউদের মত
সোনার গহনা অবশ্য প্রচুর ছিল,
কিন্তু গায়ের রঙে ছিল না সুবর্ণ-দ্যুতি।
হিরণ্ময়ী শ্যামাঙ্গিনী।
চোখ-মুখও যে অসাধারণ রকম সুন্দর
তা নয়,
সাদামাটা।
বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।
ছেলেপিলে হয় নি,
সুতরাং ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনীও।
বড় বনিয়াদী বংশের মেয়ে।
একদা
যে বংশের দৌলতে

রূপের অনটন সত্ত্বেও
এ বাড়ির বধূপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন,
এ যাবৎ তিনি
সে বংশের মর্যাদা
রক্ষা ক'রে এসেছেন সগৌরবে।
এ বাড়ির সকলেরই তিনি মা।
নিজের স্বামীর প্রতিও তাঁর যে স্নেহ
তা অপত্যস্নেহ।
বাড়ির ঝি চাকর থেকে শুরু ক'রে
বড়বাবু পর্যন্ত
সকলেই তাঁর দাক্ষিণ্যভোগী।
বড়বাবুর সমস্ত পাঞ্জাবি
মেজ মার হাতের তৈরি।
আহারাদির পর
মেজ মার হাতের তৈরি খিলি চারেক পান না খেলে
তৃপ্তিই হয় না তাঁর।
বৃদ্ধা গৃহিণীও
মেজ বউয়ের হাতের রান্না খাবার জন্যে লোলুপ।
তাঁর মতে এ বাড়িতে
অমন স্বক্ত আর কেউ নাকি রাঁধতে পারে না।
বাড়ির যত ছোট ছেলেমেয়ের আশ্রয়
মেজ মা।
টোকনকে,
বড় জার ছেলে খোকনকে—
মেজ মা-ই মানুষ করেছেন।
খোকন কলকাতায় আইন পড়ছে,
আসবে না সে এখন ;
এজন্য মেজ মার মন একটু খুঁতখুঁত করছে।
ভেবেছিলেন,
স্বরেনকে লিখে দেবেন সঙ্গে ক'রে আনতে,

কিন্তু বড়দির ভয়ে পারেন নি।
বড় কড়া মেজাজের মানুষ বড়দি।
আশ্রিতারূপে
দূরসম্পর্কের এক ননদ এসেছে বাড়িতে,
বড় মাটো বেচারী।
মেজ মা না থাকলে
বড়দির প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করা
অসম্ভব হ'ত তার পক্ষে।
তার পাঁচ বছরের ছেলে জিতু
(এখন সে গেছে তার এক মাসীর কাছে)
যখন এখানে থাকে,
মেজ মার কাছেই শোয় রাত্তিরে।
বড়দির মেয়ে ঊষার যাবতীয় দুষ্কৃতি
মেজ মা-ই চাপাচুপি দিয়ে এসেছেন এতকাল।
কলকাতায় যখন পড়তে গেল ঊষা,
প্রতি মাসেই তার খরচের অঙ্ক
বরাদ্দ টাকার অঙ্ককে ডিঙিয়ে যেত,
পূরণ করতে হ'ত মেজ মাকে
গোপনে গোপনে।
ভাগ্যে বিয়ে হয়েছে
বড়লোকের ছেলে বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টারের সঙ্গে!
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন মেজ মা।
ভাগ্যের কথা বলা তো যায় না,
যদি গরিবের ঘরে পড়ত ঊষা,
কি দুর্দশাই যে হ'ত ওই খরচে মেয়ের!
সে দুর্ভাবনাটা গেছে বটে,
কিন্তু আর একটা নতুন দুর্ভাবনা জুটেছে!
তরঙ্গিণীর এক দূরসম্পর্কের ভাই—
হীরেন
এসেছে ছুটিতে বেড়াতে।

উষার সম্পর্কে মামা হয়,
কিন্তু বয়স বেশি নয়।
বড় জোর
উষার চেয়ে বছর তিন-চার বড় হবে।
ব্যাড্‌মিণ্টন খেলতে গিয়ে
কি যে কাণ্ড করে উষা তার সঙ্গে!
হাসাহাসি, হুড়োহুড়ি, ব্যাট-কাড়াকাড়ি—
বিশ্রী দৃষ্টিকটু ব্যাপার!
দিদি এতদিন এটা লক্ষ্য করেন নি,
সেদিন কে যেন তাঁর কানে তুলে দিয়েছে কথাটা,
রেগে আগুন হয়ে উঠেছিলেন তিনি।
মেজ মাও পছন্দ করেন না এসব,
তবু উষার হয়ে সাফাই গাইতে হ'ল তাঁকে।
ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজটা বন্ধ ক'রে
বেরিয়ে এলেন মেজ মা,
তাঁর খাস-ঝি কাদম্বিনীকে ডেকে বললেন,
কই, কোথায় ময়রা-বউ?
ডেকে দে তাকে।
কালো-কোলো ময়রা-বউ এল একটু পরে
সসঙ্কোচে।
তার নাকে প্রকাণ্ড নথ,
নথে টানা,—
লাগাম টেনে সামলে রেখেছে যেন নথটাকে।
মেজ মা বললেন,
ময়রা-বউ,
আমার জন্যে সের দশেক কাঁচাগোল্লা
তৈরি ক'রে দিতে হবে দুদিনের মধ্যে
আলাদা ক'রে।
তারপর একটু হেসে বললেন
চুপিচুপি,

পারবি তো ?
ঘাড় কাত ক'রে ময়রা-বউ জানালে, পারবে।
দাম তোর আগাম দিয়ে দিচ্ছি, নে,
জিনিস কিন্তু ভাল চাই।
সসঙ্কোচে বললে ময়রা-বউ,
দাম পরে নোব মেজ মা,
জিনিস হোক আগে।
শুনলেন না মেজ মা সে কথা,
বললেন,
কি দরকার বাপু তার !
সেবারকার মত
গোলেমালে শেষটা ভুলে যাব আমি,
তোরাও চেয়ে নিবি না মনে ক'রে।
এক রকম জোর ক'রেই
দামটা গুঁজে দিলেন তার হাতে।
ব'লে দিলেন বার বার ক'রে,
জিনিস ভাল হওয়া চাই কিন্তু।
পুলকিত ময়রা-বউ
বেরিয়ে গেল খিড়কি-দুয়ার দিয়ে
টাকা কটি আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে।
মেজ মা নিশ্চিন্ত হলেন।
শিকারে যদি যেতেই হয়,
ওই মাঠের মাঝখানে
নিজের আয়ত্তের মধ্যে কিছু খাবার না থাকলে
কিছুতে স্বস্তি পাবেন না তিনি।
ছেলে-পিলে,
চাকর-বাকর,
দাই-ঝি,
সবাই যাবে ;
তা ছাড়া মেজবাবুর মিষ্টি না হ'লে মুশকিল,

একটি বেলা চালাবার উপায় নেই।
ওখানে পাঁচ ভূতের কাণ্ড,
নিজের সঙ্গে কিছু মিষ্টি না থাকলে চলে ?
শিকারে যাবার হুজুকটি তুলেছে
ছোট বউ, ঊষা আর মীনা।
কলমিপুর অঞ্চলে
বাঘ বেরিয়েছে একটা
ঊষা সেই খবরটি দিয়েছে স্থরেনকে,
(দেবার মতন আর খবরও পায় নি মেয়ে !)
স্থরেন উৎসাহিত হয়ে উঠেছে,
শিকার করতে হবে বাঘটাকে।
শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, সবাইকে চিঠি লিখেছে,
ঊষাকে লিখেছে, তোমাদেরও যেতে হবে।
বিলেতে মেয়েরা
হামেশাই এমন গিয়ে থাকে,
তোমরাই বা যাবে না কেন ?
এখন
'তোমরা' নামক বহুবচন সর্বনামটি
স্থরেন গৌরবে ব্যবহার করেছিল কি না,
তা নির্ধারণ না ক'রেই
তরঙ্গিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল
এবং উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলল মীনাকে।
মীনা মেয়েটি
একটু চাপা গম্ভীর স্বভাবের,
চট ক'রে চাপল্য প্রকাশ করে না ;
কিন্তু তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-আঘাতে
সেও বিচলিত হ'ল।
ঊষা বলতে লাগল,
নিশ্চয়ই,
সব্বাই মিলে যাব আমরা,

যাব না তো কি!
কলমিপুরের মাঠে
মজা ক'রে
তাঁবু ফেলে সব থাকা যাবে একসঙ্গে।
সমস্ত শুনে মেজ মা বললেন,
কিন্তু একটা 'কিন্তু' আছে এর মধ্যে।
বড়দি রাজি হ'লেও হতে পারেন,
জামাইয়ের অনুরোধ
হয়তো গ্রাহ্য করলেও করতে পারেন তিনি
(যদি মেজাজ ঠিক থাকে,)
কিন্তু মা কিছুতে রাজি হবেন না।
আর মাকে ফেলে আমাদের যাওয়াটা
ভাল দেখাবে না।
অন্তত
আমি যেতে পারব না।
তরঙ্গিণী আবদারের সুরে বললে,
তোমাকে যেতেই হবে মেজদি,
তুমি না গেলে কেউ যাব না আমরা।
তুমি গিয়ে মাকে একটু বল না,
তোমার কথায় তো উনি ওঠেন বসেন।
স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন মেজ মা;
তার পর বললেন,
তা হ'লে এক কাজ কর্ তুই ঊষা,
সুরেনকে লেখ্,
মাকে যেন নেমন্তন্ন করে আলাদা ক'রে।
নাতজামাই পীড়াপীড়ি করলে
হয়তো রাজি হয়ে যেতে পারেন।
মা মনে মনে বেশ হুজুকে আছেন এদিকে,
সেবার মনে নেই,
সমস্ত রাত ব'সে যাত্রা শুনলেন—অভিমন্যুবধ!

বড়দিকেও আলাদা একটা চিঠি লিখতে বলিস।
বড়দিকে রাজি করাও সহজ নয়,
কখন যে কি মেজাজে থাকেন ঠিক নেই,
জামাইয়ের খাতিরেই যদি রাজি হন।
মেজ মার কথামত
উষা চিঠি লিখলে সুরেনকে,
ঈপ্সিত ফলও ফলল।
বড়দি রাজি হয়েছেন,
মাও নিমরাজি।
মেজ মা নীচে নেবে যাচ্ছিলেন,
এমন সময় পেছন দিক থেকে এসে
জাপটে ধরলে তাঁকে টোকন।
মেজ মা, আমাকেও একটা এয়ার-গান কিনে দাও,
আমিও জামাইবাবুর সঙ্গে বাঘ মারব
মাচায় উঠে ব'সে।
মেজ মা বললেন,
তোমার জগদেও পাঁড়ে তো বলেছে,
আছড়ে মারবে বাঘকে,
বন্দুকের আর দরকার কি?
টোকন তার বড় বড় চোখ দুটো
আরও বড় ক'রে বললে,
জান মেজ মা,
সমস্ত শুনে-টুনে জগদেও পাঁড়েও ভয় পেয়েছে!
চাঁপা যখন বললে,
বাঘকে আছড়ে মারা সোজা নাকি?
হালুম ক'রে একবার যদি তেড়ে আসে,
পালাতে পথ পাবে না তুমি।
শুনে পাঁড়ের মুখ
ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেল।
তারপর আমাকে চুপিচুপি বললে,

চাঁপা যা বলছে তা ঠিক,
একটা বন্দুকই তুমি যোগাড় কর ভেইয়া।
আমাকে একটা বন্দুক কিনে দাও মেজ মা,
আট্যিদের দোকানে আছে—
আমি দেখে এসেছি।
মেজ মা বললেন, আচ্ছা, সে হবে এখন,
আমাকে এখন ছাড় দিকি তুই।
পাঁড়েটার মতিচ্ছন্ন ধরছে যেন দিন দিন!
মেজ মা ছদ্ম কোপে গরগর করতে করতে
নেবে গেলেন নীচে।

বাড়ির যিনি বড় বউ,
তাঁর যে এককালে ডাকনাম ছিল অনু,
তা আজকাল প্রায় সকলেই বিস্মৃত হয়েছে,
এমন কি তিনি নিজেও বোধ হয়।
এখন তিনি বড় বউ,
বিকল্পে—বড়দি।
মিষ্টি অনু নামটা হারিয়ে গেছে।
অনু নামটা অবশ্য
গুরু-গম্ভীর অনন্তময়ীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।
কাকতালীয়বৎ
মানুষ মাঝে মাঝে
এমন দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয় যে,
অবাক হতে হয়।
অনুর যেদিন জন্ম হ'ল,
সেদিন পুরোহিত মশাই ওর নামকরণ করলেন
অনন্তময়ী।
কারণ সেদিন ছিল অনন্তচতুর্দশী।
কিন্তু নামটি যে
এমন হুবহু খাপ খেয়ে যাবে

মেয়েটির চরিত্রের সঙ্গে,
তা কেউ তখন ভাবে নি।
অদ্ভুত খাপ খেয়ে গেছে কিন্তু,
বড় বউ সত্যিই অনন্তময়ী।
বয়স চল্লিশের কাছাকাছি,
এই বাড়িতেই কাটল প্রায় পঁচিশ বছর,
কিন্তু কেউ কখনও তাঁর অন্ত পায় নি,
কেউ ধরতে পারে নি তাঁর ঠিক রূপটি কি।
বাইরের রূপ
এখনও যেন ফেটে পড়ছে।
এত বয়সেও লাবণ্য এতটুকু কমে নি।
আরও আশ্চর্য,
একই রূপ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হয়!
যখন পুজোর ঘরে থাকেন,
তখন নিষ্ঠাবতী পূজারিণী;
সেই মানুষই আবার প্রসাধন-কক্ষ থেকে বেরোন যখন,
তখন অভিসারিকা।
আদেশ করেন সম্রাজ্ঞীর মত,
আদেশ পালনও করেন পরিচারিকার মত বিনা বাক্যে।
রেগে গেলে যিনি আগ্নেয়গিরি,
প্রসন্ন হ'লে তিনিই স্বচ্ছসলিল দীর্ঘিকা।
অদ্ভুত অভিনেত্রী!
একই মুখে কমলার কমনীয়তা
এবং চামুণ্ডার বিভীষিকা ফোটাতে পারেন।
সুধামুখী নিমেষে রূপান্তরিত হতে পারে
উল্কামুখীতে।
পেলব পুষ্পহার
কখন যে ভুজঙ্গিনী হয়ে উঠবে,
কেউ বলতে পারে না।
সবাই তাই ভয় করে,

কেবল একজন ছাড়া,
তিনি বড়বাবু।
বড়বাবু বড় বউয়ের দিকে
ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার অবসরই পান নি জীবনে,
চেষ্টাও করেন নি।
বড়বাবু
দিলদরিয়া জমিদারের
দিলদরিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র।
নানা রঙ্গমঞ্চে তাঁর গতায়াত ;
গৃহ-রঙ্গমঞ্চেও যে
প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর আবির্ভাব হতে পারে,
সে খেয়াল করেন নি।
বিয়ে করেছেন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী,
সালঙ্কারা বউকে এনে স্থাপন করেছেন গৃহে—
একটা আসবাব
কিংবা বড় জোর একটা বিগ্রহের মত।
আসবাবের তদারকের
অথবা বিগ্রহের সেবার
যথারীতি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।
একটা আসবাব অথবা বিগ্রহ নিয়ে
উন্মত্ত হয়ে ওঠবার মত
হ্যাংলামি ছিল না তাঁর।
বড়বাবুর পরিচিত বহু নরনারীর মধ্যে
বড় বউও একজন,
তার বেশি আর কিছু নয়।
হয়তো বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারতেন বড় বউ,
প্রসাধন-বৈচিত্র্যময়ী অভিনেত্রীর অন্তরালে
হয়তো সত্যিকারের প্রিয়া একদিন দেখা যেত ;
কিন্তু ঘটনাচক্রে
ব্যবধানটা আরও বেড়ে গেল।

বাইরে মদ খেয়ে
স্ত্রীর ভয়ে এলাচ লবঙ্গ চিবুতে চিবুতে
চোরের মত অন্দর-মহলে ঢোকেন যাঁরা,
বড়বাবু সে জাতের লোক নন।
যথারীতি
ঈষৎ মত্তভাবেই
প্রবেশ করতেন অতঃপুরে।
বড় বউ একদিন আপত্তি জানালেন কুঞ্চিত নাসায়।
বড়বাবু ববলেন,
দেখ বড় বউ,
তুমি পান দিয়ে দোক্তা খাও, না, জরদা খাও,
কুমড়ো-ডাঁটা অথবা পুঁই-ডাঁটা
কোন্‌টা তোমার প্রিয়তর,
কি ধরনের শাড়ির পাড় তোমার পছন্দ,
তোমার গলায়
হার না চিক
কোন্‌টা ঠিক মানায়,
দোতলার জানলা দিয়ে পর-পুরুষের দিকে চেয়ে থাকতে
তোমার ভাল লাগে, কি, লাগে না—
এসব নিয়ে কোন দিন তো মাথা ঘামাই নি আমি!
ইচ্ছেই হয় না।
তোমার হঠাৎ এই নীচ প্রবৃত্তি কেন?
I was given to understand,
তুমি আমার সহধর্মিণী।
কোন উত্তর দিলেন না বড় বউ,
চুপ ক'রে ব'সে রইলেন নাসা কুঞ্চিত ক'রে।
বড় বউয়ের নাকের পানে
কিছুক্ষণ ঢুলু ঢুলু নয়নে চেয়ে থেকে
বড়বাবু বললেন, অল রাইট।
আর মদ খেয়ে তোমার সমীপস্থ হব না।

যখন তখন এবং যে কোন অবস্থায়
সমীপস্থ হবার রাইট আছে ব'লেই হব না।
I am a gentleman, madam,
অকারণে একজন লেডির নাসারন্ধ্রকে
বিক্ষুব্ধ করতে চাই না।
তুমি তোমার নানা রকম শাড়ির বাণ্ডিল
আর নানা রকম গয়নার বোঝা নিয়ে
সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।
সেই দিন থেকে আর মদ খেয়ে
অন্দর-মহলে আসতেন না তিনি।
যখন আসতেন, অত্যন্ত অবিচলিতভাবে আসতেন,
অবিচলিতভাবে থাকতেন,
অবিচলিতভাবে চ'লে যেতেন।
এবং এই ক'রেই জন্মাল
নীলু দত্তের ভ্রান্ত ধারণাটা।
নীলাম্বর দত্তের বিশ্বাস—
বড়বাবু বাইরে মদ খান
বড় বোয়ের ভয়ে।
হায় রে নীলু দত্ত!
বড়বাবুর খোশামদ কর বটে তুমি,
কিন্তু বড়বাবুর সমঝদার তুমি নও।
তাই
লাহিড়ীর কাছে বারংবার পরাস্ত হচ্ছ।
বড়বাবুর মদ খাওয়ার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল,—
যখন খেতেন,
তখন একটানা দু-তিন দিন খেতেন,
অর্থাৎ 'সেশন্‌স' চলত।
যখন খেতেন না,
তখন খেতেন না।
বড়বাবু যে ইংরেজী জানেন,

তা বোঝা যেত মদ পেটে পড়লে,
এবং তিনি যে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.,
তা কোন কালেই বোঝা যেত না।
শুধু যে স্ত্রীর প্রতিই তাঁর ঔদাসীন্য ছিল তা নয়,
আত্মীয়স্বজন,
বন্ধুবান্ধব,
জমিদারি, কলিয়ারি,
এমন কি ছেলেমেয়ের সম্বন্ধেও
তিনি উদাসীন।
পদ্মপত্রের মত তাঁর মনখানি,
কত শিশিরবিন্দুই যে তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে!
নতুন জামাই বাঘ শিকার করতে চেয়েছে?
বেশ তো, আসুক।
জয়দ্রথবধ কিংবা অভিমন্যুবধ শোনবার জন্যে
যদি সারারাত্রি শামিয়ানার তলায় কাটানো সম্ভব হয়,
শার্দূলবধ উপলক্ষ্যে
কলমিপুরের মাঠেই বা একরাত্রি কাটাতে আপত্তি কি!
ঢালা হুকুম দিয়েছেন নীলু দত্তকে,
চলুক আয়োজন।
বড় বউ কিন্তু উৎসাহিত হয়েছেন অন্য কারণে,
এবং সে কারণটা
আপাতদৃষ্টিতে এত ছেলেমানুষি,
এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এত নিগূঢ়
যে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে
পণ্ডিত-মহলে হাতাহাতি হবার সম্ভাবনা।
বড় বউ যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন,
তাক লাগিয়ে দিতে চান সকলকে।
এই তাক-লাগানো প্রবৃত্তিটা
তাঁর বংশগত।
যে বাড়ির মেয়ে তিনি,

সে বাড়ির সবাই
একটু উদগ্র রকমের আধুনিক।
দুজন ক্রিশ্চান হয়েছেন, দুজন ব্রাহ্ম,
আত্মহত্যা করেছেন একজন,
বাড়িতে শুধু বিলেত-ফেরত নয়,
জাপান-ফেরত লোকও আছেন।
সেকালের হিসেবে একটু বেশি বয়সেই,
অর্থাৎ পনেরো বছরে
বিয়ে হয়েছিল অনন্তময়ীর।
কিন্তু ওই পনেরো বছরের মধ্যেই
দাদাদের উৎসাহে,
গৃহশিক্ষকের সহায়তায়,
বাংলা ইংরেজী নভেল নাটক পড়বার বিদ্যেটা
আয়ত্ত করেছিলেন তিনি।
আধুনিক অনাধুনিক
সুপাচ্য দুষ্পাচ্য
নানাবিধ উপ এবং রূপ-ন্যাস
একদা ভারাক্রান্ত করেছিল তাঁর মানসিক পাকস্থলীকে।
উদ্গারের জ্বালায়
আধুনিকমনা দাদারা পর্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তেন।
কণ্ঠস্বর সত্যিই অনিন্দনীয় ছিল।
প্রাক্‌বিবাহযুগে
ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে
তাক লাগিয়ে দিতেন সকলের।
কিন্তু ভাগ্যবিধাতাও
তাক লাগাতে কম ওস্তাদ নন।
এই তন্বী আধুনিকাকে বানিয়ে ছাড়লেন
সনাতনপন্থী জমিদার-বাড়ির বড় বউ।
শরম-মন্থর পদক্ষেপে
তীক্ষ্ণভাষিণী রাশভারী শাশুড়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই

জীবনের লক্ষ্য হ'ল।
তিনি যে আধুনিকা,
সেটা এ বাড়িতে গৌরবের বস্তু হ'ল না।
সেটাকে লজ্জায় চাপা দিতে হ'ল ঘোমটার তলায়।
সনাতনী হিন্দুবাড়ির বড় বধূর ভূমিকাতেও
অনন্তময়ী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।
এমন কি,
মাঝে মাঝে ভুলেও যেতেন যে, অভিনয় করছেন।
এই ভাবেই দিন কাটছিল ;
স্তরের ওপর স্তর প'ড়ে
অবলুপ্ত ক'রে ফেলেছিল
নিত্যনবায়মানা আধুনিকাকে।
সহসা যৌবনের শেষ প্রান্তে
নিজের কলেজে-পড়া নবোদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ের সংস্পর্শে এসে
অন্তঃসলিলা ফল্গু উদ্বেল হয়ে উঠল।
বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার জামাই
মেয়েকে নিয়ে শিকারে যেতে চায়!
হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন,
জীবনটা বৃথাই গেছে।
হঠাৎ ঈর্ষা হ'ল—
মেয়ের ওপরই ঈর্ষা হ'ল।
সুরেনের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা কোলের ওপর প'ড়ে ছিল,
স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি,
ভাবছিলেন, যাব, কি যাব না ;
হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললেন, যাব, নিশ্চয় যাব,
ওদের তাক লাগিয়ে দিতে হবে।
কলমিপুরের মাঠে
এমন একখানা অভিনয় করতে হবে,
যা শুধু সুরেন-উষাকেই নয়,
বড়বাবুকেও বিস্মিত করবে।

চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন তিনি,
কি করবেন,
কোন্ শাড়িখানা পরবেন !
প্রৌঢ়া বড় বউয়ের পক্ষে এ আচরণ অশোভন ?
হয়তো।
উষার বয়স যদিও উনিশ হয়েছে,
শরীরে যৌবন সুপরিস্ফুট,
আই. এ. পাস করেছে,
তবু সে এখনও বালিকা—
ছটফটে, আদুরে, অসংসারী।
দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়,
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়,
ঠোঁট তো ফুলেই আছে।
একটু ধমক দিয়ে কথা বললে
এখনও চোখ ছলছল করে মেয়ের।
কোথায় কোন্ কথা কি ভাবে বলা উচিত,
অপ্রিয় সত্যকে
কি ক'রে একটু ঘুরিয়ে প্রিয় করতে হয়,
কখন চোখ নামানো উচিত,
কাপড় সামলানো উচিত—
কিচ্ছু জানে না।
অত জোরে কথা কওয়া,
অত চেঁচিয়ে হাসা,
অমন দুমদুমিয়ে চলা যে অশোভন,
সে জ্ঞান হয় নি এখনও ভাল ক'রে।
মন প্রস্তুত হবার আগেই
যৌবনটা এসে গেছে দেহে
অকালবসন্তের মত।
দেহটা যত নিটোল হয়েছে,
মনটা তত নিটোল হয় নি,

মনের এখনও অনেক পুরতে বাকি।
মনের গাম্ভীর্য আসে নি,
নিগূঢ়তা ঘনায় নি,
গোপনলোক আবিষ্কৃত হয় নি।
যা মনে আসে হাউহাউ ক'রে বলে,
স্বামীর চিঠি সবাইকে দেখায়,
কোন সঙ্কোচ নেই।
কোন কিছু রেখে-ঢেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।
বস্তুত সে প্রয়োজনই ঘটে নি ওর।
মনের যে পরিণতি হ'লে
মন গোপনতা-বিলাসী হয়,
সে পরিণতিই হয় নি।
ও যদি আর একটু গম্ভীর হ'ত,
তা হ'লে এই ব্যাপার নিয়ে
এমন ক'রে পাড়া গাবিয়ে বেড়াত না।
এই শিকার-অভিযানে
ওই যে কেন্দ্রবর্তিনী,
ওর স্বামীই যে এই অভিযানের নেতা—
তা ও নিজেও ভুলছে না,
কাউকে ভুলতেও দিচ্ছে না।
একমুখ পান খেয়ে
পাড়ায় পাড়ায়
নিজের মনের খুশির ঢাকটা পিটিয়ে বেড়াচ্ছে।
বকবকানির চোটে
সাদা কাপড়ে লেগেছে পানের ছোপ খানিকটা,
সাদা গালেও—
তির্যকভাবে,
অসাবধানে ঠোঁট পুঁছতে গিয়ে।

মীনা মেয়েটি,

গাণিতিক নিয়ম অনুসারে,
ঊষার সমবয়সী।
কিন্তু আসলে মীনা ঢের বেশি বড়।
তার প্রমাণ—
ওর সন্নত দৃষ্টিতে
মৃদু কথাবার্তায়,
সংযত গমনভঙ্গিমায়।
নিজেকে বিজ্ঞাপিত করবার কোন চেষ্টা তো নেইই,
অবলুপ্ত করতে পারলে যেন বাঁচে;
এবং সেইজন্যই সম্ভবত
আরও বেশি করে প্রত্যক্ষ-গোচর।
যখন যেখানে থাকে,
চুপ ক'রেই থাকে,
কিন্তু পূর্ণ ক'রে রাখে সমস্ত স্থানটা।
ওর সসঙ্কোচ মৌনতা
মুখরতম বিজ্ঞাপনের চেয়েও আকর্ষক।
অর্থাৎ
মীনা সত্যিই যুবতী।
রূপসী কি না,
সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে,
আছেও।
বিয়ের বাজারে
জ্যামিতি-পরিমিতিজ্ঞ
যেসব রংরেজ সমঝদারেরা
নাকের মাপ, চোখের পরিধি,
ঠোঁটের স্থূলতা, বর্ণের ঘনত্ব মেপে বেড়ান,
তাঁরা
মীনাকে পাস-মার্কা দেন নি।
পাঁচ-সাত বার
পাঁচ-সাত দল লোক দেখে গেছেন,

কেউ পছন্দ করেন নি।
বিধাতার এই সৃষ্টিটিতে
নানা রকম খুঁত দেখতে পেয়েছেন তাঁরা।
কেরানী, ডাক্তার, উকিল, মাস্টার,
দালাল, দোকানদার,
এমন কি বেকার পাত্রেরও
পাণিপীড়ন করবার সামাজিক অনুমতি
মীনা পায় নি।
মাপ-জোকে অনেক খুঁত ধরা পড়েছে।
রঙ কালো,
চোখ ছোট,
নাক খাঁদা,
চুল কম।
শ্রী?
ওটা তো মাপা যায় না,
সেইজন্যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।
তা ছাড়া,
কালো রঙ, ছোট চোখ, খাঁদা নাক, কম চুলকে
অর্থপূর্ণ করতে পারতেন যে অর্থবান পিতা,
তিনিও নেই।
তিনি মীনার বাল্যকালেই মারা গেছেন।
মা লেখাপড়া জানতেন,
তাই
পরের গলগ্রহ হতে হয় নি।
শিক্ষয়িত্রীগিরি ক'রে মানুষ করেছেন মেয়েকে
স্কুলের কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন,
বি. এ. পাস করলে
মীনাকেও বাহাল ক'রে নেবেন ইস্কুলে।
এই ভবিষ্য জীবনের অনুপাতেই
নিজেকে প্রস্তুত করছে মীনা।

তার অসংযত আশা
অশোভন মত্ততায়
আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে নি কখনও।
সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সে সন্তুষ্ট ছিল।
ঊষার বাড়িতে এসে,
তাদের ঐশ্বর্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে
আরও কেমন যেন বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে সে।
সর্বদাই সশঙ্কিত—
পাছে কেউ কিছু মনে করে ;
পাছে কেউ মনে করে,
এ বাড়িতে সে বেমানান আগন্তুক,
এ বাড়ির উঁচু-পর্দায়-বাঁধা চালচলনের সঙ্গে
চলতে পারছে না তাল রেখে ;
পাছে তার অনাভিজাত্য আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলে।
তাই,
মনে মনে সশঙ্কিত হয়ে থাকলেও
মীনা বাইরে সপ্রতিভ।
এবং এই সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখবার জন্যেই সে
কৃত্রিম একটা উৎসাহ প্রকাশ করছে
এই শিকার-বিষয়ে।
আসলে সে নির্জনতাপ্রিয়,
ভালবাসে
ঘরের কোণে
চুপ ক'রে একখানা বই নিয়ে প'ড়ে থাকতে।
হৈ-চৈ ভিড় মোটেই ভালবাসে না।
কিন্তু
কেউ যদি মনে মনে ভাবে,
মাস্টারনীর মেয়ে তো হাজার হোক,
এসবের মর্ম ও আর কি বুঝবে !
তাই,

অতিশয় মেকী একটা উৎসাহকে
চোখে মুখে ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে সে—
মর্মান্তিক বেদনাকে ঢাকবার জন্যে
লোকে যেমন হাসে,
অনেকটা তেমনই।

অন্তঃপুরের অন্যান্য পরিজনেরা
খুব যে একটা উৎসাহ প্রকাশ করছিলেন তা নয় :
করবার কথাও নয়।
বৃদ্ধা পিসীমা হাঁপানি নিয়েই ব্যস্ত,
বুকে পিঠে পুরনো ঘি মালিশ ক'রে
অতি কষ্টে দাওয়ায় এসে বসেন সকালবেলায় ;
পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যায়।

গিন্নীর দূরসম্পর্কের বিধবা বোন-ঝি
প্রাণপণে বৈধব্য পালন করেন,
নিয়মের পান থেকে এতটুকু চুন খসবার জো নেই,
মাথার চুল বেটাছেলের মত ছাঁটা,
নানা ওজুহাতে প্রায়ই উপবাস করেন,
একাদশীর উপবাসটা এমন নিদারুণ রকম নির্জলা যে,
নিষ্ঠীবন পর্যন্ত গলা দিয়ে গলতে দেন না,
সারাদিন ব'সে থুতু ফেলেন।
মাত্র উনত্রিশ বছর বয়স,
কিন্তু কৃচ্ছ্র-ক্লিষ্ট কি কঠোর মুখমণ্ডল!
তিনি এ অভিযানে যোগদান করবেন কি না,
সে প্রশ্নই ওঠে না।

আর একজনের সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে না,
সে শিবুর মা।
বাড়ির অনেক কালের পুরনো ঝি—

বড়বাবুকে হতে দেখেছে।
সে কক্ষনও কোথাও যায় না।
শনের মত সাদা মাথার চুল
পীতাভ হয়ে এসেছে,
জরার প্রকোপে মুখখানা হয়েছে পোড়া বেগুনের মত,
হাতের লোল-চর্মের তলায় দেখা যাচ্ছে মোটা মোটা শিরাগুলো,
মাথা কাঁপে,
গলার স্বরও কাঁপে,
কুঁজো হয়ে গেছে,
দু চোখে পিচুটি ভরা।
শিবুর মা কক্ষনও কোথাও যায় না,
বলে, একেবারে যমের বাড়ি যাব।
যমও কিন্তু ভুলে আছে।
কত লোকের মরণই যে দেখলে শিবুর মা,
আরও হয়তো কত দেখতে হবে!
অদৃষ্টে যা আছে রোধ করবে কে!
কিন্তু সে ভিটে ছেড়ে কোথাও নড়বে না,
সবাই যেখানে যাবার যাক,
শিবুর মা ভিটে আগলে প'ড়ে থাকবে,
আর বকর বকর করবে আপন মনে।

জিতুর মা,
অর্থাৎ দূরসম্পর্কের সেই মাটো ননদটি
যাবে।
হয়তো যেত না,
(বিধবারা আবার শখ ক'রে কোথায় যায়!)
কিন্তু বুড়ো গিন্নীমা যাবেন,
শুদ্ধাচারে তাঁর রান্নাবান্না করবার জন্যে
একজন চাই তো!
আজকাল জিতুর মা-ই সব করে।

মাটো স্বভাবের জন্যে বকুনি খায় সকলের কাছ থেকে,
কিন্তু বেচারী নীরবেই কাজ ক'রে যায়
চুপটি ক'রে
মুখটি বুজে।

জিতুর মা ছাড়া আর যাবে
তিন বউয়ের তিনজন খাস চাকরানী,
আর তিন বাবুর তিনজন খাস চাকর।
চাকরানীদের মধ্যে
লছমনিয়ারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।
কারণ তার বয়স সব চেয়ে কম।
বড় বউ
নিজের বাপের বাড়ি পাটনা থেকে
আনিয়েছেন লছমনিয়াকে!
ওর স্বামী ভিকুও চাকরি করে এ বাড়িতে,
ছোটবাবুর খানসামা সে।
লছমনিয়া বেহারিনী,
কিন্তু বাংলা বলে চমৎকার,
এত চমৎকার যে ধরা শক্ত।
রঙানো ফুলপাড় পাতলা শাড়িটি প'রে
মাথার চুলটি পরিপাটি ক'রে বেঁধে
সর্বদাই ছিমছাম;
ছিপছিপে চেহারা,
তারি খরখরি,
দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।
ভিকুও যাবে।
ভিকু বেচারী ভালমানুষ-গোছের লোক,
লছমনিয়ার মত স্ত্রীকে নিয়ে
সর্বদাই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়,

লছমনিয়ার সঙ্গে জোড় মেলে নি।
কিন্তু আপাতদৃষ্টিটাই কি সব ?
সব যবনিকাই কি সুভেদ্য ?
মেজ মার চাকরানী কাদম্বিনী—
সংক্ষেপে কাদু,
এই গ্রামেরই মেয়ে।
চার-পাঁচ ছেলের মা,
ভারিক্কি চেহারা।
হাতে কপালে উল্কি,
বাহুমূলে থলথল করছে চর্বি,
সর্বদাই একমুখ হাসি,
ভারি মিষ্টভাষিণী।
প্রত্যহ
প্রকাণ্ড গামলায় ক'রে ভাত,
এক জামবাটি ডাল,
তদুপযুক্ত তরকারি নিয়ে
সে বাড়ি যায় দুপুরে
ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে।
স্বামীটি অকর্মণ্য,
এককালে গাড়োয়ানি ক'রে কিছু উপার্জন করত,
কিছুদিন থেকে বাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছে।
মেজ মার দাক্ষিণ্যেই সংসার চলছে।
মেজ মার সঙ্গে যেতে হবে শুনে
কাদম্বিনীর চিন্তা হ'ল
ছেলেমেয়েদের আর স্বামীকে দেখবে কে !
মেজ মা বললেন,
তার ব্যবস্থা করবেন তিনি মেজবাবুকে ব'লে।
করলেনও।
মেজবাবু ছোটবাবুকে বলেছেন
এবং ছোটবাবু আদেশ করেছেন নীলু দত্তকে।

ছোটবাবুর আদেশ শুনে
নীলু দত্তের মনে হ'ল,
আঃ, ফ্যাসাদ এক রকম !.
বাইরে অবশ্য অন্য ভাব দেখালেন,
কুঞ্চিত কপাল থেকে ঘামটা মুছে ফেলে বললেন,
ওর জন্যে আর ভাবনা কি,
এক্ষুনি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।
ব'লে দিলেন অতিথিশালার পাচককে,
কাদম্বিনীর বাড়িতে যেন রোজ ভাত দিয়ে আসা হয়।
তবু কাদম্বিনীর মন খুঁতখুঁত করছে—
কোলের ছোট ছেলেটা কি ছেড়ে থাকতে পারবে ?
অত দূরে টেঙিয়ে টেঙিয়ে নিয়ে যাওয়াও তো মুশকিল।
বড় মেয়ে সদুর কাছেই রেখে যেতে হবে,
তা ছাড়া আর উপায় কি !

তরঙ্গিণীর চাকরানী কালীর মা।
বিধবা,
কৈবর্তের মেয়ে।
বিধবা ব'লেই যে শ্রীহীন তা নয়,
গড়নই ওই রকম।
লম্বা শুকনো কাঠ-কাঠ চেহারা,
সর্বাঙ্গে
মাংসের চেয়ে হাড়ই বেশি,
চক্ষু কোটরগত,
হাসলে দাঁতের চেয়ে বেশি দেখা যায় মাঢ়ী।
কালীর মাকে দেখে
চেষ্টা ক'রেও মুগ্ধ হওয়া শক্ত।
কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে
তরঙ্গিণীর অন্তরঙ্গিণী।
তার কারণ

সে চমৎকার ঘর পুঁছতে পারে,
চমৎকার সাবান কাচে,
পরিষ্কার বাসন মাজে,
বিছানা করে পরিপাটিরূপে—
একটু কোথাও কুঁচকে থাকে না,
টেবিল, দেরাজ, আয়নায় জমতে দেয় না ধুলো।
কালীর মার কল্যাণে
তরঙ্গিণীর ঘরদোর, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন
তকতকে, ধপধপে, ঝকঝকে।
অথচ মুখে রা-টি নেই ;
চুরি করে না,
হাতে তুলে যা দাও তাতেই সন্তুষ্ট।
ভগবান রূপের অভাব পূর্ণ করেছেন গুণ দিয়ে।
শিকারে যাবার কথা শুনে
সে আনন্দিত হ'ল, কি দুঃখিত হ'ল, কি বিস্মিত হ'ল,
কিচ্ছু বোঝা গেল না।
কারণ, কথা সে বড় একটা বলে না,
মুখও তার ব্যঞ্জনাবিহীন।

বড়বাবুর খানসামা নীলমণিও নির্বিকার।
বড়বাবুর সঙ্গে সে এত জায়গায় ঘুরেছে
এবং এত জিনিস দেখেছে যে,
এই সব ছোটখাটো ব্যাপায়ে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠাটা
সে আত্মমর্যাদাহানিকর ব'লেই মনে করে।
নীলমণির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি,
রঙটি কালো,
জুলপির চুলগুলিতে পাক ধরেছে,
গোঁফও কাঁচাপাকা।
গায়ে পরিষ্কার সাদা ফতুয়া,
কাঁধে একটি ঝাড়ন।

চোখ-মুখে
বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্ট, কিন্তু নীরব।
সব জানে, সব বোঝে,
কিছু বলে না।
অকারণে অনাবশ্যকভাবে
কখনও প্রকট করে না নিজেকে,
প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন কথা বলে না
এবং প্রাণ গেলেও এমন কিছু করে না,
যা বড়বাবুর বিরক্তিকর।
বড়বাবু বাইরে যাবেন শুনে
সে নির্বিকারভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

মেজবাবুর খানসামা বিশ্বম্ভর
একটু রুদ্রপ্রকৃতির লোক,
কথায় কথায় লোকের মাথা ফাটাতে উদ্যত হয়।
মেজবাবু সর্বদাই তাকে সামলে চলেন।
মেজবাবুর ভাবটা অনেকটা এই রকম—
পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই প্রহারযোগ্য তা জানি,
তুমি যা বলছ তা ঠিকই,
কিন্তু শান্তিতে বাস করাও তো দরকার!
ছুঁচো কি এক-আধটা যে, মেরে শেষ করবে!
কাঁহাতক হাত গন্ধ করবে তুমি,
চ'লে এস।
বিশ্বম্ভর সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসে,
ওই একটি মস্ত গুণ তার।
শিকারের কথা শুনে
সে সর্বাগ্রে
তার তৈলপক্ক বাঁশের বেঁটে মোটা লাঠিটা পেড়ে
তেল মাখাতে লাগল তাতে!

মেজবাবু লোকটিও শোনা যায়,
যৌবনকালে পরাক্রান্ত ছিলেন !
খুব হাত চলত,
প্রায়ই লেগে থাকত একটা না একটা ফৌজদারি ।
শায়েস্তা করতেন
বড় বড় দুরন্ত ঘোড়া, পাগলা হাতী ।
সময় কাটত কুস্তির আখড়ায় ।
কিন্তু হঠাৎ একবার পদস্খলিত হয়ে
কেমন যেন মুষড়ে গেছেন ।
দুরারোগ্য প্রমেহ ব্যাধিতে,
শারীরিক যতটা না হোক,
মানসিক প্রাবল্যটা লোপ পেয়েছে ।
বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা—
শালপ্রাংশুমহাভুজ ব্যক্তি,
নিতান্ত ভালমানুষটি হয়ে গেছেন আজকাল ।
নিজের সমস্ত দুষ্কৃতির কথা অকপটে স্বীকার ক'রে
মেজ মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন মেজবাবু,
এবং তাঁরই স্নেহাঞ্চলের ছায়ায়
বাস করছেন নির্বিরোধে ।
এই শিকার ব্যপদেশে উৎসাহিত হয়েছেন
মেজ মারই উৎসাহে,
সূর্যের আলোকে প্রদীপ্ত চন্দ্রের মতন ।

ছোটবাবু কিন্তু এখনও আছেন বেশ জবরদস্ত ।
বড়বাবু খামখেয়ালী উদাসীন,
মেজবাবু নির্বাপিত,
ছোটবাবুই আসলে জমিদার ।
দাদাদের মতন বিরাটকায় নন যদিও,
কিন্তু চেহারাটা তাঁর চেয়ে দেখবার মত ।
ধপধপে রঙ,

কস্‌মেটিক-লাগানো স্বচ্যগ্র কালো কুচকুচে গোঁফ,
চওড়া ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ,
আরক্ত আয়ত চক্ষু দুটি
শ্রী ও শালীনতায় জ্বলজ্বল করছে।
অধরে চিবুকে
শক্তি ও সংযমের সমন্বয়।
সমস্ত মুখমণ্ডলে
অভিজাতসুলভ দর্প প্রদীপ্ত অথচ প্রচ্ছন্ন।
ছোটবাবুকে কেন্দ্র ক'রে
হিরণপুর গ্রামে
নানা গুজব আবর্তিত হয় নানা রসনায়।
চিরকালই হবে।
কারণ,
এমন একটা কন্দর্পকান্তি জমিদারপুত্র
অরিত্র—
বিশ্বাস করা কঠিন।
সুতরাং
কল্পনাকুশল বহু 'প্রত্যক্ষদর্শী'
বহু রকম কাহিনী বিবৃত করেন গোপনে গোপনে।
ভয়ও করেন সকলে ছোটবাবুকে,
চেহারাটা দেখলেই মনে হয় কড়া মেজাজের লোক!
আসলে কিন্তু
অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির লোক তিনি।
দাদাদের পুরোভাগে রেখে
তিনি পরিচালনা করেন সমস্ত।
প্রাচীন ম্যানেজার সীতানাথবাবু
(প্রশস্ত টাক, পাকা ভুরু)
নির্ভরযোগ্য একজন মনিব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।
নায়েব চৌধুরী
কিন্তু খুশী হন নি মোটেই।

ছোটবাবু যতদিন
লেখাপড়া নিয়ে ছিলেন কলকাতায়,
ততদিন মান-খাতির ছিল চৌধুরীর।
দিলদরিয়া বড়বাবু,
শিবতুল্য মেজবাবু
কখনও চৌধুরীর কথার ওপর কথা কন নি ;
চৌধুরী যা করতেন তাই হ'ত,
সীতানাথবাবুও মানতেন তাঁর কথা।
কিন্তু ছোটবাবু আসাতে
বদলে গেল সব।
ছোটবাবু নিজেই মহালে মহালে ঘোরেন,
প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্তা কন,
বিচার-ব্যবস্থা করেন ;
সীতানাথবাবুও
অবস্থা বুঝে সায় দেন তাতে।
চৌধুরী হয়ে পড়েছেন কেরানী মাত্র।
তাই
হরিদ্বার-ফেরত কুঞ্জলালের দল
যখন চৌধুরীকে গিয়ে ধরলে,
আমরাও শিকারে যাব নায়েব মশাই ;
চৌধুরী বললেন,
আমি কিছু জানি না ভাই,
যাও ছোটবাবুর কাছে।
আজকাল আমাদের কথার মূল্য নেই,
তাই
নিজেদের মান বাঁচাবার জন্যে
কোন কথাতেই থাকি না আমরা।
কুঞ্জলাল বললে,
ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে বললে কেমন হয় ?
চৌধুরী ঈষদ্রুষ্ট হলেন,

একটু মুখবিকৃতি ক'রে পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটা
ম্যানেজারবাবুকে বললে কি হয়!
যা বললাম, তাই করগে যাও।
ম্যানেজারবাবু নেই'ও এখানে,
দিনাজপুর গেছেন সাক্ষী দিতে।
থাকলেও—হুঁঃ—!
সম্পূর্ণ করলেন না তিনি কথাটা,
তবে বোঝা গেল স্পষ্ট,
স্বয়ং চৌধুরীই যখন অপারক,
তখন ম্যানেজার থাকলেই বা কি করতেন!
কুঞ্জলাল গেল অবশেষে ছোটবাবুর কাছেই,
একটু ভয়ে ভয়ে।
নিশ্ছিদ্র চরিত্রের লোককে সবাই ভয় করে।
ছোটবাবু কিন্তু খুশী হলেন।
বললেন, নিশ্চয়, যাবে বইকি।
হরিদ্বার থেকে ফিরলে কবে সব?
—আজ সকালে।
—কজন আছ তোমরা?
জন পাঁচেক—
হাবুল, পাঁচু, বীরেন, বঙ্কু আর আমি।
—বেশ, যেয়ো সব,
কাল সকালেই আমরা বেরুব—
ভোর চারটেয়।
জামাই আজ রাত্রেই এসে পৌঁছবে।
কিন্তু হাতীতে তো কুলোবে না সকলের।
তোমরা—।
একটু ইতস্তত করতে লাগলেন ছোটবাবু।
কুঞ্জলাল বললে,
আমরা গরুর গাড়িতেই যাব সবাই,
হেঁটেও যাব খানিকটা।

—বেশ, তা হ'লে তো কথাই নেই।
হৃষ্ট কুঞ্জলাল ছুটল খবর দিতে।
হাবুল, পাঁচু, বীরেন, বঙ্কু এবং কুঞ্জলাল
সেই বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত,
যা বাংলা দেশে বেকার নামে প্রখ্যাত।
টাকা রোজগার করতে পারে না যদিও,
কিন্তু নির্গুণ নয়।
মাথায় বাবরি,
শ্যামবর্ণ, বেঁটে কুঞ্জলাল
ওস্তাদ বংশীবাদক।
শুধু তাই নয়,
গ্রামের অ্যামেচার থিয়েটার-পার্টিটির
ও-ই আত্মাস্বরূপ।
নানা অসুবিধার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে থিয়েটারটিকে
জমিদারবাবুরা সেই জন্যেই বিশেষ ক'রে
স্নেহ করেন কুঞ্জলালকে।

বঙ্কুর হাসাবার ক্ষমতা আছে,
অর্থাৎ লোকে বঙ্কুকে দেখলেই হাসে।
চলিত ভাষায় যাকে বলে গন্না-কাটা, বঙ্কু তাই।
ইংরেজীতে বলে 'হেয়ার-লিপ'।
অর্থাৎ খরগোশের মতন
ওপরে-ঠোঁটের মাঝামাঝি
নাকের নীচেই খানিকটা নেই,
এবং সেই ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে
হলদে রঙের গোটা দুই দাঁত।
তালুতেও নাকি একটা ছিদ্র আছে,
চন্দ্রবিন্দুসমন্বিত হয়ে পড়ে তাই কথাগুলো।
বন্ধুদের মনে হাস্যরস সৃষ্টি করবার পক্ষে
বিধাতার এই কারুকার্যটুকুই তো যথেষ্ট ছিল,

এর ওপর বঙ্কু কেন যে
ছাগলের মত খানিকটা দাড়ি
এবং কুৎসিত এক জোড়া গোঁফ রেখেছে,
তা বঙ্কুই জানে।
বঙ্কু পারতপক্ষে কথা বলে না, হাসে না,
কোথাও যেতে চায় না।
কিন্তু বন্ধুদের দল নাছোড়।
তারা যেখানে যাবে, বঙ্কুকে টেনে নিয়ে যাবেই
এবং চেষ্টা করবে চটিয়ে দিতে।
চ'টে গেলে বঙ্কু নাকি মূর্তিমান হাস্যরস হয়ে ওঠে

হাবুলের নানা খ্যাতি।
স্বাস্থ্যবান সুন্দর যুবক।
ভাল গোল বাঁচাতে পারে,
ফিমেল পার্ট করতে পারে,
পরিবেশন করতে পারে,
মড়া পোড়াতে পারে,
আরও অনেক কিছু পারে।
কিন্তু প্রত্যেক কার্যটি করবার সময়
এমন একটা 'তেরিয়া' ভাব নিয়ে থাকে,
সাদা বাংলায় যার অর্থ—
বেশী ঘাঁটিও না আমায়,
ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।
দুটো মিষ্টি কথা ব'লে
কাজ আদায় করতে হয় তার কাছ থেকে।

বীরেন হচ্ছে এদের মধ্যে কৃতবিদ্য।
বি. এ. পাস,
নানা রকম খবর জানে,
রাখে,

বিতরণ করে।
গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর নিগূঢ় কারণ কি,
জ্যানেট গেনারের বয়স কত,
আগামী বারে কে মেয়র হবে,
অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে কে কত রান করলে,
শরৎবাবু 'প্রবাসী'তে কেন লিখতেন না,
আধুনিক কোন্ লেখকের কি কি দোষ,
রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থা কেমন,
জাপানীরা জিনিস সস্তা করে কি উপায়ে,
ডি ভ্যালেরা, ম্যাক্সিম গোর্কি, ইসাডোরা ডান্‌কান,
মারোয়াড়ীদের পলিসি,
পি. সি. রায়ের উদ্দেশ্য,
হরিজন,
সাফ্রাজেট্‌স্‌,
কো-এডুকেশন,
শিশির ভাদুড়ী —
বীরেনের জ্ঞান-ভাণ্ডারও যেমন অফুরন্ত,
শ্রোতাদের ধৈর্যও তেমনই অফুরন্ত।
বীরেন অবশ্য ঠিক এ দলের উপযুক্ত নয়,
ওর পালক ভিন্ন জাতের।
কিন্তু যতদিন একটা চাকরি না জুটছে
এবং উদারতর আকাশে না পাখা মেলতে পারছে,
ততদিন বক-সমাজেই বাস করতে হচ্ছে হংসকে।

পাঁচু বেচারার প্রদর্শন করবার মত
কোন গুণ নেই যদিও,
কিন্তু ওকে ছাড়া চলবার উপায় নেই।
ইংরেজীতে যাকে বলে—ইউস্‌ফুল।
বিছানা বাঁধতে বল,
গাড়ি ডাকতে বল,

রাত ছুপুরে বিড়ি কিনে আনতে বল,
মশারি খাটাতে বল,
এমন কি পা টিপে দিতে বল,
সবেতেই রাজী।
ফাইফরমাশ খাটতে অদ্বিতীয়,
হাসিমুখে
নির্বিচারে
সব করবে।
অর্থাৎ
পাঁচু অলঙ্কার নয়,
অপরিহার্য।
কিন্তু বঙ্কুর ও মহাশত্রু।
কাকের পিছনে ফিঙের মতন
সর্বদাই লেগে আছে।

জমিদার-বাড়ির এই মৃগয়া-অভিযানে
যোগদান করতে পেয়ে
উৎফুল্ল হ'ল সবাই।
হরিদ্বারের রেশটা কাটতে না কাটতেই
বাঘ শিকার!
কলমিপুরের মাঠে যেতে হবে!
দূর ব'লেই মজাটা আরও বেশী।
কলমিপুরের মাঠ কি এখানে?
হিরণপুর ছাড়িয়ে নতুনগঞ্জ,
তার পর চাটুজ্জেদের হাট,
চাটুজ্জেদের হাট পেরিয়ে রতনদীঘি,
রতনদীঘির পর বাতাসপুর
(বিখ্যাত গুড়ের পাটালি হয় যেখানে),
বাতাসপুর ছাড়িয়ে আর একটু গেলেই
বিখ্যাত জলন্ধর বিল।

সেই বিলের ধার দিয়ে দিয়ে
প্রায় ক্রোশখানেক যাবার পর
কালভৈরবের মাঠ
(এককালে মানুষ ঠেঙিয়ে মারত নাকি সেখানে),
মাঠটাও ক্রোশখানেক।
মাঠ পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই
ঘেঁষাঘেঁষি তিনটে গ্রাম।—
প্রথমে নালতে,
নালতের গায়েই শঙ্করা
(বাবুদের একটা কাছারি আছে সেখানে),
তার পর ছাতিমপুর।
ছাতিমপুর ছাড়িয়েই কাঁকন নদীটা,
এখন অবশ্য শুকিয়ে গেছে,
বর্ষাকালে কাঁকন কিন্তু খরস্রোতা।
কাঁকনের পর রাজহাট,
তার পর তপসেডাঙা,
তপসেডাঙার পর কলমিপুর।
কলমিপুর আমের কলমের জন্য বিখ্যাত,
আশেপাশে কেবল আমবাগান।
কলমিপুর গ্রাম থেকে ক্রোশখানেক দূরে
একটা শালবন।
শালবনের ওধারে কলমিপুরের মাঠ,
মাঠের ওপাশ দিয়ে ব'য়ে গেছে ময়না নদী,
নদীর ওপারে আবার বন,
সেই বনে এসেছে বাঘ।

পথে

১

নীলু দত্ত কাজের লোক। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মতে যাহা কর্তব্য, তাহা সর্বাগ্রেই কর্তব্য। শেষ মুহূর্তে অকূল পাথারে পড়িয়া হাঁসফাঁস করে বেকুবেরা। ওই তেপান্তর মাঠে এতগুলি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম চাহিদা মিটাইতে হইলে সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্বাহ্ণেই না করিলে চলে? সুতরাং শুধু ত্র্যহস্পর্শের ভয়েই নয়, দায়িত্বের তাড়াতেই এবং লাহিড়ী-সম্পর্কিত খুঁতখুঁতানি সত্ত্বেও দত্ত মহাশয় পনেরোখানা গরুর গাড়িতে তাঁবু প্রভৃতি আসবাবপত্র বোঝাই করিয়া সাইক্ল্ সহযোগে আগের দিনই রওনা হইয়া গিয়াছেন। বাকি দশখানা গাড়ি আজ যাইতেছে।

এই গাড়িগুলিতে অল্পস্বল্প জিনিসপত্র আছে, লোকজনও আছে। বাড়ির চাকর-চাকরানীরা, হরু মণ্ডল, তিনু চাটুজ্জে, তালুকাদার মশাই, হরিশ খুড়ো, রোগা নিতাই, গোহম্‌নি, কুঞ্জলালের দল—সকলেই গরুর গাড়িতে চলিয়াছে। হাতী, পালকি, ঘোড়া আগাইয়া গিয়াছে। অগ্রবর্তী গাড়িটি বিরিঞ্চির। সে-গাড়িতে গোহম্‌নি ছাড়া আর কেহ নাই, বিরিঞ্চি আর কাহাকেও বসিতে দেয় নাই। গোহম্‌নি আপন মনে বসিয়া চিনাবাদাম-ভাজা ছাড়াইয়া খাইতেছে এবং স্মিতমুখে বিরিঞ্চির আবোল-তাবোল শুনিয়া যাইতেছে। নূতন-কেনা নীল রঙের শাড়িখানিতে চমৎকার মানাইয়াছে তাহাকে।

দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন স্থূলকায় তিনু এবং রোগা নিতাই। এরূপ বেমানান যোগাযোগের কারণ উভয়েই স্বজাতি এবং তাম্রকূটবিলাসী। স্বভাবেরও খানিকটা মিল আছে। নিতাই কৃশতা সত্ত্বেও বীরত্বাভিমানী, তিনু স্থূলতা সত্ত্বেও ক্ষিপ্রতাবিলাসী। তিনু কখনও মন্থর গজেন্দ্রগমনে হাঁটেন না, হনহন করিয়া হাঁটাই তাঁহার রীতি। সামনে ছোটখাটো নালা নর্দমা দেখিলে লাফাইয়া পার হইবার চেষ্টা করেন, আমগাছের নীচু ডালের দোদুল্যমান আমটা লাফাইয়া না পাড়িতে পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। অর্থাৎ তিনি যে মোটা বলিয়া অকেজো, এ কথা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিবার আকাশ তিনি কাহাকেও দিতে চান না। দ্বিতীয়-পক্ষে বিবাহ করার পর হইতে তাঁহার চটপটে ভাবটা আরও যেন একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

নিতাই হুঁকাটিতে দীর্ঘ শেষ টানটি দিয়া তাহার মুখটি মুছিয়া তিনুর হাতে দিল।

আছে কিছু অবশিষ্ট ?

দেখই না টেনে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনু টান দিলেন। বেশ ধোঁয়া বাহির হইল। ভ্রূ পুনরায় মসৃণ হইয়া গেল, তিনি প্রসন্ন চিত্তে টানিতে লাগিলেন। নিতাই আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের এক কোণে স্তূপীকৃত ধোনা-তুলার মত বিরাট একটা স্তূপ মেঘ পড়িয়া আছে। একটা শকুনি বহু ঊর্ধ্বে চক্রাকারে উড়িতেছে।

তৃতীয় গাড়িতে ছিলেন গাদা-বন্দুক-হস্তে তালুকদার মশাই এবং তাঁহার বন্ধু হরিশ খুড়ো। হরিশ খুড়োর গল্প শুনিতে রাজী হইলেই হরিশ খুড়োর সহিত সৌহার্দ্য জন্মিয়া যায়। তালুকদার তাঁহার গল্পশুনিয়ে বন্ধু। এমন মনোযোগী শ্রোতা হিরণপুরে দুর্লভ। এখন যদিও তালুকদার ঠিক মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি খুড়ো নিরস্ত হন নাই। খুড়ো কল্পনাবান ব্যক্তি। এতক্ষণ নানারূপ বাঘের ভীষণ রূপ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিতেছিলেন যে, যেন তিনি বহু বাঘ বহু বার ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ কয়িয়াছেন। এখন তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, গাদা-বন্দুকই ব্যাঘ্র শিকারের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র।

তালুকদারের দৃষ্টি কিন্তু চতুর্থ গাড়িতে নিবদ্ধ।

খুড়ো বলিতেছিলেন, রাইফেল-মাইফেল অনেক রকম বেরিরেছে বটে, কিন্তু তোমার ও-অস্তরের কাছে কেউ লাগে না। বনেদী ক্ষীরের কাছে কন্‌ডেন্‌স্‌ড মিল্ক লাগে কখনও ? দাও, একটা বিড়ি দাও।

চতুর্থ গাড়িতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই তালুকদার হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত চালাইয়া বিড়ির কৌটাটি বাহির করিলেন। খুড়োকে একটি দিলেন, নিজেও ধরাইলেন।

তালুকদারের অঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত খাপ না খাইলেও যে পোশাক তিনি পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা শিকারেরই উপযোগী। কালো রঙের হাফপ্যাণ্ট, খাকী রঙের হাফশার্ট, বাদামী রঙের বুট। তালুকদারের গলাটা একটু অস্বাভাবিক রকম লম্বা ও ছিনে বলিয়া শোলার হ্যাটটা তেমন মানায় নাই। তা না মানাক, রোদ ঠিক আটকাইতেছিল। বিড়িটি ধরাইয়া তালুকদার পুনরায় চতুর্থ গাড়ির দিকে চাহিলেন।

চতুর্থ গাড়িতে ছিল লছমনিয়া, কাদাম্বিনী, কালীর মা। ভিকুও এই

গাড়িটার পিছনে পিছনে হাঁটিয়া আসিতেছিল। প্রায় শেষের দিকের একখানা গাড়িতে নীলমণি ও বিশ্বম্ভরের সহিত বসিয়া সে কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছিল না। অত দূরে কি থাকা যায়!

তালুকদারের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া লছমনিয়া মুচকি হাসিয়া কাদম্বিনীর কানে কানে কি যেন বলিল।

কাদম্বিনী ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল, বউ ম'রে গিয়ে অবধি হ্যাংলা হয়ে উঠেছে মুখপোড়া।

কালীর মা একবার লছমনিয়া এবং একবার তালুকদারের মুখের পানে চাহিল। তাহার মনে কোন ঈর্ষা ঘনাইয়া উঠিল কি না, বোঝা শক্ত। কারণ মনের ভাব মুখে প্রতিফলিত হইবার মত মুখ তাহার নয়। তবু অকারণে সে তাহার থান-কাপড়ের ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া গায়ে কাপড়-চোপড় টানিয়া সরিয়া বসিল।

পঞ্চম গাড়ি জিনিসপত্রে বোঝাই।

ষষ্ঠ গাড়িতে ছিল গোটা দুই বিছানার বাণ্ডিল, এবং তাহার উপর বসিয়া ছিল হরু মণ্ডল বর্শা-হস্তে। হরুর মাথায় লাল শালুর প্রকাণ্ড পাগড়ি, দেহ অনাবৃত। তাহার ক্ষীণ কটি, পেশীসমৃদ্ধ উরস্ সত্যই দেখিবার মত বস্তু। পরনের কাপড়খানি পরিষ্কার এবং বেশ আঁটসাঁট করিয়া পরা। দক্ষিণ বাহুতে একটা মোটা রূপার তাগা। পাকা পুষ্ট গোঁফজোড়াতে তা দিতে দিতে হরু মণ্ডল গাড়োয়ান রহমনের সহিত চাষবাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল: আর এক পসলা বৃষ্টি না হ'লে তো সব গেল হে রহমন!

সে কথা আর বলতে!—রহমন গরু দুইটির পেটের তলায় পা চালাইয়া দিয়া হরু মণ্ডলের মুখের পানে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল।

হরু মণ্ডল তাহার সে হাসি দেখিতে পাইল না। সে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। রৌদ্রের প্রখর তাপে মাটি যেন ফাটিয়া যাইতেছে। সহসা একটা ছোট মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চতুর্দিক স্নিগ্ধ ছায়ায় ভরিয়া উঠিল।

সপ্তম গাড়িও জিনিসপত্রে ভর্তি।

অষ্টম গাড়িতে ছিল নীলমণি ও বিশ্বম্ভর।

আপন আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নীলমণি সম্ভবত চুপ করিয়া এক ধারে চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিল। চোখ খুলিয়া থাকিলেই বিশ্বম্ভরটার সহিত

বকর-বকর করিতে হইবে। ঘুমের ভান করাই ভাল। তাহা ছাড়া এক চটকা যদি ঘুমাইয়া লইতে পারা যায়, লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। কলমিপুরের মাঠে বড়বাবু সারারাত যে কি কাণ্ড করিবেন, তাহা অনিশ্চিত। হয়তো সারারাত ঘুমানোই যাইবে না।

বিশ্বম্ভর গাড়োয়ানটার সহিত বচসা বাধাইবার চেষ্টায় ছিল।—তখুনি বললাম তোমাকে, এগিয়ে নাও গাড়িখানা। ধুলো খেতে খেতে চলতে হবে এখন সারা পথটা! যেমন গরু, তেমনই গাড়োয়ান! গরুগুলোকে খেতে-টেতে দাও কিছু, না, খাটিয়েই চলেছ কেবল দিন-রাত?

দীমু গাড়োয়ান খুব ঠাণ্ডা-প্রকৃতির লোক। অতিশয় নরম কণ্ঠেই জবাব দিল, খেতে দিই বইকি।

বিশ্বম্ভর উষ্ণতর কণ্ঠে বলিল, খেতে দাও! মিছে কথা বলবার আর জায়গা পাও নি তুমি? খেতে দিলে গরুর অমন পাঁজরা বেরোয়?

দীমু কোন জবাব দিল না। কারণ বিশ্বম্ভরকে সে চিনিত। এবং নীলমণি দীমুকে চিনিত বলিয়া বিশ্বম্ভরকে লইয়া দীমুর গাড়িটাতেই চড়িয়াছে। নীলমণি এক ধারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া সব শুনিতেছিল।

শেষ গাড়ি দুইখানা অধিকার করিয়াছিল কুঞ্জলালের দল।

বীরেন নানা অসুবিধার মধ্যেও আগের দিনের খবরের কাগজখানা পড়িতেছিল। খবরের কাগজ না পড়িলে তাহার চলে না। গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে সে চেকোস্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল।

কুঞ্জ বাজাইতেছিল বাঁশী।

সূর্য মেঘাচ্ছন্ন, চতুর্দিক ছায়াময়। পথে একটা বুড়ী গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারের একটা গাছ হইতে হলুদ রঙের সুন্দর একটা পাখি উড়িয়া গিয়া মাঠের ঘনপত্রাচ্ছাদিত একটা গাছের ভিতর আত্মগোপন করিল।

হাবুল বলিল, কি সুন্দর একটা হলদে পাখি উড়ে গেল, দেখলি?

কি পাখি বল্ তো ওটা?

বীরেন পাখিটা দেখে নাই; তবু বলিল, দোয়েল।

পাঁচু বলিল, কই, আমি দেখতে পেলাম না তো!

হাবুল হাসিয়া জবাব দিল, তুই বন্ধুর পানে চেয়েই তন্ময় হয়ে আছিস, অন্য কিছু দেখবার আর কি অবসর আছে তোর?

পাঁচু বঙ্কুর দিকে চাহিয়া বলিল, মাইরি বঙ্কু, তোকে দেখে পদ্য লিখতে ইচ্ছে করছে—

বঙ্কুবিহারী চলিয়াছে চাপিয়া গরুর গাড়ি,
ফুরফুরে হাওয়াতে উড়িতেছে ছাগল-দাড়ি।

কুঞ্জ বাঁশী থামাইয়া বলিল, দাড়ি কত রকমের আছে জানিস? হিন্দীতে ভারি চমৎকার একটা শ্লোক আছে দাড়ির।

কুঞ্জর মামা মজঃফরপুরে চাকরি করেন। কুঞ্জ সেখানে কিছুদিন ছিলও। সুতরাং তাহার কথার মুল্য আছে।

হাবুল বলিল, কি শ্লোক, শুনি না!

কুঞ্জ বলিল, এক দাড়ি চুটুক পুটুক, এক দাড়ি তক্কো,
এক দাড়ি মন্‌মহেশ, এক দাড়ি বভ্‌তো।

এর মানে?

মানে তো সোজা। চুটুক পুটুক মানে ছিটেফোঁটা, এখানে একগাছা ওখানে একগাছা। তক্কো মানে ছোট্ট ছাগল দাড়ি, যেমন আমাদের বঙ্কুর। মন্‌মহেশ হচ্ছে—বেশ গাল-ভরা ঘন দাড়ি, কিন্তু বে-এক্তার নয়। আর বভ্‌তো হচ্ছে একেবারে—

কুঞ্জ ঠিক উপযুক্ত কথাটা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বীরেন খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বলিল, এপিক ব্যাপার, অর্থাৎ আ-নাভি।

ঠিক বলেছিস। গোঁফেরও একটা শ্লোক আছে—

দই চপচপ কেলা মোচা
ভঁইসা শিঙ্গা উপর খোঁচা
মধ্যে শূন্য নেয়াপাতি
পাঁচটি প্রকার গোঁফের জাতি।

কুঞ্জ এই শ্লোকটিরও হয়তো বিশদ ব্যাখ্যা করিত, কিন্তু পাঁচুর জ্বালায় হইল না।

সে বলিয়া বসিল, আমার আবার একটা মিল মনে এসেছে।—

হে বঙ্কু চক্কো, দাড়ি তব তক্কো।

বঙ্কু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে, কিছুতে চটিবে না। তবু তাহার উপরের অসম্পূর্ণ ঠোঁটটা একটু কুঞ্চিত হইল এবং তাহা দেখিয়া হাবুল

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেন খবরের কাগজের একখানা পাতা উল্টাইয়া বলিল, ওহে, আবার একটা মেয়ে লেকে ডুবেছে।

হাবুল বলিল, এবার কলকাতায় গেলে লেকের জল খানিকটা নিয়ে আসব মাইরি বোতলে পুরে। আমাদের পাড়ার মন্টিটার মাঝে মাঝে ফিট হয়, লেকের জল মাথায় ছিটোলে হয়তো সেরে যেতে পারে।

বীরেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, জলে অ্যামোনিয়ার যতটা কন্সেনট্রেশন হ'লে ফিট ছাড়ে, লেকের জলে ততটা এখনও হয় নি বোধ হয়। মড়া পচবার তো আর অবসর দিচ্ছে না, তুলে ফেলছে কিংবা ভেসে উঠছে।

হাবুল কৌতুকটার রাসায়নিক অংশটা ঠিক ধরিতে পারিল না। তবু বলিল, যতটা হয়েছে তাই যথেষ্ট।

কুঞ্জ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

উর্দি-টুর্দি পরিয়া জগদেও পাঁড়ে ও কিশোর সিং সকলের পিছনে লাঠি কাঁধে করিয়া আসিতেছিল। উভয়ে নিম্নস্বরে কি কথাবার্তা বলিতেছিল, ঠিক শোনা যাইতেছিল না। কিন্তু তরুণ যুবক কিশোর সিংয়ের সমস্ত মুখে একটা সশ্রদ্ধ অবহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যেন কোন তরুণ ছাত্র প্রবীণ অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছে।

সহসা পিছনের গাড়ির গাড়োয়ানটাকে লক্ষ্য করিয়া জগদেও পাঁড়ে আদেশ করিল, গাড়ি বাঁয়ে করো। যানে দো ই লোককো।

কতকগুলি সাঁওতাল ও সাঁওতাল-রমণী যাইতেছিল। একজন সাঁওতালের কাঁধে একটা বাঁক। বাঁকের এক ধারে একটা চুপড়িতে জিনিসপত্র এবং অন্য ধারে একটি ছোট ছেলে। ছেলেটি বেশ নির্ভয়ে বাঁকে দুলিতে দুলিতে চলিয়াছে।

হাবুল কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। দুইটা সাঁওতাল-মেয়ে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আগাইয়া গেল।

বীরেনের হঠাৎ মনে পড়িল, বাদল ডাক্তারকে তো দেখা যাইতেছে না! সে কি তাহা হইলে—

বীরেন কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া পাঁড়েজিকে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার-বাবু কি হাতীতে গেছেন?

জগদেও প্রথমে হিন্দীতেই বলিল, ডাকৃটরবাবু ফটফটিয়ামে সওয়ার হো কর বাতাসপুর গয়ে হেঁ রোগী দেখেনকে লিয়ে। তাহার পর কি মনে করিয়া

বাংলাতে বক্তব্যটা শেষ করিল, সেইখানসে হামাদের সং লিবেন।

বীরেন এই বার্তায় খুশী হইল। সে গরুর গাড়িতে যাইতেছে, অথচ ডাক্তার-বাবু হাতীতে গিয়াছেন—এ বার্তা বীরেনের পক্ষে কষ্টকর হইত। তাহার অপেক্ষা অনেক ছোট এক মাসতুতো ভাইয়ের সহপাঠী এই ডাক্তারটি। ডাক্তার বলিয়াই এত প্রতিপত্তি, তাহা না হইলে—

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে বীরেন পুনরায় কাগজে মন দিল।

আকাশে যে মেঘখানা সূর্যকে আবৃত করিয়া ছিল, সেটা সরিয়া গেল, চতুর্দিক আবার রৌদ্রালোকিত হইয়া উঠিল।

২

রতনদীঘির পাড়ে মেজ মায়ের পালকি নামানো হইয়াছে। গিন্নীমা এবং বড় বউ পালকি থামান নাই, সোজা চলিয়া গিয়াছেন। গিন্নীমার সহিত জিতুর মার পালকিটাও গিয়াছে। মেজ মা কিন্তু পারিলেন না। বেয়ারাগুলির ঘর্মাক্ত কলেবর এবং নিদারুণ রৌদ্র দেখিয়া রনতদীঘির পাড়ে বটগাছটার তলায় পালকিটা নামাইতে বলিলেন। বেচারীরা ঠাণ্ডায় একটু বিশ্রাম করিয়া লউক, এই কাট-ফাটা রোদে তাতিয়া পুড়িয়া একেবারে ঝলসাইয়া গিয়াছে যেন সকলে।

রতনদীঘির পানে চাহিয়া মেজ মা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রকাণ্ড দীঘি। কাকচক্ষু স্বচ্ছ কালো জল টলমল করিতেছে, চাহিয়া থাকিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ও-পারের ঘাটটায় একজন বধূ স্নান করিতেছে, ঘাটের উপর চকচকে পিতলের কলসীটি বসানো রহিয়াছে। ও-পারের ঢালু সবুজ পাড়টায় একদল ছাতারে পাখি কলরব করিতে করিতে লাফাইয়া লাফাইয়া আহার সংগ্রহ করিতেছে। আরও ওদিকে ফাঁকা মাঠে রৌদ্রতপ্ত শূন্যটা যেন কাঁপিতেছে, সেতারের তারে জোরে ঝঙ্কার দিলে তারগুলো যেমন কাঁপিতে থাকে, অনেকটা তেমনই।

সহসা মেজ মার হুঁশ হইল, টোকনটা কোথায় গেল? গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ওই যে, ছেলে শিকার করিতেছে। ফড়িং শিকার হইতেছে।

বটগাছটার ওধারে ছোট একটু মাঠের মত, সেখানে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ নানা বিচিত্র রঙের ফড়িং ঠিক ছোট ছোট এরোপ্লেনের মত উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাঠটা চোরকাঁটায় ভর্তি; শুকনো শুকনো মরা মরা আরও কি যেন অসংখ্য গাছ রহিয়াছে। ফড়িংগুলা তাহাদের ডালে বসিতেছে, আবার উড়িয়া যাইতেছে।

এক-একটা আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়াও থাকিতেছে। কিন্তু কেহই টোকনের নাগালের মধ্যে আসিতেছে না, বন্দুকের লক্ষ্য ঠিক হইতে না হইতেই উড়িয়া যাইতেছে। টোকন পা টিপিয়া আগাইয়া গিয়া উপবিষ্ট একটা ফড়িংকে টিপ করিতেছিল, এমন সময় মেজ মা ডাকিলেন, ওরে, যেখানে সেখানে কাঁটাবনে যাস নি তুই, এদিকে আয়।

টোকনের হাত কাঁপিয়া গেল, ফড়িং উড়িয়া গেল। টোকন বন্দুকসুদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া মেজ মার গলা জড়াইয়া মাটিতে পা ঠুকিতে লাগিল : কেন তুমি ডাকলে, উড়ে গেল ফড়িংটা !

আর রোদে রোদে ঘুরতে হবে না, পালকির ভেতর ব'স্ এসে। মেজ মা একরূপ জোর করিয়াই টোকনকে টানিয়া ভিতরে বসাইলেন। কি ভীষণ রোদ ! এইটুকুর মধ্যে ছেলের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, টোকনের প্যাণ্ট হইতে চোরকাঁটাগুলা ছাড়াইয়া দিয়া মেজ মা বলিলেন, টোকন, শম্ভু সিংকে জিজ্ঞেস কর্ তো, বাবুদের হাতী কতক্ষণ আগে চ'লে গেছে !

শম্ভু সিং নামক বিরাটকায় সশস্ত্র সিপাহীটি পালকির তত্ত্বাবধায়করূপে অশ্বপৃষ্ঠে সঙ্গে আসিয়াছে। প্রত্যেক পালকির সঙ্গেই একজন করিয়া অশ্বারোহী সশস্ত্র সিপাহী আছে। শম্ভু সিং অদূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জিরাইতেছিল। টোকনের কথা শুনিয়া সে বলিল, এক ঘণ্টা আগে হাতী চলিয়া গিয়াছে। মেজ মা একটু চিন্তিত হইলেন। বদ-মেজাজী নূতন হাতীটার পিঠে মেজবাবু চড়িয়াছেন। তাঁহার সহিত আবার চাঁপাটাও আছে। হাতীটা মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যায়। কি যে হইল, জানিবার জন্য তাঁহার মনটা উসখুস করিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, বেয়ারাগুলাকে ডাকাইয়া পালকি উঠাইতে বলেন ; কিন্তু আবার তখনই মনে হইল, অন্য পালকিগুলি পিছাইয়া রহিয়াছে, তাহাদের ফেলিয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে ! ভগবান তাঁহাকে তো আর বড়দির মত নিশ্চিন্ত মন দেন নাই। উষা, মীনা, তরঙ্গিণী তিনজনই সমান। উহাদের পিছনে ফেলিয়া গিয়া কি মেজ মা কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন ! জামাই এবং হীরেন অবশ্য ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া উহাদের পিছু পিছুই আসিতেছে। কিন্তু উহারাও তো ছেলেমানুষ এবং সব কয়টিই হুজুগে। একটা পালকিতে প্রবীণ ঠাকুরদা এবং ঠানদি আছেন অবশ্য, কিন্তু তাঁহারা কি উহাদের সামলাইতে পারিবেন !

সুতরাং মেজ মা চিন্তিত মুখে অপর পালকিগুলির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন।

টোকন আবার বোধ হয় ফড়িং শিকারের চেষ্টায় বাহির হইয়া গিয়াছিল,

হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দেখ, দেখ মেজ মা, ওটা কি?

মেজ মা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, বেশ বড় একটা বহুরূপী। সমস্ত দেহটা কুচকুচে কালো, কেবল গলার কাছটা টকটকে লাল। একটা ছোট ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সামনের পায়ে ভর দিয়া গলাটা উঁচু করিয়া গম্ভীর-ভাবে ঘাড় নাড়িতেছে।

মেজ মা বলিলেন, ও গিরগিটি।

টোকন সভয়বিস্ময়ে মেজ মার কাছে ঘেঁষিয়া জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

কামড়ায়?

না। ফের যাচ্ছিস তুই ওদিকে? না, মারতে হবে না ওকে।—টোকনকে টানিয়া পুনরায় তিনি পালকির ভিতর বসাইলেন ও আঁচল দিয়া মুখটা মুছাইয়া দিলেন।

এমন সময় ঠাকুরদা ও ঠানদির পালকি আসিয়া হাজির হইল। পালকি নামাইতেই ঠানদি বাহির হইয়া মেজ মার পালকির নিকট আসিয়া বলিলেন, কি ভাই, ব'সে আছ যে?

আপনাদের অপেক্ষায়। ওরা সব কই?

ওরা কি আর আমাদের মত! আমগাছে উঠেছে ওরা।

আমগাছে, বলেন কি? কে কে উঠেছে?

হীরেন আর উষা তো উঠেছে দেখে এলাম, মীনাকে ওঠবার জন্যে সাধাসাধি করছে।

আর তরঙ্গিণী?

সে খিলখিল ক'রে হাসছে আর আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে আছে গাছতলায়।

মেজ মা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, সত্যি, এরা যেন সব কি! একটু যদি হস্‌সি-দিগ্‌ঘি জ্ঞান আছে কারুর বাপু!

ঠানদি বলিলেন, ওরা সব আর-জন্মে বাঁদর ছিল, এ জন্মে ন্যাজটি খসেছে খালি।

আপনি নিয়ে এলেন না কেন ওদের ধ'রে?

আমার কথা শুনলে তো! তা ছাড়া আমি একটু তাড়াতাড়িই চ'লে এলুম রতনদীঘিতে নাইব ব'লে। একটা ডুব দিয়ে না নিলে মাথা ধ'রে যাবে আমার। চিরকাল সকালে নাওয়া অভ্যেস তো। ওগো, আমার পুঁটলিটা

কোথা, দাও তো, নেয়ে নিই।

এই যে।

ত্রস্ত ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি পুঁটলিটা বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরদা সকলের কাছে ঠানদিকে যেরূপ ভয়াবহরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন, ঠানদি মোটেই সেরূপ নহেন। ছোটখাটো মানুষটি, চওড়া চওড়া গড়ন, পাড়ার ফাজিল ছেলেমেয়েরা আড়লে নাম দিয়াছে—গুট্‌কু। ধপধপে ফরসা রঙ, কপালের ঠিক মাঝখানটিতে টিপের আকারে ছোট্ট নীল একটি উলকি। মাথার চুলগুলি যদিও সব পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখে এখনও জরার চিহ্ন নাই। ঠানদি এককালে অপরূপ রূপসী ছিলেন; পাকা আমটির মত এখনও যেন টুকটুক করিতেছেন। অথচ বেশ রাশভারী।

পুঁটলি লইয়া ঠানদি বলিলেন, তেলের শিশিটা দাও।

ঢোক গিলিয়া ঠাকুরদা বলিলেন, তেলের শিশি কি আমাকে দিয়েছিলে?

বাঃ তোমার হাতে দিলুম না! ফেলে এসেছ নাকি?

ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিলে তিনি দ্বিধা হইবেন না। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া ঠাকুরদা পালকির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন! বাহিরের বারান্দার তাকটার উপরই যে তেলের শিশিটা রহিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি ছাড়া আর কে বেশী জানে! তথাপি পালকির ভিতরে পিছন ফিরিয়া বসিয়া খুঁজিবার ভান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তো একটা করিতে হইবে। দৃষ্টিটা তো এড়ানো যাক আপাতত।

পালকির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ঠানদি বলিলেন, তোমার হাতে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। এতকাল ধ'রে দেখছি তোমায়, তবু আমার জ্ঞান হ'ল না!

ঠাকুরদা পালকির ভিতর বসিয়া, ব্যাকুলভাবে এদিকে ওদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

রুখু নাইলে তো এখুনি মাথা ধ'রে যাবে আমার।

মেজ মা টোকনকে বলিলেন, শম্ভু সিংকে বল্‌ তো, ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে চাটুজ্জেদের হাট থেকে নারকোল-তেল নিয়ে আসুক খানিকটা। এই টাকাটা ভাঙিয়ে দাম দিয়ে দিতে বলিস, কেড়ে-কুড়ে না আনে যেন।

ঘোড়া ছুটাইয়া শম্ভু সিং রওনা হইয়া গেল।

ঠানদি মেজ মার পালকির নিকট বসিয়া আজ পর্যন্ত ঠাকুরদা কত জিনিস

হারাইয়াছেন এবং নষ্ট করিয়াছেন, তাহারই একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদা পালকির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজের সম্বন্ধে নানারূপ অত্যুক্তি স্বকর্ণে শুনিয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। বরং এমন একটা ভাব ধারণ করিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, যেন তিনি বধির, কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না।

অল্প সময়ের মধ্যেই শম্ভু সিং তেল আনিয়া হাজির করিল। মাথায় তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ঠানদি পালকিটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমিও তেল মেখে চান ক'রে নাও না।

গলাটা বাড়াইয়া ভালমানুষটির মত ঠাকুরদা বলিলেন, আমাকে বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে নয় তো আর কাকে বলব? আমসির মত শুকিয়ে থাকতে ভালও তো লাগে! চান ক'রে নাও।

এই যে নিই।

ঠাকুরদা বাহির হইয়া আসিলেন।

ঠানদি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, খুঁড়িয়ে হাঁটছ যে?

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের গাঁটটায় একটু ব্যথা হয়েছে।—অত্যন্ত সকরুণ দৃষ্টিতে ঠাকুরদা ঠানদির মুখের পানে চাহিলেন। ভাবটা যেন, দোহাই তোমার আর কিছু বলিও না।

ঠানদি ক্ষণকাল ঠাকুরদার কুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, হবে না! কাল রাত্তিরে পই পই ক'রে মানা করলাম, পূব দিকের জানলাটা খুলে শুয়ো না। বেতো শরীরে কি ওসব সয়? দরকার নেই চান ক'রে।

ঠাকুরদা সুট করিয়া পালকির মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন।

ঠানদি স্নান সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় হৈ-হৈ করিয়া উষা-মীনা-তরঙ্গিণীর পালকি এবং তাহাদের পিছনে পিছনে অশ্বপৃষ্ঠে সুরেন হীরেন আসিয়া পড়িল। দুইজনেরই পিঠে বন্দুক বাঁধা এবং পরনে ব্রিচেস প্রভৃতি সাহেবী পরিচ্ছদ।

সুরেন ছেলেটি প্রিয়দর্শন, কিন্তু কালো। মুখখানি কচি-কচি। গোঁফদাড়ি

পরিষ্কার কামানো থাকাতে আরও রুচি দেখায়। তাহার চালচলন কথাবার্তায় সহসা বুঝিবার উপায় নাই যে, সে বিলাত-ফেরত এবং ব্যারিস্টার। অর্থাৎ সুরেন সেই শ্রেণীর চতুর বিলাত-ফেরত, যাহারা কথায় কথায় নাসাকে কুঞ্চিত হইতে দেয় না। নাকের উপর রীতিমত 'কন্‌ট্রোল' আছে। তাহার যে কোন চাল নাই, এই প্রশংসনীয় ধারণাটা মনে জাগরূক রাখিবার জন্য সে অহরহ সচেষ্ট। তাহার অতিশয় সাদাসিধা দেশী ব্যবহারটা যে স্বাভাবিক নয়, তাহা একটু নজর করিলেই ধরা পড়ে।

যখন-তখন যাহার-তাহার বাড়িতে গিয়া আড্ডা দেওয়া, মুড়ি-মুড়কি-গুড়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, টোকনের সহিত কারণে অকারণে খুনসুড়ি করা, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, যেখানে সেখানে ধপ করিয়া বসিয়া পড়া, শাশুড়ীদের কাছে ছেলের মত আবদার করা, শ্বশুরদের সম্মুখে সিগারেট না খাওয়া, ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করা এবং ঠাকুরমার দেওয়া ষষ্ঠীপূজার টিপটা কপালে ধারণ করিয়া সকলের সম্মুখে উন্নত মস্তকে ঘুরিয়া বেড়ানো প্রভৃতি অনাধুনিক অ-ব্যারিস্টারসুলভ আচরণ সুরেন সেইরূপ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করে এবং সেইরূপ নিখুঁতভাবে করিতে চেষ্টা করে, যেরূপ নিষ্ঠার সহিত ও নিখুঁতভাবে সে একদা সাহেবিয়ানা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহার এই চালহীনতাটাও একটা চাল। ব্যারিস্টার-সমাজের ডিনার পার্টিতে যে এই ব্যক্তিই নিখুঁতভাবে কাঁটা-চামচ ধরিয়া নিখুঁত পদ্ধতিতে আহার সমাধা করিতে পারে, অতিশয় ঔদাসীন্যভরে অতিশয় দামী মদ অতিশয় মুখরোচক বুকনি সহযোগে পার করিতে পারে, টাই কলার শার্ট হ্যাট মোজা জুতার অতি-আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে এই ব্যক্তিটিরই নখদর্পণে, অর্থাৎ এই হ্যালাক্ষ্যাপা-গোছের জামাইটিই যে স্ব-সমাজে পুরাদস্তুর সাহেব তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। অন্তরের অন্তস্তলে সে সাহেব, না বাঙালী, তাহা সে নিজেও বোধ হয় ঠিক জানে না। যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও এখনও ঘটে নাই। যখন যেখানে যাহা মানায়, তাহাই ঠিকভাবে করিয়া যাওয়াটাই এখন জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যান', সুরেন তাহাই। সুরবোধ আছে, বেসুরা অথবা বেফাঁস কিছু করিবার ছেলে সে নয়।

হীরেন ছোকরাটি ঠিক ইহার বিপরীত। অনাবৃত চালিয়াৎ। সুরেনের মত অকারণে একটা আবরণের বোঝা বহিতে সে প্রস্তুত নয়। সে যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ., সে যে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সে যে

বড়লোকের ছেলে, সে যে রূপবান, সে যে ভাল খেলোয়াড়—অর্থাৎ গল্পের আদর্শ নায়ক হইবার সমস্ত যোগ্যতাই যে তাহার আছে, তাহা অনর্থক লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে না। হীরেন যে ঘোড়সওয়ার তাহা সকলেই অনেক আগে জানিত, কিন্তু সুরেনও যে ঘোড়ায় চড়িতে পারে এবং হীরেনের অপেক্ষা ভাল করিয়া পারে তাহা জানা গিয়াছে আজ সকালে। সুরেনের হাতীতেই যাইবার কথা ছিল, কিন্তু হীরেন ঘোড়ায় যাইবে শুনিয়া সেও ঘোড়ায় আসিয়াছে। উষার প্রতি হীরেন যে আকৃষ্ট, তাহা লুকানো নাই। কিন্তু উষার প্রতি সুরেনের সত্য মনোভাবটা যে কি, তাহা কেহ ঠিক জানে না—এমন কি উষাও না। যেরূপ সহৃদয় কর্তব্যপরায়ণতার সহিত উষার সর্বপ্রকার শখ ও দাবি সুরেন মিটাইয়া দেয়, তাহাতে অন্য কিছু মনে করা অসম্ভব। তা ছাড়া স্বামীর মনোলোকের নিগূঢ় খবর লইবার মত মননশীলতা উষার এখনও হয় নাই। স্বামীর ঐশ্বর্য ও বাহ্যরূপ লইয়াই উষা মত্ত।

পালকি নামাইতেই উষা, মীনা এবং তরঙ্গিণী আসিয়া মেজ মার পালকি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উষার দামী ঢাকাইখানা খোঁচ লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণীর কোঁচড়ে এক কোঁচড় আম। মীনার চোখ-মুখ হাস্যপ্রদীপ্ত, কিন্তু তাহার বেশবাস বিস্রস্ত হয় নাই ; সুরেনের উৎসাহ সত্ত্বেও সে গাছে চড়ে নাই।

দামী কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়া উষা খুব যে দুঃখিত, তাহা মনে হইতেছে না। বরং খুশিতে তাহার চোখ-মুখ ঝলমল করিতেছে। আসিয়াই হাত-মুখ নাড়িয়া মেজ মাকে বলিতে শুরু করিয়া দিল, উঃ মেজ মা, তুমি যদি দেখতে, রাস্তার ধারে একটা গাছে সে কি আম! গাছ যেন একেবারে ভেঙে পড়ছে! পাতা দেখা যায় না এত আম! পেড়ে এনেছি আমরা।

মেজ মা চটিয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তাহা ছাড়া সুরেন কাছেই ঘোড়ার উপর রহিয়াছে, হয়তো কি মনে করিবে! তাই তিনি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া বলিলেন, বেশ করেছ। এইবার চল সব, এখনও ঢের দূরে যেতে হবে।

তরঙ্গিণী কোঁচড় হইতে আম বাহির করিলেন। মেজ মাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দেখাইয়া বলিলেন, কেমন চমৎকার দেখতে দেখ মেজদি, যেন টুকটুক করছে!

মেজ মা প্রলুব্ধ হইলেন না, প্রলুব্ধ হইল টোকন। সে দুই হাতে দুইটা

আম লইয়া পালকির ওপাশে চলিয়া গেল। সুরেন ঘোড়াটা একটু আগাইয়া লইয়া গিয়া ঠানদির সহিত আলাপ শুরু করিয়া দিল।

ঠানদি, আপনি চ'লে এলেন, তা না হ'লে আরও আম আনতে পারতুম আমরা। বললাম, চড়ুন আপনি গাছে। এ সব কি এদের কর্ম, পিঁপড়ের ভয়ে পালিয়ে এল সব।

নিজের দল ভারী হওয়াতে ঠাকুরদা সম্ভবত কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, আমি এর প্রতিবাদ করছি। পিঁপড়েরা পর্যন্ত উপেক্ষা করবে, এতটা নীরস এখনও হন নি তোমাদের ঠানদি।

ঠানদি পুঁটলি হইতে ছোট কাঠের আয়নাটি ও সিঁদুরের কৌটা বাহির করিয়া পাকা চুলে সিঁদুর পরিতেছিলেন। সিঁদুরটি পরিপাটীরূপে পরিয়া সুরেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখন আমার সময় গেছে ভাই, যা খুশি বলে যাও, হাতী দঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মেরে যায়। চল্লিশ বছর আগে যদি আসতে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতুম। এখনও তার সাক্ষী আছে একজন, জিজ্ঞেস কর।

যে ব্যক্তি গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখিয়াছে, গিরিশ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তাহার যেমন মুখভাব হয়, ঠানদির যৌবন-প্রসঙ্গে ঠাকুরদাও তেমনই একটা গদগদ মুখভাব করিয়া স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

উষা আসিয়া বলিল, ঠাকুরদা, আম খাবেন?

উল্লসিত ঠাকুরদা বলিলেন, নিশ্চয়, সেই আশাতেই তো ব'সে আছি ভাই।

ঠানদি বক্র কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন, এখন আবার অসময়ে আম খাওয়া কেন? অত্যেচার কর ব'লেই তো—

ঠাকুরদা যেন নিবিয়া গেলেন।

আচ্ছা, তবে থাক্‌।

উষা আর মীনায় চোখে চোখে কি একটা কথা হইয়া গেল। উষা সরিয়া পড়িল। সকলেই ইহা জানিয়া ফেলিয়াছে, কোন যুবতী মেয়ের কাছে ঠানদি সহজে ঠাকুরদাকে ঘেঁষিতে দেন না। সম্পর্ক এবং অজুহাত যাহাই হোক, কম-বয়সী মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখিলেই ঠানদির মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

হীরেন ঘোড়া হইতে নামিয়া একটু দূরে ঘোড়ার পিঠের উপর ডান হাতটা রাখিয়া আপন মনে শিস দিতেছিল এবং উষার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

সুরেন একটু সরিয়া যাওয়াতে মেজ মা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরা কি বল্ দিকি! গাছে চড়েছিলি সব! তোর বয়েস দিন দিন কমছে, না, বাড়ছে? তুই সম্পর্কে শাশুড়ী না?

তরঙ্গিণী এমন একটা মুখভাব করিলেন, যেন তিনি নিরীহতার প্রতিমূর্তি।

আমি তো চড়ি নি, আমি তো বরং মানা করলুম ওদের। উষাকে তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে এমন মাথায় চড়িয়েছ যে, এখন শোনে নাকি কারও কথা? তা ছাড়া সুরেনই তো তুললে হুজুকটি; আমি কি করব?

তোমাকে যেন চিনি না আমি। ছোটবাবুকে ব'লে দিচ্ছি দাঁড়াও গিয়ে—

বাঃ রে, ওরা চড়ল গাছে, আর দোষ হ'ল আমার?

মেজ মা পালকির ভিতর ঢুকিয়া পালকির ওধারে আম্র-ভক্ষণ-নিরত টোকনকে ধমক দিলেন, আমের রসে জামা-টামা সব এক করলে তো!

তরঙ্গিণী পাতলা ঠোঁট দুইটি কুঞ্চিত করিয়া অন্তরালবর্তিনী মেজ জাকে একটু ভেঙাইলেন। তাহার পর কোঁচড় হইতে মনোমত একটি আম বাছিয়া বাহির করিলেন এবং বোঁটার উলটা দিকে দাঁত দিয়া ছোট একটি ছিদ্র করিয়া চুষিতে লাগিলেন।

মীনা মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া এক ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কেমন যেন একটা ভাষাহীন অস্বস্তি। তাহার অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল, যখন সুরেন তাহার কাছে আসিয়া বলিল, চল তো, আমরা দুজনে চুপি চুপি দীঘির ও-ধারটায় গিয়ে দেখে আসি, টুপটুপ ক'রে ডুব দিচ্ছে ওগুলো পানকৌড়ি, না, পাতিহাঁস!

মীনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্য করিল এবং বলিল, যাবার দরকার নেই, ওগুলো পানকৌড়িই।

হাঁস হতে বাধা কি?

মীনা উত্তর দিল না, শুধু একটু মুচকি হাসিল।

মেজ মা মেজবাবুর জন্য মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পালকি উঠাইতে আদেশ করিলেন।

পানকৌড়ি-হাঁস সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গেল।

সকলে আবার যাত্রা শুরু করিলেন।

৩

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

দীর্ঘ পথ বিসর্পিত রেখায় দিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত প্রকৃতি আচ্ছন্ন। বড় বউ পালকির মধ্যে একা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পালকি-বাহকেরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে। গিন্নীমা ও জিতুর মা আগাইয়া গিয়াছেন। বড় বউ একা চলিয়াছেন—একেবারে একা। চারিদিকে কোথাও কেহ নাই। মাঠও জনশূন্য।

বড় বউ জীবনে এতক্ষণ ধরিয়া এমন একা আর কখনও থাকেন নাই। সারা জীবন ভিড়ের মধ্যে কাটিয়াছে, এমন নির্জন অবসর জীবনে আর কখনও আসে নাই। নিজের একক সত্তার নিঃসঙ্গ দৈন্যের পানে চাহিয়া বড় বউ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, কোথায় যাইতেছি আমি, কি করিতে যাইতেছি? অভিনয় করিতে? কাহার সম্মুখে? তাক লাগাইয়া দিব? কাহাকে? কেন? কি লাভ হইবে? অভিনয়-নৈপুণ্যে তাক লাগাইয়া দেওয়াটাই কি জীবনের পরমার্থ? সমস্ত জীবনটাই তো রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে কাটিয়াছে। নিত্যনূতন পাদ-প্রদীপ, নিত্যনূতন দর্শক, নিত্যনূতন প্রসাধন, নিত্যনূতন ঐকতান, নিত্যনূতন ভূমিকা। কি লাভ হইয়াছে? অভিনয় হয়তো সফল হইয়াছে, দর্শকেরা হয়তো বিস্ময় মানিয়াছে; কিন্তু অন্তরবাসিনী ভিখারিণীর শূন্য ভিক্ষাপাত্র আজও তো শূন্য। কবে তাহা পূর্ণ হইবে? কে তাহা পূর্ণ করিবে? এই শূন্যতা আর কতকাল বহন করিতে হইবে?

পালকি-বাহকেরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বড় বউ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অন্তরের অন্তরস্থল হইতে কে যেন বলিতেছে, ভিখারিণীর মত যদি ভিক্ষা করিতে পারিতে, হয়তো তোমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া উঠিত। আত্মসম্মানের ঝুটা অলঙ্কারে সারা জীবন নিজেকে রাজেন্দ্রাণী সাজাইয়া রাখিয়াছ। সকলে বাহবা দিয়াছে, ঈর্ষা করিয়াছে। কেহ ভালবাসে নাই, কেহ করুণা করে নাই। করিবে কি করিয়া? রাজেন্দ্রাণীকে কেহ কখনও করুণা করিবার সাহস করে? ভিখারিণী তো কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই! ভিখারিণীর স্বরূপটা অবলুপ্ত করাই যে জীবনের সাধনা ছিল। আবার অভিনয়? আবার তাক লাগাইয়া দিবার চেষ্টা?

সহসা তাঁহার মনে হইল, তিনি আজীবন উপবাস করিয়া আছেন, তৃষ্ণায়

ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কেন? কিসের অভাব তাঁহার? হাত বাড়াইয়া লইলেই তো হয়। লজ্জা করে? অনাহারে পিপাসায় সমস্ত অন্তর ছারখার হইয়া গেল, তবু লজ্জা? তবু অভিনয়? জীবনের কত পরম লগ্ন আসিল ও চলিয়া গেল, আর কয়টাই বা আসিবে? এখনও অভিনয়?

আবার হঠাৎ কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। না, পারিব না। উঁচু মাথাটা ধুলায় লুটাইয়া দিতে কিছুতেই পারিব না। অভিনয় করিতে হইবে।

অন্তরদ্বার খুলিয়া দিলেই কি সে সেখানে প্রবেশ করিবে? নিশ্চয়তা কি? দ্বার খুলিয়া বসিয়া বসিয়া যদি রাত পোহাইয়া যায়? সে অপমান, সে লজ্জার অপেক্ষা দ্বার বন্ধ রাখাই ভাল। সত্যই যদি আসে, দ্বারে করাঘাত করুক।

বড় বউ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। চতুর্দিকে রিক্তশস্য শূন্য মাঠ ধু-ধু করিতেছে। প্রখর রৌদ্র নির্মম হইয়া উঠিয়াছে। দূরে, অতি দূরে কোথায় যেন একটা ঘুঘু ডাকিতেছে।

অতি সকরুণ মিনতি।

কাহাকে মিনতি করিতেছে?

বড় বউ উৎকীর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

৪

গরুর গাড়ির সারি চলিয়াছে।

প্রথমেই গোহম্‌নিকে লইয়া বিরিঞ্চির গাড়িখানা আসিতেছিল। কিন্তু এখন প্রথমে যে গাড়িখানা আছে, তাহা বিরিঞ্চির নয়। দ্বিতীয় গাড়িখানিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কড়া রোদ উঠাতে স্থূলকায় তিনুর কষ্ট হইতেছে। তিনি ছাতা খুলিয়াছেন, একটি ভিজানো লাল গামছা টাকের উপর রাখিয়াছেন এবং এতৎসত্ত্বেও নিদারুণ রকম ঘামিতেছেন। মাথা হইতে গামছা নামাইয়া বারংবার মুখ মুছিতে হইতেছে, কিন্তু মোছার সঙ্গে সঙ্গেই কপালে নাকে চিবুকে পুনরায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিতেছে। রোগা নিতাই ঘাড়টাকে একটু বাঁকাইয়া তিনুর ছাতার তলায় আশ্রয় লইয়াছে।

মুখটা গামছা দিয়া আর একবার মুছিয়া লইয়া স্থূলকায় তিনু বলিলেন, গাড়িতে চড়াই আমাদের দুর্বুদ্ধি হয়েছে। হেঁটে গেলেই হ'ত। এ দশ ক্রোশ ইচ্ছে করলে ঘণ্টা চারেকে কাবার ক'রে দেওয়া যায়। টিকিস টিকিস ক'রে

কতক্ষণে যে পৌঁছব!

নিতাই বলিল, তোমার বোধ হয় চার ঘণ্টাও লাগে না।

তিনু মনে মনে হৃষ্ট হইলেন। বলিলেন, আজকাল আর অতটা স্পীড নেই ভায়া। বয়েস তো হচ্ছে।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, নিতাই ইহার প্রতিবাদ করিবে। কিন্তু নিতাই একেবারে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

শিকার-টিকারের ব্যবস্থাটা কি রকম হয়েছে, শুনেছ? নীলু দত্ত তো আমাদের কিছু করতে দেবে না, নিজেই হামরাই হয়েই সব করছে।

তিনু মুখ মুছিয়া বলিলেন, মরুকগে।

আমার ইচ্ছে ছিল, মাচা-টাচাগুলো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব করাব। মাচা মজবুত না হ'লে মহা বিপদে পড়তে হয় মাঝে মাঝে। বাঘ নিয়ে কারবার, বুঝছ না?

তিনু হয়তো বুঝিলেন, কিন্তু উদ্বিগ্ন হইলেন না। বলিলেন, তামাক সাজ আর এক ছিলিম।

কলিকায় তামাক ভরিতে ভরিতে নিতাই আবার বলিল, সেবারে সিঙ্গি-বাবুদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। মধ্যম বাবু আর আমি ছিলাম একটি মাচাতে! সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। মধ্যমবাবু কি রকম ভারী ওজনের লোক জান তো? মাচাই গেল ভেঙে। দুজনায় ঠিক পড়লাম একেবারে বাঘের মুখটিতে। মধ্যম বাবুর তো একেবারে ফিট। ভাগ্যে আমি ছিলাম, টক ক'রে উঠে মাটিতে দাঁড়িয়েই দিলাম দেগে এক গুলি বাছাধনের বুকে। বিকট গর্জন ক'রে পড়লেন নালাটার ওপর উলটে।

নিতাইয়ের এসব কথা তিনু চাটুজ্জে কখনও বিশ্বাস করেন না, এখনও করিলেন না। মধ্যম বাবুর স্থূলতার উল্লেখে মনে মনে একটু চটিলেনও। নিজে কাঠির মত রোগা কিনা, তাই স্বাস্থ্যবান লোক দেখিলে মোটা বলিয়া ঠাট্টা করা হয়! বাঘের মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন অথচ বাঘ উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে! দিতেও পারে, খাইবার মত উহার শরীরে কিই বা আছে! বড় জোর খড়কে হইতে পারে।

কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কিছু বলিলেন না, আর একবার মুখ মুছিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

নিতাই টিকা ধরাইতে ধরাইতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, নীলু দত্ত কি রকম

ব্যবস্থা করেছে শুনেছ কিছু?

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনু অবশেষে বলিলেন, গোটা তিনেক মাচা তৈরি করবে আর একটা মোষের বাচ্চাও নাকি বেঁধে রাখবে, এই তো বলেছিল আমাকে।

নাও, ধরাও।

তিনুর হাতে হুঁকাটা দিয়া চিন্তিত মুখে নিতাই বলিল, গেলেই হ'ত নীলুর সঙ্গে। আনাড়ী লোক তো, কি করতে কি ক'রে ব'সে আছে হয়তো!

সম্মুখের মাঠটার উপর এক ঝাঁক টিয়াপাখি চক্রাকারে উড়িয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া তিনু চাটুজ্জে নীরবে তাম্রকূট সেবা করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। তিনি মাচা লইয়া মোটেই মাথা ঘামাইতেছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন বাকি খাজনাটার কথা। এতগুলা টাকা কি ছোটবাবু ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবেন? আগে চৌধুরীটাকে দুই-চারি টাকা দিলেই কাজ হইয়া যাইত। এখন ছোটবাবুর আমলে সেসব হইবার উপায় নাই। ছোটবাবুকে কোন রকমে তোয়াজ করিবার জন্য শিকারে আসা। অকারণে এই ছেলে-ছোকরাদের দলে মিশিয়া হৈ-হৈ করিতে কোনদিনই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষত আজকালকার ছোঁড়াগুলার রকম-সকমই বেয়াড়া-ধরনের। মানীর মান রাখিয়া চলিতে জানে না। হয়তো ফসফস করিয়া নাকের সামনে সিগারেটই টানিয়া দিবে। কিন্তু কাজের নাম বাবাঠাকুর। দু শো বাহান্ন টাকা এগারো আনা—সহজ কথা নয় তো! নীলু দত্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই হুজুকের মুখে ছোটবাবু আইনের কঠিন গ্রন্থি হয়তো একটু শিথিল করিতে পারেন, এবং কলমিপুরের মাঠে তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া ধরিলে হয়তো কাজটা হাসিল হইয়া যাইতে পারে। নীলু দত্তের আর একটা কথা মনে পড়াতে তিনু চাটুজ্জে ঘাড় বাঁকাইয়া তৃতীয় গাড়িটার দিকে একবার নজর করিলেন। হাঁ, ঐ গাড়িতেই তো লছমনিয়া ছুঁড়ীটা রহিয়াছে। নীলু দত্তের কথা সত্য হইলে ওই ছুঁড়ীটাকে হাত করিতে পারিলেও কার্যোদ্ধার হইতে পারে! নীলুর মতে উহার স্বামী ভিকুকে গভীর উদ্দেশ্য লইয়াই নাকি ছোটবাবু খানসামা-পদে বাহাল করিয়াছেন। টাক হইতে গামছা নামাইয়া চাটুজ্জে মশাই আর একবার মুখ ও বগল মুছিলেন, আর একবার আড়চোখে (হুঁকায় মুখ রাখিয়া) লছ-মনিয়াকে দেখিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, সহজভাবে যদি কার্যোদ্ধার না হয়, শেষটা বাঁকা পথই ধরিতে হইবে। মেয়েটাকে গোটা দশেক টাকা

খাওয়াইলেই চলিবে বোধ হয়।

দশটা টাকা কিছু নয়, কিন্তু ওসব নোংরামির মধ্যে যাইতেই কেমন গা-ঘিন-ঘিন করে চাটুজ্জে মশাইয়ের। কিন্তু কাজের নাম বাবাঠাকুর।

নিতাই ভাবিতেছিল, মাচা তিনটায় কে কে বসিবে।

একটাতে জামাই আর একটাতে হীরেন, আর একটাতে? তালুকদারটা তো বন্দুক উঁচাইয়া সঙ্গে আসিয়াছে, ও-ই নিশ্চয় বসিতে চাহিবে। কিন্তু শিকারের কি জানে ও? গাদা বন্দুকটার অহঙ্কারে গেল লোকটা। হয়তো উহারই সহিত তৃতীয় মাচাটায় বসিতে হইবে আমাকে। বসিব, কিন্তু অসহ্য।

এখন যে গাড়িটা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে তালুকদার বেশ একটু চিন্তিত হইয়াই বসিয়া ছিলেন। যদিও তিনি তৃতীয় গাড়িতেই বেশী নজর রাখিতেছিলেন এবং লছমনিয়ার হলুদ রঙের শাড়িখানার প্রতি ভাঁজটি প্রায় আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছিলেন, গোহুম্‌নি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। গোহুম্‌নিকে লইয়া বিরিঞ্চিটা মাঠ ভাঙিয়া হঠাৎ কোথায় উধাও হইল? বলিয়া গেল বটে, মাঠটার ওপারেই দৌলতপুরে তাহার বাড়ি এবং সে বাড়ি হইতে নিজের কাপড় গামছা আনিতে যাইতেছে। কিন্তু বিরিঞ্চিকে কে না চেনে! ও ব্যাটার অসাধ্য তো কিছুই নাই। তালুকদার অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পাড়িলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আর একবার লছমনিয়ারই পানে চাহিলেন।

কল্পনাবান হরিশ খুড়োর হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান ছিল না। আবার তিনি বাঘের গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি তালুকদার তাঁহার গল্প শুনিতেছেন কি না, তাহাও আর তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন না। এইবার তিনি নানা রকম অসাধারণ বাঘের প্রসঙ্গ পাড়িয়াছিলেন: বাঘ অনেক সময় আবার সাধক হয়, তা জান তো? মানে—মানুষকে হার মানিয়ে দেয়। একটি বাঘের কথা জানি আমি, কনখল অঞ্চলে আছে সেটি, অদ্ভুত সে বাঘ! বাইরের চেহারাতেই বাঘ, কিন্তু ভেতরে সে পরমহংস। দুটি বেলা গঙ্গায় নেমে আহ্নিক করে, থাবা তুলে জপ করে, মাছ-মাংস খায় না, একেবারে বিশুদ্ধ ফলাহারী। একবার হয়েছে কি, বাঘটা গঙ্গায় নেমে সূর্যের দিকে চেয়ে থাবায় ক'রে জল তুলে তুলে অর্ঘ্য দিচ্ছে, এমন সময় তা পুলিস-সায়েবের নজরে প'ড়ে গেল। আর কথা আছে! বন্দুক তুলেই দিলেন ফায়ার ক'রে। সায়েবের লক্ষ্য অব্যর্থ, গুলিও গিয়ে ঠিক বিঁধল মাথায়, কিন্তু বাঘ পড়ল না। ঠিক সমানে ব'সে ব'সে

অর্ঘ্য দিয়ে যেতে লাগল। সায়েব তো অবাক! বাঘ অর্ঘ্য দেওয়া শেষ ক'রে দুটি থাবা জুড়ে সূর্যপ্রণাম করলে, তার পর সায়েবের দিকে এক নজর চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেল। পাণ্ডা ব্যাটারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, এতক্ষণ কিছু বলে নি। বাঘটা চ'লে গেলে সায়েবকে সব কথা খুলে বললে। সমস্ত কথা শুনে সায়েব হ্যাট তুলে বাঘের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানালেন। আসল সাহেব-বাচ্চা কিনা, গুণের কদর জানে।

খুড়ো চুপ করিলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, কোন শাপভ্রষ্ট যোগী-টোগী সম্ভবত। তালুকদার একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, লছমনিয়াটা তাঁহার দিকে অমন করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল কেন? খুড়ো একটি বিড়ি ধরাইলেন এবং স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বিড়িতে একটা টান দিয়া পুনরায় শুরু করিলেন, আর এক প্রকার বাঘ আছে, বুঝেছ তালুকদার।

হ্যাঁ বল, সব কথা শুনে যাচ্ছি আমি।

আর এক প্রকার বাঘ আছে, যারা বহুরূপী। যখন যা ইচ্ছে রূপ ধারণ করতে পারে! সে বড় সঙিন ব্যাপার, বুঝেছ?

লছমনিয়া আবার হঠাৎ ফিরিয়া বসিল।

তালুকদার নির্নিমেষ হইয়া গেলেন, খুড়োর কথায় সায় পর্যন্ত দিতে পারিলেন না। কিন্তু খুড়োর এখন এমন অবস্থা, কোন কিছুর আর অপেক্ষা রাখেন না তিনি। তিনি বলিয়া চলিলেন, সে বড় সঙিন ব্যাপার হে! মানুষের রূপ ধ'রে দিনের বেলা লোকালয়ে আসে, কিচ্ছু চেনবার জো নেই, একেবারে হুবহু মানুষ। কিন্তু নিষুতি রাত যেই হ'ল, অমনই নিজমূর্তি ধারণ করলেন। সামনে যাকে পেলেন, ক্যাঁক ক'রে ধরলেন, মট ক'রে ঘাড়টি মুচড়ে আহারটি সমাধা করলেন, আবার দিনের বেলায় মানুষের রূপ ধ'রে সাফ বেরিয়ে গেলেন। ধরবার-ছোঁবার জো নেই, বুঝলে?

ব'লে যাও না, সব শুনছি আমি।

মাঝে মাঝে মানুষ ছাগল গরু ভেড়া যে না-পাত্তা হয়ে যায়, আমার মনে হয় এই-ই তার কারণ। অথচ পুলিস এর কিছুই খবর রাখে না, জানেই না।

খুড়ো বিড়িতে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, আর এক রকম বাঘ আছে, যারা কীটের রূপ ধারণ ক'রে বেড়ায়। ইংরিজীতে ছারপোকাকে তো বাঘ বলে জানই, কিন্তু ছারপোকাই শুধু বাঘ তা নয়। মশা, এঁটুলি, উকুন, জোঁক—সব বাঘ। তা ছাড়া আরও কত আছে, বাঘের মহিমার কি শেষ আছে!

খুড়ো বিড়িতে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়া পুনরায় কল্পনায় তা দিতে লাগিলেন।

লছমনিয়া মুশকিলে পড়িয়াছিল। এদিকে ভিকু, ওদিকে তালুকদার। ভিকুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতে লজ্জা করে, তালুকদারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসা তো আরও অসম্ভব। মুখপোড়ার ড্যাবডেবে চোখ দুইটা যেন গিলিতে আসিতেছে!

কাদম্বিনী ঢুলিতেছিল।

কালীর মা আধ-ঘোমটা টানিয়া নির্বিকারভাবে পিছনের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

ইহার পরের গাড়িটা মালপত্রে বোঝাই।

তাহার ছোকরা গাড়োয়ানটা হয়তো লছমনিয়া কর্তৃক অভিভূত হইয়াই অসময়ে গলা ছাড়িয়া একটা হোলির গান ধরিয়াছে। তাহার পরের গাড়ি অর্থাৎ পঞ্চম গাড়িতে হরু মণ্ডল বর্শা-হস্তে উন্নত-মস্তকে সিধা বসিয়া ছিল। মেরুদণ্ড এতটুকু বাঁকিয়া যায় নাই, সুগঠিত দেহটির কোথাও এতটুকু শৈথিল্য নাই। সামান্য লাল শালুর পাগড়িটা রৌদ্রকিরণে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম গাড়িতে নীলমণি একাই শুইয়া ছিল।

দীমু গাড়োয়ানকে কিছুতেই উত্তেজিত করিতে না পারিয়া বিরক্ত বিশ্বম্ভর অবশেষে গাড়ি হইতে নামিয়া গিয়াছে। চুপচাপ নিরুত্তেজিতভাবে মন্থরগতি গরুর গাড়িতে বসিয়া থাকা অপেক্ষা রোদে হাঁটিয়া যাওয়া ঢের ভাল। তবু খানিকটা গরম হওয়া যায়। ওই দীমুটা কি মানুষ! ওটাও গরু।

কুঞ্জলালের দল কিন্তু জমাইতেছিল।

নিদারুণ রৌদ্র সত্ত্বেও কুঞ্জলাল বাজাইতেছিল—মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে। বঙ্কু ছাড়া বাকি সকলেই কোরাসে গান ধরিয়াছিল, এমন কি গম্ভীর প্রকৃতির বীরেন পর্যন্ত। বঙ্কু চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু সুরের মোহিনী-শক্তি আছে, বঙ্কু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হঠাৎ মাথা নাড়িয়া অন্যমনস্কভাবে মুখভঙ্গী করিতে করিতে হাঁটুতে তবলা বাজাইতে শুরু করিয়া দিল। হাবুল আর পাঁচুর চোখে চোখে একটা ইশারা হইয়া গেল, এবং সহসা সকলে এক-যোগে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বঙ্কু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেল।

জগদেও পাঁড়েও গানটা উপভোগ করিতেছিল। হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়াতে সে ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, বোন্ কোরলেন কেন? ফিনসে শুরু করুন।

কুঞ্জ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

হাবুল বলিল, এই বঙ্কা, ফের বাজা।

রাগে বঙ্কুর আপদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে ঠিক করিয়াছে, কিছুতে রাগিবে না। তাই মুখ গোঁজ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ হাবুল বলিল, দেখ্ দেখ্।

সকলে দেখিল, একদল পল্লীবধূ কোমরে কলসী লইয়া দূরের আলপথটা ধরিয়া মাঠের মাঝখানে একটা পুকুরের দিকে চলিয়াছে। তাহাদের পিছন পিছন একদল বাজনদার বাজনা বাজাইয়া যাইতেছে।

পাঁচু বলিল, জল সইতে যাচ্ছে সব, বিয়ে বোধ হয় কারও বাড়িতে।

কুঞ্জলাল বলিল, হ্যাঁ রে বঙ্কা, তোর বিয়েতেও জল সইতে গেছল সব এমনই ক'রে?

বিস্ময়ের সুরে হাবুল প্রশ্ন করিল, এ কথা জিজ্ঞেস করবার মানে? বঙ্কা বিয়ে করছে ব'লে জল সইতে যাবে না কেউ? কি যে বলিস তার ঠিক নেই!

পাঁচু মুখে হাত দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতেছিল।

বঙ্কু চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার চোখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল।

৫

ফাঁকা মাঠ।

বিরিঞ্চির গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে! ভাল তেজী বয়েল ঘোড়ার মতন ছুটিতেছে। গোহম্নি তখনও নির্বিকারভাবে চিনাবাদাম চিবাইতেছিল, একটি কথা বলে নাই। শেষ চিনাবাদামটি পরিপাটীরূপে ছাড়াইয়া এবং সেটি মুখে ফেলিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে গোহম্নি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরিঞ্চির দিকে চাহিল। বিরিঞ্চি দেখিতে পাইল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে গরু দুইটাকে হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

গোহম্নি চিনাবাদামটি সম্পূর্ণরূপে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, এইবার বল্ দেখি, কোথায় চলেছিস তুই? কাপড়-গামছার কথা যে মিছে, তা তে

গোড়াতেই বুঝেছি। গাড়ির ঝুলিতে তোর কাপড় গামছা রয়েছে, তাও দেখতে পাচ্ছি। মতলব কি তোর?

বিরিঞ্চি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া গোহুম্‌নির দিকে চাহিল, কোন উত্তর দিল না। কেবল একটু ঝুঁকিয়া গরু দুইটার শিরদাঁড়ার উপর দুই হাত দিয়া সুড়সুড়ি দিয়া তাহাদের গতিবেগ বাড়াইয়া দিল।

জবাব দিচ্ছিস না যে?

বিরিঞ্চি আর একবার হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, জবাব দিল না।

গোহুম্‌নি তখন একটু আগাইয়া গিয়া বিরিঞ্চির পিছনের দিকের চুল ধরিয়া এক টান দিল।

শিগগির বল্, কোথা নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?

বিরিঞ্চি এবারও কোন জবাব দিল না। কেবল প্রাণপণে বলদ দুইটাকে হাঁকাইতে লাগিল।

রৌদ্রতপ্ত নির্জন মাঠে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে, গোহুম্‌নির নীল শাড়ির আঁচলখানা হাওয়ায় উড়িতেছে, তেজী বলদ দুইটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে, বিরিঞ্চি উন্মাদের মত তাহাদের হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

৬

জলন্ধর বিলের ধার দিয়া যে রাস্তাটা কালভৈরবের মাঠ পার হইয়া নালতে গ্রামে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই রাস্তায় মোটর-বাইক হাঁকাইয়া ফট-ফট-ফট-ফট শব্দ করিতে করিতে প্রচুর ধুলা উড়াইয়া বাদল ডাক্তার চলিয়াছেন। বাতাসপুর হইতে রোগী দেখিয়া তিনি ফিরিতেছেন। সকলের সঙ্গে ভোরবেলা ডাক্তারবাবু বাহির হইতে পারেন নাই। বাতাসপুরের রোগীই অবশ্য তাহার একমাত্র কারণ নহে, আরও একটা নিগূঢ় কারণ ছিল—সকালের ডাকটা। সকালের ডাকটা কিছুদিন হইতে ডাক্তারবাবুর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ডাকটা না দেখিয়া বাহির হইলে কিছুতে স্বস্তি পান না। ডাকটা দেখিয়া কিন্তু তাঁহার অস্বস্তি আজ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। যে চিঠিটা নিশ্চয় আসিবে মনে করিয়াছিলেন, সেইখানাই আসে নাই। আসিয়াছে কতকগুলো বাজে বিজ্ঞাপন আর পিসীমার একখানা চিঠি। মায়ার চিঠি আসে নাই।

মায়া নাম্নী মেয়েটি (এখন অবশ্য মহিলাটি, কারণ তিনি এম. এ. পাস এবং কিছুদিন হইতে একটি স্কুলের প্রধান-শিক্ষয়িত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন)

বাদল ডাক্তারের মামাতো দাদার বড় শালী। দাদার শালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সামাজিক অধিকার সকল ভ্রাতারই আছে এবং সে অধিকারের সুযোগ লইতে বাদল ডাক্তার কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু অধিকারমদে মত্ত হইয়া একটি প্রয়োজনীয় সত্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নিদারুণ বজ্রাঘাতের মত সে সত্যটি সহসা একদিন তাঁহার সচেতন সত্তার নিকট আত্মপ্রকাশ করিল। উভয়েরই গোত্র এক। দুইজনেই মুখোপাধ্যায়-বংশসম্ভূত। পঞ্চবাণের পাঁচটা বাণই ভোঁতা হইয়া গেল।

গোত্র সম্বন্ধে সচেতন হওয়া অবধি মায়ার মনও কেমন যেন গুটাইয়া গিয়াছে। বিপদের সম্ভাবনায় শামুক অথবা কাছিম যেমন মুখ গুটাইয়া লয়, অনেকটা তেমনই। নিকটে থাকিলে সংযত, শোভন এবং অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা মায়া আজকাল আর বলে না। আগেও যে খুব বেশী বলিত, তাহা নয়; তবুও যাহা বলিত, তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি রঙ থাকিত। আজকাল সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ফ্যাকাশে ধরনের হইয়া গিয়াছে। চিঠিপত্র যাহা লেখে, তাহা না লিখিলেও চলিত। অর্থাৎ মায়ার বঁড়শিতে যে মাছটা ধরা পড়িয়াছিল, শাস্ত্রে তাহা খাইতে মানা। সুতরাং বঁড়শিটি খুলিয়া সে মাছটিকে আবার জলে ছাড়িয়া দিয়াছে। মাছ কিন্তু বঁড়শিটাকে ভুলিতে পারিতেছে না। মারাত্মক ক্ষতটা এখনও জ্বালা করিতেছে।

মায়ার অতি সাধারণ আমি-ভাল-আছি-আপনি-কেমন-আছেন-গোছ চিঠির জন্যই বাদল ডাক্তার এখনও সমুৎসুক। বাদল ডাক্তারের চরিত্রে আর একটি মহৎ দোষ আছে। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লেখেন। নিতান্ত মন্দ লেখেন না, অন্তত মায়াকে মুগ্ধ করিয়া দিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট ভাল।

জলন্ধর বিল প্রকাণ্ড বিল। খানিকটা শুকাইয়া এখন ডাঙা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে এটুকুও ডুবিয়া যায়। ডাঙার উপর গরু ভেড়া ছাগল শালিক একসঙ্গে চরিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূরে কয়েকটা হনুমানও একটা গাছে খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত। একটা নিভৃত অংশে কয়েকটি বক নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছে। বিলে মাছ খুব, মাঝে মাঝে দুই-একটা লাফাইয়া উঠিতেছে। ও-পারে একজোড়া মানিকজোড় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর এক অংশে সারসজাতীয় প্রকাণ্ড একটা পাখি এক পায়ের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক তাহার মাথার উপরে একটা শঙ্খচিল উড়িয়া

বেড়াইতেছে, সেদিকে তাহার খেয়াল নাই। বিলের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা কুমীর গা ভাসাইয়া নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে; না জানিলে মনে হইবে, একটা কাঠ ভাসিতেছে বুঝি। ঠিক তাহারই পাশে ভাসিতেছে প্রকাণ্ড সাদা একটা মেঘের ছায়া। দূরে জেলেদের জাল শুকাইতেছে। ছোট ছোট মাছ ধরিবার জন্য এক জায়গায় সারি সারি আড়া পাতা। তাহার কাছে জেলেরা নিজেদের প্রয়োজনে সারি সারি কয়েকটা বাঁশ পুঁতিয়াছে। তাহার একটাতে একটা ফিঙা এবং আর একটাতে একটা মাছরাঙা পাখি বসিয়া আছে।

নিদাঘ-মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত প্রাখর্য জলন্ধর বিলে একটু যেন প্রশান্ত হইয়া আসিয়াছে। কোথায় যেন একটা চিল ডাকিতেছে। আর ডাকিতেছে ফটিক-জল —ফটি—ক জল। পাখিটিকে দেখা যায় না, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠস্বর রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরকে তন্দ্রাতুর করিয়া তুলিয়াছে। বিশালকায় জলন্ধর বিলের বিচিত্র সৌন্দর্য কিন্তু বাদল ডাক্তারকে মোটেই আকৃষ্ট করিতেছে না। এইমাত্র যে মুমূর্ষু রোগীটি তিনি দেখিতে আসিলেন, তাহার কথাও তাঁহার মনে নাই। বাদল ডাক্তার ভাবিতেছিলেন, এবার মায়াকে কবিতায় একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়? হয়তো উত্তর দিতে পারে। বেশ সরস ছোট্ট একটি কবিতা। কবিতার প্রথম লাইনটা কি হইবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে উর্ধ্বশ্বাসে তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন।

ফোঁস্‌স্‌—

কল্পলোক হইতে সহসা কঠিন বাস্তবলোকে বাদল ডাক্তারকে নামিয়া আসিতে হইল। প্রকাণ্ড একটি সাপ পাশের একটা ঝোপ হইতে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জলন্ধর বিলকে উপেক্ষা করিয়া অন্যমনস্ক লোকটা চলিয়া যাইতেছে বলিয়া জলন্ধর বিলের আহত আত্মমর্যাদা যেন সক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিয়াছে।

বাইকের গতিবেগ আরও বাড়াইয়া দিয়া ঝড়ের মতন বেগে বাদল ডাক্তার জলন্ধর বিল পার হইয়া গেলেন। বাদল ডাক্তার বলিষ্ঠ লোক। প্রচুর খাইয়া এবং দুপুরে ঘুমাইয়া যদিও একটু মোটা হইয়াছেন, কিন্তু একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়েন নাই। ঢিলা-হাতা লংক্লথের পাঞ্জাবি পরিতে ভালবাসেন। এখনও তাহাই পরিয়া আছেন, পাঞ্জাবিতে হাওয়া ঢুকিয়া পিছন দিকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাদল ডাক্তার দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। আহা এ সময় পাশে যদি মায়া থাকিত! সাইড-কারটা খালিই রহিয়াছে।

জলন্ধর বিল পার হইলেই কালভৈরবের মাঠ, মাঠটা পার হইলেই নালতে

গ্রাম। নালতে গ্রামে হরিচরণ মাস্টার আছে, তাহার নিকট হইতে কাগজ যোগাড় করিতে হইবে। ফাউন্‌টেন-পেন সঙ্গেই আছে।

৭

বিরিঞ্চির গাড়ি যখন নালতে গ্রামে ঢুকিল, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঢুকিতেই যে ডোবাটা আছে, তাহাতে গোটা কয়েক মহিষ কাদা মাখিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তীরে গোটা দুই রাখালবালক ডাংগুলি খেলিতেছে। নালতে গ্রামের বিলু বাগদী কাঁধে জাল ফেলিয়া জলন্ধর বিলে মাছ ধরিতে যাইতেছিল। সে বিরিঞ্চিকে চিনিত, তাহারই মুখে বিরিঞ্চি শুনিল যে, বাবুরা ঠিক ইহার পরের গ্রাম শঙ্করাতে অবস্থান করিতেছেন। জম্‌জম নামক বদমেজাজী হাতীটার নাকি সত্য সত্যই মাথা-গরম হইয়া গিয়াছে। ঝাংরু গ্রামের পুষ্করিণীতে হাতীটাকে নামাইয়া স্নান করাইতেছে। মেজবাবুকে নামিতে হইয়াছে। শঙ্করা-কাছারিতে ছোটবাবুর কাজ ছিল, তিনিও নামিয়াছেন। ভাইদের পিছনে ফেলিয়া বড়বাবু একা যাইতে রাজী হন নাই বলিয়া তিনিও নামিয়া পড়িয়াছেন।

পোদ্দারের দোকানটা খোলা আছে হে?

বিলু বলিল, আছে।

বিরিঞ্চি গাড়ি হাঁকাইয়া নালতে গ্রামের বিলাস পোদ্দারের দোকান অভিমুখে যাত্রা করিল। বিলু চলিয়া গেল।

গোহুম্‌না চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

তাহার ডান গালটা রোদ লাগিয়াই সম্ভবত লাল হইয়া উঠিয়াছে। বেশবাস বিস্রস্ত। নীল চোখ দুইটা জ্বলিতেছে।

বিলু চলিয়া গেলে বিরিঞ্চি ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, ঝাংরুকে কিছু বলিস না, কেমন? তোর চুড়ি আমি কিনে দিচ্ছি এখানেই। বলবি না তো?

গোহুম্‌না নীরব।

বিরিঞ্চি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, কটা চুড়ি ভেঙেছে তোর?

চারটে।

এখুনি কিনে দিচ্ছি আমি, ওই যে পোদ্দারের দোকান খোলাই আছে দেখছি।

আর একটু আগাইয়া, রাস্তার পাশের ছোট মনিহারি দোকানটার সামনা-সামনি গিয়া বিরিঞ্চি গাড়ি থামাইল।

গোহুম্‌নার হাতে যে চুড়িগুলি অবশিষ্ট ছিল, তাহা দেখাইয়া বিরিঞ্চি প্রশ্ন করিল, এমনই ধারা চুড়ি তোমার আছে নাকি হে পোদ্দার ?

পোদ্দার বিরিঞ্চির বন্ধুলোক। গোহুম্‌নার দিকে এক নজর চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, আছে বইকি, কত চাই ?

বেশি নয়, গোটা চারেক।

পোদ্দার হাসিমুখে দুই-তিন রকম মাপের লাল রেশমী চুড়ি বাহির করিল। গোহুম্‌না তাহার ভিতর হইতে চারিটিব াছিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হাতে পরিয়া ফেলিল। ডান হাতে তিনটি এবং বাঁ হাতের একটি চুড়ি ভাঙিয়া গিয়াছিল।

বিরিঞ্চি বলিল, দাম কত ?

দাম !

বিলাস পোদ্দার সম্মুখের সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া এবং আর একবার গোহুম্‌নার পানে চাহিয়া বলিল, ও-চারগাছা চুড়ির আর কি দাম নোব তোমার স্যাঙাতনীর কাছ থেকে ? সেটা কি ভাল দেখায়, কি বল তুমি ?

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল, তবে নিও না। তা হ'লে এবার চলি আমি।

আরে ভাই, একটু-তামুক-টামুক খেয়ে যাও, নামই না।

না ভাই, বড় দেরি হয়ে গেছে। ফেরবার পথে নামব।

ভুলো না কিন্তক।

আচ্ছা।

বিরিঞ্চি গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল।

গোহুম্‌না নীরবে বসিয়া রহিল।

নালতা গ্রাম পার হইয়া ছোট একটা মাঠ, তাহার পরই শঙ্করা গ্রাম। নালতে গ্রামের সীমান্তে কয়েকটা বড় বড় আমগাছ পথটাকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। গাছের তলায় তলায় বিরিঞ্চির গাড়ি চলিয়াছে। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই।

হঠাৎ গোহুম্‌না বলিল, গাড়ি থামা, নামব আমি।

কেন ?

জল-পিপাসা লেগেছে আমার।

গোহুম্‌না গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল।

বিরিঞ্চি গাড়ি থামাইয়া বলিল, এখানে জল পাবি কোথা ?

তুই একটুকু দাঁড়া, আমি গাঁয়ের ভেতর থেকে এক ছুটে খেয়ে আসি। পালাস না যেন।

পালাব কেন?

না, পালাবি না! পুরুষ জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি! দেখি তোর গামছাখানা।

বিস্মিত বিরিঞ্চি বলিল, কেন?

দেখি না।

বিরিঞ্চি কোমর হইতে গামছাখানা খুলিয়া দিল।

এইবার তোর হাত দুটো দেখি।

বিরিঞ্চিকে আর কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া গোহম্‌না গামছা দিয়া বিরিঞ্চির হাত দুইখানা বাঁধিয়া ফেলিল।

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল, এ কি?

আমার নিজের গামছা দিয়ে তোর পা দুটোও বাঁধাব। পুরুষ লোককে বিশ্বাস আছে? চোখের আড়াল হ'লেই পালিয়ে যায়।—বলিয়া সে সত্য সত্যই নিজের ছোট পুঁটলিটি খুলিয়া গামছা বাহির করিল এবং বিরিঞ্চিকে আদেশের সুরে বলিল, নে, পা দুটো জড়ো কর্‌ শিগগির।

বিরিঞ্চির মজা লাগিতেছিল। সে হাসিয়া পা দুইটা একসঙ্গে জড়ো করিরা বসিল। গোহম্‌না বেশ করিয়া তাহার পা দুইটাও বাঁধিল।

উঃ উঃ, লাগছে যে, কত জোর বাঁধছিস?

বেশ করিয়া গেরোর উপর গেরো দিয়া গোহম্‌না বলিল, ব'সে থাক্‌ চুপ ক'রে।

তাহার নীল চক্ষু দুইটি সাপের চক্ষুর মত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে।

বিরিঞ্চি বলিল, এমনই ক'রে ব'সে থাকব নাকি?

থাক্‌ না, মজা পাবি!—বলিয়া গোহম্‌না একটা ইট কুড়াইল এবং সেটা সজোরে গাছের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

গাছে প্রকাণ্ড একটা ভীমরুলের চাক ছিল।

শঙ্করা গ্রামের কাজল-দীঘিতে ঝাংরু জম্‌জমকে নামাইয়াছিল। কয়েক দিন স্নান করানো হয় নাই বলিয়াই হাতীটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘণ্টাখানেক জলে পড়িয়া থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। ঝাংরু হাতীর কাঁধ হইতে নামে নাই।

সে ডাঙশ লইয়া নিজের স্থানটিতে ঠিক বসিয়া ছিল। ঘাড়ে সওয়ার হইয়া বসিয়া থাকিলে হাতীর বাবার সাধ্য আছে তাহাকে ফেলিয়া দেয়! এঁটুলি যেমন করিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, ঝাংরু ঠিক তেমনই ভাবে তাহার ঘাড়ে বসিয়া ছিল। হাতী ডুবিয়া যাইবার মত জল কাজল-দীঘিতে ছিল না। জম্‌জম শুঁড়ে করিয়া জল লইয়া নিজের মাথায় এবং ঝাংরুর সর্বাঙ্গে ছিটাইতেছিল। তাহার ফোঁসফোঁসানি যদিও এখনও কমে নাই, কিন্তু জলে নামিয়া সে পূর্বাপেক্ষা অনেকটা শান্ত হইয়াছে। মজা দেখিবার জন্য তীরে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু ভিড় দেখিলে জম্‌জম পাছে আবার ক্ষেপিয়া উঠে, এইজন্য ঝাংরু তীরে কাহাকেও দাঁড়াইতে দেয় নাই। ঝাংরুর মানা সত্ত্বেও দু-চারিটা ছোঁড়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন মজার সন্ধান না পাইয়া তাহারাও একে একে সরিয়া পড়িয়াছে। তীর এখন নির্জন! অদূরে সারি সারি কয়েকটা তালগাছ দাঁড়াইয়া আছে! মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া সশব্দে তাহাদের পাতাগুলিকে নাড়া দিয়া যাইতেছে। পাশের একটা ঝোপ হইতে একটা নেউল বাহির হইল, এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, আবার ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বাহির হইল এবং সেটাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। কয়েকটা বড় বড় প্রজাপতি ও-ধারের ঘেঁটুবনটায় উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। জলের ধারে কতকগুলি ঘলঘসে ফুলের গাছ। শুঁড়ের মতন বাঁকানো ডালের উপর সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে! ঠিক তাহাদেরই কাছে ঘাস-পাতার জঙ্গলে জাল পাতিয়া একটি বিচিত্র রঙের মাকড়সা শিকারের আশায় ওত পাতিয়া আছে। অদূরে জীর্ণ শিব-মন্দিরটার দুয়ার বন্ধ। কেহ কোথাও নাই। জম্‌জম ক্রমাগত শুঁড়ে করিয়া জল তুলিয়া তুলিয়া মাথায় ঢালিতেছে! ঝাংরু তাহার কানে ডাঙশটা ঝুলাইয়া রাখিয়া ঘসিয়া ঘষিয়া তাহার মাথাটা পরিষ্কার করিয়া দিতেছে এবং হস্তী-বোধ্য ভাষায় তাহার সহিত কি কথা বলিতেছে।

জম্‌জম সহসা খুব জোরে ফোঁস করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গোহুম্‌না পিছন দিক হইতে ঝাংরুকে জড়াইয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোহুম্‌না জলে নামিয়া পিছন দিক হইতে চুপিচুপি কখন হাতীতে চড়িয়াছে, ঝাংরু বুঝিতেও পারে নাই।

এ কি, তুই কোথা থেকে এলি?

পালিয়ে এলাম।

কোথা থেকে?

বিরিঞ্চির গাড়ি থেকে।

কেন?

বাবা রে বাবা, যে ভামরুল সেখানে!

ভীমরুল!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ভীমরুল। নালতে পেরিয়ে একটা আমগাছের তলা দিয়ে আসছি আমরা, এমন সময় তোমার বিরিঞ্চি লাঠি তুলে যেই তার গরুকে হাঁকাতে যাবে, লাঠি গিয়ে লাগল এক ভীমরুলের চাকে, গাছের নীচু ডালটায় বাসা ছিল তাদের।

তোর গালে কিসের দাগ?

আমার গালে একটা বসেছিল এসে, আর একটু হ'লেই হুলটা ফুটিয়ে দিত।

ঝাংরু চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, তুই বিরিঞ্চি বেচারাকে অমন বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে এলি? আচ্ছা লোক তো তুই!

ভীমরুলকে আমি বড্ড ডরাই বাপু।

গোহুম্না ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ঝাংরুও হাসিল।

জম্‌জম আর একবার ফোঁস করিয়া উঠিল।

৮

শঙ্করা-কাছারিতে যে কাজটির জন্য ছোটবাবু নামিয়াছিলেন, সে কাজটি বেশ একটু জটিল-গোছের। কিছুদিন পূর্বে জগাই ক্ষ্যাপা নামক জনৈক সিদ্ধ-পুরুষ শঙ্করা গ্রামে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছেন। এমন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, শঙ্করা-কাছারির গোমস্তা দ্বারিকা ঘোষাল সংবাদটা সদরে দাখিল না করিয়া পারেন নাই।

ছোটবাবু খবর পাঠাইয়াছিলেন যে, কলমিপুরে যাইবার মুখে তিনি শঙ্করায় নামিবেন এবং উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া যথোচিত বন্দোবস্ত করিবেন।

সিদ্ধপুরুষটির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুইটি দল খাড়া হইয়াছে। এক দলের মতে, সিদ্ধপুরুষ সত্যই সিদ্ধপুরুষ—নানারূপ গন্ধ বাহির করিয়া, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া এবং আরও নানা রকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করিয়া তিনি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন; সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বিপক্ষ দলে গ্রামের

সমস্ত যুবকবৃন্দ জুটিয়াছে। তাহারা বলিতেছে পুরুষটি হাফ-বয়েল্‌ড্‌ বা হার্ড-বয়েল্‌ড্‌ যাহাই হউন, উঁহার মতলব সুবিধার নয়। মেয়েদের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিবার হেতুটা কি? বাছিয়া বাছিয়া যুবতী মেয়েদের দ্বারাই গা-হাত-পা টিপাইবার আধ্যাত্মিক অর্থ তো তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। বুঝিতে চাহেও না। জমিদারবাবুরা যদি ইহার একটা বিহিত না করেন, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই ইহার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। মারের চোটে সিদ্ধপুরুষকে একেবারে 'ন্যাকোট' করিয়া ছাড়িয়া দিবে।

সমস্যা গুরুতর। দ্বারিক ঘোষালের মুখে যাহা শুনা যাইতেছে, তাহাতে সিদ্ধপুরুষটি সত্যই একটু বিচিত্র ধরনের লোক। কুচকুচে কালো রঙ, ষণ্ডামার্কা চেহারা, কিন্তু স্ত্রীলোকের মত পোশাক পরিয়া থাকেন। মাথায় লম্বা চুল, নাকে নোলক, কাছা নাই, বুকে সর্বদাই আঁচল টানিতেছেন। সখীভাব! যুবকেরা ইঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ প্রাচীন মাতব্বর ব্যক্তিই ইঁহার স্বপক্ষে। এমন কি ছাতিমপুর গ্রামের নামজাদা ঘুষখোর দারোগাটি পর্যন্ত ভক্তিতে গদগদ। সমস্ত শুনিয়া ছোটবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চট করিয়া কিছু একটা করিয়া বসা তাঁহার স্বভাব নয়। যদিও তিনি যাহা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে বড়বাবু, মেজবাবু কেহই একটি কথা বলিবেন না; তবু নিজের দায়িত্বে চট করিয়া একটা হুকুম তিনি দিতে পারিলেন না। ঘটনাটা বড়বাবুর গোচর করিলেন।

বড়বাবু সটকায় একটা টান দিয়া বলিলেন, কারও স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। ওই হিজড়ে-মার্কা সিদ্ধপুরুষ যদি এখানে থেকে সুখ পায় থাকুক, কেউ যদি স্বেচ্ছায় ওকে বাড়িতে স্থান দেয় দিক, কোন মেয়ে যদি ওর পা টিপে সুখ পায় পাক, আর ছোকরারা যদি সেজন্যে ওকে ধ'রে পিটতে চায় পিটুক, আর তুমিও যদি এ বিষয়ে কিছু একটা করতে চাও কর। আমার কাছে সবই সমান।—এই বলিয়া তিনি সটকায় পুনরায় একটা টান দিলেন।

নিকটেই লাহিড়ী বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, ভোট নাও। এই ডেমোক্র্যাসির যুগে সবই তো ভোট দিয়ে ঠিক হচ্ছে।

বড়বাবু বলিলেন, ভোট! খুব সহজ বুদ্ধি বাতলালে তো! গাঁ-সুদ্ধু লোকের ভোট নিয়ে বেড়াতে হবে এখন! তখুনি তোমাকে বললুম, দু পেগ চড়িয়ে নাও, কি রকম যেন মিইয়ে পড়েছে আজ সকাল থেকে।

লাহিড়ী এই কথায় এমন একটা হাসি হাসিলেন, যাহার অর্থ—আপনি যে

এ কথা বলিবেন, তাহা আগেই জানিতাম এবং আপনি ছাড়া এমন কথা কেই বা আর বলিতে পারে !

মুখে কিন্তু তিনি বলিলেন, সহজ বুদ্ধি একটা বাতলান তা হ'লে। আমাদের ছোটবাবু যে ফাঁপরে পড়েছেন !

সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে ব্যাপারটা ছোটবাবুর হাতেই ছেড়ে দেওয়া।

বড়বাবু আবার সটকা তুলিয়া লইলেন। ছোটবাবু একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গেলেন মেজবাবুর কাছে। মেজবাবু কাছারিবাড়ির শীতলতম ছোট ঘরটিতে তাকিয়া ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। কোলের কাছে টোকনের বান্ধবী ও হরিশ খুড়োর নাতনী চাঁপা বসিয়াছিল। এই ফুটফুটে মেয়েটি মেজবাবুর বড় প্রিয়। তাঁহার সহিত হাতীতে চড়িয়া আসিয়াছে। টোকনও আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মেজ মা ওই দুরন্ত ছেলেকে হাতীর পিঠে আসিতে দেন নাই। মেজবাবু মুশকিলে পড়িয়াছেন, চাঁপা টোকনের জন্য ছটফট করিতেছে। কাছে থাকিলে যদিও দুইজনে ঝগড়া এবং কথা-কাটাকাটি ছাড়া আর কিছুই করে না, কিন্তু ছাড়াছাড়ি হইবারও উপায় নাই। এ বিপদ যে ঘটিবে, তাহা মেজবাবু জানিতেন। সেইজন্য টোকনকেও হাতীতে লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মেজ গিন্নীর কথার উপর—

ছোটবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আনুপূর্বিক সমস্ত শুনিয়া মেজবাবুর যৌবনকালের মেজাজটা ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি তাকিয়া ছাড়িয়া বিরাট দেহ লইয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, দ্বারিককে বল, হাঁকিয়ে দিক ব্যাটাকে। ওসব বুজরুকি-ফুজরুকি চলবে না এখানে—গোঁফের ওপর নোলক ঝুলিয়ে ধর্মের নামে ভেলকি দেখাবার জায়গা এ নয়। দূর ক'রে দাও ব্যাটাকে।

ছোটবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, মেজবাবু আবার ডাকিলেন, শোন শোন। তুমিই যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর গিয়ে। যত সব জোচ্চোরের আড্ডা হয়েছে এখানে।

ছোটবাবু চলিয়া গেলেন।

চাঁপা পুনরায় প্রশ্ন করিল, টোকন এখনও আসছে না কেন ?

স্নিগ্ধকণ্ঠে মেজবাবু বলিলেন, এই এসে পড়ল ব'লে।

এত স্নিগ্ধকণ্ঠে যে, কে বলিবে এই লোকটারই মেজাজ একটু আগে সপ্তমে চড়িয়াছিল !

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ছোটবাবু শেষে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

দ্বারিক ঘোষালকে বলিলেন, এক কাজ কর তুমি, সিদ্ধ-পুরুষটিকে আমাদের সদরে নাটমন্দিরে চালান ক'রে দাও। সেখানে ভাল থাকবেন উনি। একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে কালই পাঠিয়ে দাও সেখানে। ওঁকে গিয়ে বল যে, আমরা ওঁর খ্যাতি শুনে মুগ্ধ হয়েছি এবং দেখা করতে চেয়েছি। এ কথা শুনলে উনি যেতে আপত্তি করবেন না। কলমিপুর থেকে ফিরে তার পর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আমি চক্রবর্তী মশাইকেও ব'লে দিচ্ছি।

বাহিরের বারান্দাতে প্রবীণদলের মুখপাত্র চক্রবর্তী মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ছোটবাবু তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, আমাদের সকলেরই ইচ্ছে যে, আমাদের নাটমন্দিরে বাবা একবার পদধূলি দেন। এখন তো তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ ঘটল না, দ্বারিককে তাই ব'লে দিলাম, আমাদের ওখানে যাবার সব ব্যবস্থা যেন ও ক'রে দেয়। নাটমন্দিরে থাকবার কোন অসুবিধে হবে না। আমাদের সদর-নায়েব চৌধুরীও মহাভক্ত লোক। সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে ওঁর। কালই একবার পাঠিয়ে দেবেন ওঁকে দয়া ক'রে।

চক্রবর্তী সোৎসাহে বলিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, মহাপুরুষ লোক উনি, নিয়ে যাবেন বইকি আপনারা। মানী না হ'লে মানীর মান রাখবে কে?

চক্রবর্তী ছাতা ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেলেন এবং নিজের দলকে গিয়া খবর দিলেন, বাবুরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন ওঁকে নিজেদের নাটমন্দিরে।

বিপরীত দিকের বরান্দায় ছোকরাদের মুখপাত্র বিপ্‌নে অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইয়াছিল! ছোটবাবু তাহাকে গিয়া বলিলেন, কালই ও গ্রাম থেকে চ'লে যাবে, সে ব্যবস্থা করেছি। তোমরা আর কিছু ব'লো না ওকে।

যে আজ্ঞে।

পুলকিত বিপিনও নিজের দলে গিয়া বিজয়বার্তা জ্ঞাপন করিল। বলিল, ছোটবাবু বললেন, কালই ব্যাটাকে কান ধ'রে গ্রাম থেকে বার ক'রে দেবেন।

হুম ব্রো, হুম ব্রো, হুম ব্রো—

মেজ মা, তরঙ্গিণী, ঊষা, ঠানদি, ঠাকুরদা—সকলের পালকি আসিয়া পড়িল। অশ্বপৃষ্ঠে হীরেনও আসিল। কিন্তু সুরেনের আর মীনার পাত্তা নাই। পালকির শব্দ পাইয়া মেজবাবু.ও ছোটবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। চাঁপা ছুটিয়া গিয়া টোকনের গলা জড়াইয়া ধরিল। মেজ মা মেজবাবুকে নিরাপদ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তরঙ্গিণী ছোটবাবুর প্রতি একবার আড়চোখে চাহিয়া একটু হাসিয়া

পালকির অন্তরালে আত্মগোপন করিল। ছোটবাবুর মুখে নয়—চোখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মেজ মা মেজবাবুকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু সুরেন-মীনার জন্য পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

হীরেন বলিল, কালভৈরবের মাঠে একটা খরগোশ দেখে সুরেন তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে। সে এসে পড়বে এখুনি।

ঊষা বলিল, মীনাও এল ব'লে। ভয় কি, তার সঙ্গে তো নেহাল সিং আছে!

মেজ মা চিন্তিত মুখে বলিলেন, পরের মেয়ে, ভালায় ভালয় এসে পৌঁছলে বাঁচি। যা রোদ উঠেছে, বেয়ারাগুলো হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আস্তে আস্তে আসছে।

ছোটবাবু ছদ্ম-সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আহা সত্যি, বড় কষ্ট বেচারাদের! বড্ড ভুল হয়ে গেছে, বেয়ারাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এক দল পাংখা-বরদার ঠিক করলেই হ'ত, বেয়ারাগুলোকে হাওয়া করতে করতে আসত।

মেজ মা কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, নিজেদের যদি বইতে হ'ত কাঁধে ক'রে, ঠাট্টা করা বেরিয়ে যেত তা হ'লে।

ছোটবাবু কাছারির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ঊষা পালকি হইতে বাহির হইয়া হীরেনের সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

মেজবাবু ঠাকুরদার পালকির নিকট গিয়া বলিলেন, ঠাকুরদা, আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে যেন!

আমার মত অবস্থায় পড়লে তোমাকেও দেখাত।

কেন, কি হ'ল?

আমার একমাত্র গৃহিণীর ওকমাত্র কোমর বিপন্ন।

মেজবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, এর ভেতরও আপনি ঠানদির কোমর তদারক করবার অবসর পেয়েছেন? আশ্চর্য!

ঠানদি হাসিয়া বলিলেন, তার চেয়েও আশ্চর্য যে, তোমরা এতদিনেও তোমাদের ঠাকুরদাটিকে চিনতে পারলে না।

মেজবাবু বলিলেন, হ'ল কি আপনার কোমরে?

পালকিতে ব'সে ব'সে কোমরে খিল ধ'রে গেছে ভাই। কোমরের সে জোর কি আর আছে?

তার জন্যে ভাবনা কি, আমাদের দ্বারিকও বেতো মানুষ, ওর কাছে নিশ্চয়

মহামাস-টাস কিছু একটা আছে। দিচ্ছি যোগাড় ক'রে, দাঁড়ান।

ঠাকুরদা ব্যগ্রতার ভান করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, দাও তো ভাই, কলমিপুরের মাঠে গিয়ে একটু মালিশ ক'রে দোব না হয়।

মেজবাবু হাসিয়া কাছারির দিকে চলিয়া গেলেন।

ছোটবাবু পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং আড়চোখে একবার মেজ মায়ের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন।

মেজ মা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, বড়দিরা কি চ'লে গেছেন?

হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ আগেই গেলেন তাঁরা। মা তো রাস্তায় জলগ্রহণ করবেন না, সেখানে গিয়ে ময়না নদীতে নেয়ে আহ্নিক ক'রে তবে খাবেন কিছু। সেইজন্যে ওঁদের আর আটকালাম না। ওই যে, গরুর গাড়িগুলোও এসে গেল দেখছি।

দূরে রাস্তায় গরুর গাড়ির সারি দেখা গেল। বিরিঞ্চির গাড়ি ছাড়া বাকি নয়খানা গাড়ি আসিতেছে।

মেজ মা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, নতুন হাতীটা রাস্তায় কোন বদমায়েশি করে নি তো?

মেজবাবু বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই জবাব দিলেন, করেছিল একটু-আধটু। ঝাংরু সেটাকে নাওয়াতে নিয়ে গেছে কাজলদীঘিতে। মাথায় জল-টল পড়লেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বোধ হয়।

ছোটবাবু বলিলেন, তবু ওতে আর তোমার যাওয়া চলবে না, তুমি আমার হাতীতেই এস। চাঁপা না হয় কোন একটা পালকিতে উঠুক।

মেজ মা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ছোটবাবুর মুখের পানে চাহিলেন।

মেজবাবু কোনদিন ছোটবাবুর কথার প্রতিবাদ করেন না, নির্বিকারভাবে বলিলেন, বেশ।

মেজ মা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, টোকন নাই।

টোকন কোথা গেল?

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওই যে, কাঠবেরালি-শিকার হচ্ছে।

কাছারি-বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছটায় অসংখ্য কাঠবেরালি লেজ ফুলাইয়া কিচকিচ শব্দ করিতে করিতে পরস্পরকে তাড়া করিতেছিল। তাহারই একটাকে টোকন এয়ার-গান দিয়া লক্ষ্য করিতেছে। নিকটেই চাঁপা পাকাগিন্নীর

মত ওষ্ঠ-ভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ভাবটা যেন—তুমি যা মারিতে পারিবে, আমি তা জানি। বরং বন্দুকটা আমায় দাও, কি করিয়া টিপ করিতে হয় দেখাইয়া দিতেছি।

মেজ মা হাসিয়া বলিলেন, তোমার শিকারী ছেলের জ্বালায় গেলাম বাপু।

ইহার উত্তরে ছোটবাবু কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ঝরঝরে বাইকে চড়িয়া ব্যস্তসমস্তভাবে নীলু দত্ত আসিয়া হাজির।

মেজ মা ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া পালকির ভিতর অন্তর্হিতা হইলেন।

নীলু দত্ত বলিলেন, ভারি ভুল হয়ে গেছে একটা, লণ্ঠনের কথা মনেই ছিল না। দ্বারিক কোথা ?

দত্ত মহাশয় বাইক হইতে নামিয়া বাইকটা ঠেলিতে ঠেলিতে দ্বারিকবাবুর সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কি দাঁড়াইবার অবসর আছে! একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, এখানে আছে গোটা চারেক লণ্ঠন, ছাতিমপুরেও গোটা দুই পেয়েছি, দেখি নালতেতে যদি পাই কয়েকটা।

নীলাম্বর পুনরায় বাইকে সওয়ার হইতেছিলেন, এমন সময় ছোটবাবু বলিলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

নীলাম্বর দাঁড়াইলেন।

ওখানকার আর সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কটা তাঁবু গাড়ালে সবসুদ্ধু ?

নটা। আপনাদের তিনটে, গিন্নীমার একটা, জামাইবাবুর একটা, হীরেনবাবুর একটা, চাকরানীদের একটা—

চাকরানীদের তাঁবুটার উল্লেখ করিয়া নীলু দত্ত চকিতে একবার ছোটবাবুর মুখের পানে চাহিলেন এবং বলিতে চাহিলেন, চাকরানীদের তাঁবুটা তাঁহার তাঁবুর কাছেই দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু কি মনে করিয়া আবার চাপিয়া গেলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, মোষের বাচ্চাটার কি হ'ল ?

সেটাকে মেরেছে।

অ্যাঁ, বল কি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকজন পাহারা বসিয়ে দিয়েছি সেখানে। মাচানও বাঁধিয়েছি তিনটে। আমি এবার যাই বাবু, অনেক কাজ বাকি এখনও—

ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি বাইকে উঠিয়া পড়িলেন।

দুই দিন কামানো হয় নাই, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। মাথায় মুখে খাবছা খাবছা চুল উঠিয়া টাকটা আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। রোদে সমস্ত মুখখানা যেন পুড়িয়া গিয়াছে। নিদারুণ পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, অনিয়মে এক দিনেই যেন নীলু দত্ত আরও দশ বৎসরের বুড়ো হইয়া গিয়াছেন। খাটিয়া খাটিয়া তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল, এদিকে লাহিড়ীটা দিব্য বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া ইয়ারকি দিতেছে! লোকটার লজ্জাও নাই! মনে মনে লাহিড়ীর চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে নীলু দত্ত সবেগে নালতে অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। অন্তত আরও গোটা চারেক লণ্ঠন যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার ভিতরই ফিরিতে হইবে।

খানিকক্ষণ পরে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না।

অশ্বপৃষ্ঠে সুরেন এবং মীনা!

দুইটি পা এক দিকে ঝুলাইয়া সঙ্কুচিত মুখে মীনা সামনে বসিয়া রহিয়াছে এবং সুরেনের বাম বাহুটি পিছনের দিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। নিকটে আসিয়াই মীনা নামিয়া পড়িল। সুরেনও নামিল। সহিসের হাতে লাগামটা দিয়া সুরেন আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে এই যুগল আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা দিল, তাহাতে সকলেই খুশী হইলেন। ধাবমান শশকের পশ্চাতে কিছুদূর ছুটিয়া সুরেনকে অবশেষে হার মানিতে হইয়াছিল। কালভৈরবের মাঠে শশকটা মরীচিকার মত কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহা সুরেন ধরিতেই পারে নাই।

সুরেন বলিতে লাগিল, ফিরছি, কিছুদূর এসে ওই আপনাদের নালতে গ্রামটা পেরিয়েই কতকগুলো আমগাছ আছে, তার তলায় দেখি, মীনার পালকি। কাছে একটা গরুর গাড়িও রয়েছে। শুনলাম, গাছে নাকি একটা ভীমরুলের চাক ছিল, কি ক'রে তাতে খোঁচা লেগেছে, গাড়ির গাড়োয়ানটাকে কামড়েছে, মীনার পালকির দুজন বেয়ারাকেও কামড়েছে।

ছোটবাবু বলিলেন, বল কি? নেহাল সিং কোথা?

সে বেচারা ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে স'রে গেছল ব'লে বেঁচে গেছে, তাকে কামড়াতে পারে নি। সে আসছে পেছু পেছু।

মেজবাবু বলিলেন, তার পর?

আমি এসে দেখি, এই অবস্থা। গাড়ির গাড়োয়ানটা তো অজ্ঞান-প্রায়, বেয়ারা দুটো ছটফট করছে, মীনা পালকির দরজা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছে।

মেজ মা বলিলেন, কি বিপদ দেখ দিকি!

সুরেন বলিতে লাগিল, ভাগ্যিস আমি গিয়ে পড়লুম, তা না হ'লে মহা মুশকিলে পড়ত মীনা। তাও আবার ঘোড়ায় উঠতে চায় না কিছুতে। অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে তবে নিয়ে এলাম।

সুরেন হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে মীনার পানে চাহিল। মীনা সঙ্কুচিত হইয়া এক ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

উষা এবং হীরেনও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্বামীর এই কৃতিত্বে উষা যেন অহঙ্কারে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মীনার দিকে চাহিয়া বলিল, ঘোড়ায় চড়তে ভয় করে নাকি তোর? আচ্ছা ভীতু তো! আমাদের ও-ঘোড়াটা খুব ফ্রেন্ড্‌লি, টোকন পর্যন্ত চড়ে ওর পিঠে।

মেজ মা প্রশ্ন করিলেন, গাড়োয়ানটার আর বেয়ারাগুলোর কি হ'ল?

সুরেন বলিল, তারা আসছে। গাড়ির পেছনের দিকে পালকিটা চড়িয়ে দিয়েছি, গাড়োয়ানটা তারই ভেতর শুয়ে পড়েছে। সে বেচারাকে ভয়ানক কামড়েছে। একজন বেয়ারাই গাড়িটাকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বাকি বেয়ারাগুলো হেঁটেই আসছে। নেহাল সিং সঙ্গে আছে।

মেজ মা বলিলেন, আহা বেচারীরা!

ছোটবাবু তাড়া দিলেন, যাক্‌, সে যা হবার হয়েছে। চল, এইবার আমরা বেরিয়ে পড়ি। মিছে দেরি ক'রে আর লাভ কি?

তাহার পর সুরেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ওহে, তোমার 'কিল' হয়ে গেছে। এখুনি খবর পেলুম।

সুরেন সোৎসাহে বলিল, তাই নাকি?

সকলে কলমিপুরের মাঠের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মীনা আর উষা একটি পালকির ভিতর ঢুকিল।

৯

নালতে গ্রামে বন্ধু হরিচরণ মাস্টারের বাসায় বসিয়া বাদল ডাক্তার সত্যই একটি সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।—

নিদারুণ গ্রীষ্মকাল, আকাশেতে জ্বলিতেছে চিতা,
ঘর্মাক্ত-কলেবরা হে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী দেবী,

ঘূর্ণমান পাংখাতলে, জানি আমি, তুমি নিপীড়িতা
কঠিন কর্মের ভারে অথবা মর্মের ভারে may be!
ক্লাস, ঘণ্টা, ছাত্রী, ফোন, মীটিং, রুটিন, সেক্রেটারি,
পরীক্ষার প্রশ্নাবলী, গার্জেনরা, কেরানী, চাপরাসী
রুদ্ধ করি মুক্ত বায়ু দাঁড়াইয়া আছে সারি সারি ;
ভিড় বাড়াইতে, দেবী, নাহি ইচ্ছা তার মাঝে আসি।
আমিও ঘর্মাক্ত-দেহ, আর্দ্র ভুঁড়ি শ্লথ নীবিবাস,
ঘর্ম-বিচর্চিকাগুলি চুলকাইয়া কাটাই দিবস ;
তথাপি চিন্তিত আমি—(নহে, দেবী, নহে পরিহাস)
না পাইয়া কোন বার্তা চিত্ত মম সত্যই বিবশ।
চতুষ্পার্শ্বে জানি তব নানা কর্ম করে গিজগিজ,
তবু ক্ষুদ্র অনুরোধ, দু লাইন চিঠি লিখো—please।

নিকটেই হরিচরণ উবু হইয়া বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। গ্রামের মাইনর স্কুলের মাস্টার তিনি—অর্থাৎ সেই জাতীয় লোক, যাঁহারা স্কুলপাঠ্য জ্যামিতি, ইতিহাস, সাহিত্য-সন্দর্ভ জাতীয় বই এবং স্কুলের ইন্সপেক্টর, সেক্রেটারী জাতীয় লোক ছাড়া আর বিশেষ কোন কিছুর খবর রাখিবার অবসর পান না।

হরিচরণ নিরীহ ভালমানুষ লোক। বাদল ডাক্তার বিনা পয়সায় তাঁহার বাড়িতে চিকিৎসা করেন বলিয়া বাদল ডাক্তারের বিশেষ ভক্ত। তাঁহার মনের খবরটিও জানেন। বাদল ডাক্তারের মনের খবর দুইজন লোক জানেন—হরিচরণ মাস্টার এবং ছোটবাবু।

হরিচরণ কবিতাটি শুনিয়া উঠিয়া গিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং একমুখ হাসিয়া বলিলেন, খাসা হয়েছে!

তাহার পর হুঁকাটি কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া চিৎকার করিলেন, ওরে মেধো, কোথা গেলি তুই? আঃ, একটা নেবু আনতে যুগ কাটাচ্ছে!

হরিচরণ বাহির হইয়া গেলেন। বাদল ডাক্তারকে শরবত না খাওয়াইয়া কিছুতেই তিনি ছাড়িবেন না। কিছুক্ষণ পরে দুই গ্লাসে শরবত ঢালাঢালি করিতে করিতে তিনি পুনঃপ্রবেশ করিলেন। মেধো নামক ছাত্রটিও পিছনে পিছনে নেবু-হস্তে প্রবেশ করিল। শরবত পান করিয়া বাদল ডাক্তার নিজের হাত-ঘড়িটা একবার দেখিলেন। কি সর্বনাশ, চারিটা যে বাজে! আর তো

বসিয়া থাকা চলে না। সন্ধ্যা নাগাদ কলমিপুরের মাঠে না পৌঁছিতে পারিলে ছোটবাবু কি মনে করিবেন!

হরি, তোমার কাছে একটা খাম আছে ভাই?

আছে।

দাও তো, এইখানেই পোস্ট ক'রে দিই চিঠিটা।

খামের উপর মায়ার ঠিকানাটা লিখিয়া বাদল সযত্নে কবিতাটি তাহার মধ্যে পুরিয়া ফেলিলেন। যাইবার সময় পোস্ট-অফিসে সহস্তে পোস্ট করিয়া যাইতে হইবে। অবিলম্বে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

১০

সন্ধ্যা হয়-হয়।

সমস্ত দিনের গরমের পর ঝিরঝির করিয়া স্নিগ্ধ একটা হাওয়া উঠিয়াছে। নির্মল নীল আকাশ। ঝাংরু গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে জম্‌জমকে লইয়া কাঁকন নদী পার হইতেছে। পাগলা ঠাণ্ডা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে 'কাঁক' করিয়া শব্দ করিয়া গানের তালে তালে ঠিক তাল দিতেছে। গোহুম্‌না ঝাংরুর পিছনে বসিয়া তাহার পিঠে গাল রাখিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার স্বরে স্বর মিলাইয়া দুই-এক কলি গানও গাহিতেছে। মুখে অতি মৃদুমধুর একটি হাসি, চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত।

পূর্বাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে।

প্রান্তরে

প্রথম দৃশ্য

কলমিপুরের মাঠে বড়বাবুর তাঁবু। তাঁবুটি বেশ বড়। দুইটি কক্ষ আছে, কক্ষ দুইটির মধ্যবর্তী দ্বার পর্দাবৃত। বড়বাবু যে কক্ষটিতে বসিয়া আছেন, তাহাতে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই—গোটা দুই ক্যাম্প-চেয়ার, প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া, দুইটি তেপায়া। একটি তেপায়ার উপর একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এক কোণে গোটা তিনেক সুটকেস আবছাভাবে দেখা যাইতেছে। তাঁবুর সম্মুখের দরজাটা এবং দক্ষিণ দিকের বড় বড় বাতায়ন তিনটি উন্মুক্ত। দরজা দিয়া জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীর খানিকটা অংশ, কিছু দূরে দুইটি তাঁবু এবং আরও খানিকটা দূরে একটা জটলার মত দেখা যাইতেছে। বেহারা, মাহুত, গাড়োয়ান প্রভৃতি ভৃত্যগণ সেখানে গোল হইয়া বসিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছে। মাদলের আওয়াজ ও বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিতেছে। বড়বাবু কেমন যেন একটু উন্মনা হইয়া একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি কার্পেটের উপর বসিয়া লাহিড়ী হার্মোনিয়াম সহযোগে "আমার দখিন দুয়ার খোলা" গানটি আবেগভরে গাহিতেছেন। একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে নীলমণি প্রবেশ করিল এবং গড়গড়ার মাথায় কলিকাটি বসাইয়া নলটি বাবুর হাতে ধরাইয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল। বড়বাবু গান শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্কভাবে একটা টান দিলেন। কুঞ্চিত-ভ্রূ নীলু দত্ত দ্বারপ্রান্তে সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া গেল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। লাহিড়ীর গান ক্রমে শেষ হইয়া আসিল

লাহিড়ী। [হার্মোনিয়ামটা ঠেলিয়া দিয়া] নাঃ, এখন বিটোফেনের মুন্‌লাইট সোনাটা ছাড়া আর কিছুতে জমবে না। অর্গানটা আনলেই হ'ত।

বড়বাবু গড়গড়াতে কয়েকটা টান দিলেন

বড়বাবু। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, খাঁটি দুধ প্রচুর রয়েছে, কেবল মুন্‌লাইট সোনাটা নামক দম্বলটির অভাব?

বড়বাবু কথাটাকে এভাবে লইবেন, তাহা লাহিড়ী বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, মুন্‌লাইট সোনাটা বড়বাবুর প্রিয় জিনিস, সেইজন্যই কথাটা বলিয়াছিলেন। বড়বাবুর মন্তব্য শুনিয়া বুঝিলেন, কথাটা এখন বেফাঁস হইয়াছে। সারিয়া লইবার জন্য সবজান্তাগোছ একটা হাসি হাসিলেন

লাহিড়ী। খাঁটি জিনিস থাকলে আর ভাবনা কি? তেঁতুল দিয়েও জমিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে।

বড়বাবু গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন

বড়বাবু। খাঁটি জল জমাবার প্রক্রিয়া কিন্তু অন্য রকম শুনেছি।

লাহিড়ী চকিতে একবার বড়বাবু মুখের পানে চাহিলেন। বড়বাবুর কথাবার্তা আজ কেমন যেন বাঁকা বাঁকা ধরনের মনে হইতেছে

লাহিড়ী। [সহাস্যে] ঠিক ধরেছেন আপনি। সমাজ বলুন, পলিটিক্স বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই জলে জলময়।

বড়বাবু। [সহসা] বিটোফেন কালা এবং মিল্টন অন্ধ হয়ে গেছলেন, কেন জান ?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য লাহিড়ী প্রস্তুত ছিলেন না। কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বড়বাবু নিজেই উত্তর দিলেন

ভগবান ওঁদের সহায় ছিলেন।

লাহিড়ী। [হার্মোনিয়ামটা টানিয়া লইয়া] এবার কি গাইব, বলুন ? রবিবাবু তো হ'ল, নিধুবাবু ধরব একটা ?

বড়বাবু। ও-ভদ্রলোককে আর কষ্ট দেওয়া কেন ?

লাহিড়ী। তা হ'লে—

বড়বাবু। এই ফাঁকা মাঠে এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় একটা প্যাঁকপেঁকে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে বস্তাপচা কতকগুলো গান গাওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করবার ইচ্ছে হচ্ছে না তোমার ? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তো ওই কার্য ক'রে চলেছ, এখানেও ওই করবে ?

লাহিড়ী। [স্মিতমুখে] সবই তো বুঝি, কিন্তু কি করব বলুন ?

বড়বাবু। [সবিস্ময়ে] ও! কি করবে, তাও আমাকে বাতলে দিতে হবে ! স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনব ধরনে আনন্দপ্রকাশ করবার তাকত তোমার নিজের নেই ?

লাহিড়ী চমৎকার একটি সঙ্কুচিত ধরনের হাসি হাসিলেন। ভাবটা—সত্যই নাই। বড়বাবু বলিয়া চলিলেন

মেতে ওঠ। এই বিশাল মাঠে, অনাবিল জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে যাও। একটি ফোঁটা মদ না খেয়েও নেশায় চুর হয়ে পড়, তবে না বুঝব, জ্যোৎস্নারসিক তুমি। এমন সময় তাঁবুর ভেতর ব'সে হার্মোনিয়াম প্যাঁকপ্যাঁক করার কোন মানে হয় তোমাদের বয়েসে—অমন ফাঁকা মাঠ থাকতে ?

ইহার মধ্যে একটা ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করিয়া লাহিড়ী উঠিয়া পড়িলেন এবং বড়বাবু ঠিক যেন তাঁহার মনের কথাটা ধরিতে পারিয়াছেন, এমনই একটা মুখভাব করিলেন

লাহিড়ী। আমিও এতক্ষণ জাস্ট ওই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, যা ইচ্ছে করে, সব সময়ে তা করা যায় না, লজ্জা করে।

বড়বাবু। কি ইচ্ছে করছে তোমার ? উলঙ্গ হতে ? হও না।

লাহিড়ী। [সমস্ত দন্ত বিকশিত করিয়া] ঠিক তা নয়। ময়না নদীতে নৌকো বাইলে হ'ত। মানে—

বড়বাবু। বেশ তো, যাও না। নৌকো তো আছে শুনেছি একটা।

লাহিড়ী। [উল্লসিত হইয়া] আপনি আসছেন ?

বড়বাবু। না। আমারও একটা সতন্ত্র যা-খুশি আছে এবং তা জল-বিহার করতে রাজী নয় আজ। তুমি যেতে চাও যাও।

একটু হাসিয়া লাহিড়ী চলিয়া গেলেন। লাহিড়ী যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলু দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন বাহিরে ওত পাতিয়া ছিলেন

নীলু দত্ত। [একটু ইতস্তত করিয়া] পেছন দিকের ছোট তাঁবুটায় সব ঠিক আছে।

বড়বাবু। কি ঠিক আছে ?

নীলু দত্ত। [অপর কক্ষের পর্দাটার পানে সচকিতে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রায় চুপিচুপি] আমি আসবার সময় বাইকের পেছনে বেঁধে কয়েকটা শ্যাম্পেন এনেছিলাম। ভাবলাম—

বড়বাবু। ও। আচ্ছা, নীলমণিকে বল, এইখানেই নিয়ে আসুক।

নীলু দত্ত। [আর একবার পর্দাটার পানে চাহিয়া] এইখানেই ?

বড়বাবু। হ্যাঁ।

বিস্মিত নীলু দত্ত চলিয়া যাইতেছিলেন, বড়বাবু তাঁহাকে ডাকিলেন

শোন, ক বোতল এনেছ ?

নীলু দত্ত। তা আছে কয়েক বোতল—গোটা ছয়েক।

বড়বাবু। লাহিড়ীকে ডেকে এক বোতল দিয়ে দাও। ময়না নদীর দিকে বেড়াতে গেছে ওরা।

নীলু দত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবু গড়গড়ায় দুই-একটা টান দিয়া স্বগতোক্তি করিলেন

নিছক জ্যোৎস্নায় ওর কিছু হবে ব'লে মনে হয় না। অথচ সে কথা বলবার সাহস নেই।

নীলু দত্ত। [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] হুজুর কি লাহিড়ীকে এক বোতল দিতে বলছেন ?

বড়বাবু। হ্যাঁ, দাও ওকে একটা বোতল।

নীলু দত্ত। [একটু ইতস্তত করিয়া] মানে, কাল দুপুর পর্যন্ত তো এখানে থাকতে হবে। বেশী তো আনি নি, মাত্র ছটি বোতল।

বড়বাবু গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া নীলু দত্তের পানে একবার চাহিলেন। এ দৃষ্টির অর্থ নীলু দত্তের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অত্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া তিনি বলিলেন

যে আজ্ঞে, দিয়ে দিচ্ছি তা হ'লে।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে ত্রস্ত নীলু দত্ত চলিয়া গেলেন। বড়বাবু গড়গড়ার আরও দুই-একটা টান দিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। দুই কক্ষের মধ্যবর্তী পর্দাটা সরাইয়া লছমনিয়া উঁকি দিল। বড়বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না। পরক্ষণেই পর্দা সরাইয়া বড় বউ প্রবেশ করিলেন। সাজসজ্জাবিলাসিনী বড় বউয়ের এই আবির্ভাবে বড়বাবু মুখে একটা বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। আজ বড় বউয়ের সাজসজ্জা একটু নূতন ধরনের। পরনে অতি সাধারণ সুতির একখানা শাড়ি। অঙ্গে সোনার অলঙ্কার একখানিও নাই। হাতে সোনার চুড়ির বদলে লোহা এবং মোটা মোটা শাঁখা। গলাতে শাঁখের হার। হাতে একটা পানের ডিবা, সেটা অবশ্য রূপার এবং কারুকার্যখচিত। বড় বউ প্রবেশ করিয়া আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিলেন।

বড়বাবু নীরববিস্ময়ে বড় বউকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন

বড় বউ। [আর একটু জরদা মুখে দিয়া] লছমনিয়া, জামাইবাবুর তাঁবুতে গিয়ে খবর দে, আসছি আমি এখুনি।

লছমনিয়া বাহির হইয়া গেল

বড়বাবু। [বড় বউয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] হঠাৎ ঢাকনাটা খুললে যে?

বড় বউ। কিসের ঢাকনা?

বড়বাবু। তোমার নিজের। এতদিন গয়না-কাপড়ের তলায় যেন চাপা পড়েছিলে, দেখতেই পাই নি তোমায়।

বড় বউ কোন উত্তর দিলেন না। বড়বাবু আবার বলিলেন

তোমায় যে এত রূপ ছিল, চোখেই পড়ে নি তা এতদিন।

বড় বউ। [গম্ভীরভাবে] তোমার চোখের বাহাদুরি সেটা।

বড়বাবু। বুঝতে পারলাম না।

বড় বউ। রূপ তো চোখে পড়বার জন্যে অহরহ উন্মুখ, রূপ চোখে পড়বার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন ভগবান; চোখ যদি এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে চ'লে থাকে, সেটা তার বাহাদুরি বইকি। [ঈষৎ হাসিয়া] আজ তা হ'লে তো মুশকিল হ'ল, রূপটা চোখে প'ড়ে গেল! করকর করছে নাকি? জল এনে দোব একটু, ধুয়ে ফেলবে?

বড়বাবু। [হাসিয়া] সব জিনিস কি আর জল দিয়ে ধোওয়া যায়?

বড় বউ। ও, ভুলে গেছলাম। নির্জলা জিনিস নিয়েই যে তোমার কারবার।

বড়বাবু স্মিতমুখে কিছুক্ষণ বড় বউয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

বড়বাবু। তোমার এ কথায় আমার চ'টে যাওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই চটতে

পারছি না তো !

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। চাকরেরা যেখানে জটলা করিতেছিল, সেখানকার বাঁশীর আওয়াজটা সহসা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তু—

বড় বউ। যাই এবার আমি।

বড়বাবু। জামাইয়ের তাঁবুতে যাচ্ছ কেন ?

বড় বউ। যদি নিয়ে যায় আমাকে, আমিও গিয়ে মাচাতে বসব। হীরেন শুনছি যাবে না, সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে রোদ্দুরে এসে তার শরীরটা খারাপ হয়েছে। তার মাচাটা খালি আছে, তার বন্দুকটাও পাব।

বড়বাবু। [সবিস্ময়ে] তুমি বন্দুক চালাতে পার নাকি ?

বড় বউ। পারি একটু একটু, অন্তত পারতাম এককালে। ছেলেবেলায় দাদাদের সঙ্গে শিকারে গেছি অনেকবার, তখন আমার লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল [মুচকি হাসিয়া] উড়ন্ত পাখিও মারতে পারতাম।

বড়বাবু। শুনি নি তো কখনও এ কথা। [একটু থামিয়া] প্রমাণও পাই নি।

বড় বউ। [বিস্ময়ের ভান করিয়া] এ বাড়িতে তার প্রমাণ দোব কি ক'রে ? লাউ-কুমড়ো-শশা-শিমের জন্যে তো বন্দুকের দরকার নেই !

বড়বাবু ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন, এ কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ঈষৎ-বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে ব্যঙ্গ, বিস্ময়, কৌতুক, মূর্ত হইয়া উঠিল

বড়বাবু। ও, এ বাড়িতে টিপ করবার মত আমিষ কোন কিছু পড়ে নি বুঝি তোমার চোখে ? ভারি দুঃখের বিষয় তো !

বড় বউ। [গম্ভীরভাবে] শুধু চোখে পড়লে কি হবে, রেন্‌জের মধ্যেও পড়া চাই।

বড়বাবু। বড় বড় শিকারীদের শুনেছি বন্দুকের রেন্‌জ্‌ও বড়। বাঘ সিংহ মারতে হ'লে পাখি-মারা বন্দুকে চলে না তাদের।

বড় বউ। আমার বাঘ সিংহ মারতে ইচ্ছে করে না কোন কালে, পুষতে ইচ্ছে করে।

বড়বাবু। পুষলেই পার, সে আর বিচিত্র কি ?

বড় বউ। পাই কোথায় ?

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। আবার বাঁশীর আওয়াজটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তু—। বড় বউ আর এক খিলি পান ও আর একটু জরদা মুখে দিলেন

বড় বউ। এবার যাই আমি।

বড়বাবু। এখুনি বললে, বাঘ মারতে ইচ্ছে করে না তোমার, অথচ রাইফেল নিয়ে মাচানে বসতে যাচ্ছ, ব্যাপার কি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বড় বউ। নিজের হাতে বাঘ মারতে প্রবৃত্তি নেই, বন্দুকটা নিচ্ছি আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু বাঘ-শিকার দেখবার একটা কৌতূহল আছে। বলিষ্ঠ হিংস্র জানোয়ারটা গুলি খেয়ে কেমন শেষ আর্তনাদটা ক'রে ওঠে, সেইটে শোনবার লোভ আছে। আর কিছু নয়।

বড়বাবু নীরবে কিছুক্ষণ বড় বউকে নিরীক্ষণ করিলেন

বড়বাবু। তোমার যদি ছেলেমেয়ে না হ'ত, তা হ'লে তোমার নারীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করতাম।

বড় বউ। ঝান্সির রাণী, রিজিয়া, এলিজাবেথ, ক্লিওপেট্রা—এদের কি তুমি নারী ব'লে মনে কর না?

বড়বাবু কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে নীলমণি গলাখাঁকারি দিল। বড় বউ পর্দা সরাইয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন। নীলমণি একটি কাঠের ট্রেতে এক বোতল শ্যাম্পেন, কয়েকটি ছোট কাচের গ্লাস প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিল এবং ট্রেটি তেপায়ার উপর রাখিয়া বড়বাবুর মুখের পানে চাহিল

বড়বাবু। থাক্, এখন দরকার নেই।

নীলমণি নীরবে বাহিরে চলিয়া গেল। বড় বউ পর্দা সরাইয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন

মাচানে ব'সে শিকার করতে যাচ্ছ, অথচ নীলমণিকে দেখে লজ্জা!

বড় বউ। অনাবশ্যকভাবে আমি কখনও আত্মপ্রকাশ করি না কারও কাছে।

অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে উষা আসিয়া প্রবেশ করিল

উষা। বাবা, নীলুকাকা কোথায়?

বড়বাবু। একটু আগে তো এসেছিল এখানে। কেন?

উষা। ওই বটগাছটায় একটা দোলনা টাঙিয়ে দেবে।

বড়বাবু। দোলনা এখানে পাবে কোথা সে?

উষা। হাতীর হাওদা একটা টাঙিয়ে দিলেই তো হবে।

বড়বাবু। [হাসিয়া] বেশ বুদ্ধি বার করেছিস তো!

বড় বউ। স্থরেন কি করছে?

উষা। জানি না।

বড় বউ। শিকারে যাবি না তুই?

উষা। না।

বড় বউ। চল্ না, একসঙ্গে সবাই গিয়ে একটা মাচায় বসা যাক। মীনা কোথা?

উষা। কি জানি, নদীর ধারে, না, কোথায় বেড়াচ্ছে। আমি শিকারে যাব না। ওতে আর মজা কি? সারারাত মাচায় মুখটি বুজে চুপটি ক'রে ব'সে থাকা। তার চেয়ে নীলুকাকাকে ব'লে ওই বটগাছটায় একটা দোলনা টাঙাই গিয়ে। বেশ মজা ক'রে দোলা যাবে। নীলুকাকা কোথা?

বড়বাবু। এই বাইরেই কোথাও আছে, দেখ না।

প্রায় ছুটিয়া উষা বাহির হইয়া গেল

বড়বাবু। [হাসিয়া] উষা উষাই র'য়ে গেল দেখছি, সকাল আর হ'ল না।

বড় বউ। আমিও যাই তা হ'লে।

বড়বাবু। যাও।

বড় বউ। আমাকে বাঘের মুখে পাঠিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করছ না তো?

বড়বাবু। [হাসিয়া] ইতস্তত ক'রে তোমার গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে নেই আমার।

বড় বউ। তুমি কি বলতে চাও, আজীবন তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমি চলেছি?

বড়বাবু। তাই বা বলি কি ক'রে! অন্তত আজকের রাত্রে সে কথা বলা চলে না।

বড় বউ। মানে?

বড়বাবু। মানে, তোমার চকককে কাপড় আর ঝকঝকে গয়নার বোঝাগুলো আজ আমারই পছন্দ অনুসারে সরিয়ে রেখেছ—এই ভেবে চিত্ত আমার খানিকটা বিনোদিত হচ্ছে। ধারণাটা যদি ভুলও হয়, ভেঙে দিয়ো না সেটা।

বড় বউ। চকচকে কাপড় আর ঝকঝকে গয়না যে তুমি পছন্দ কর না, তা তো বল নি কোনদিন মুখ ফুটে।

বড়বাবু। মুখ ফুটে যেখানে বলতে হয়, সেখানে না বলাই ভাল। তা ছাড়া সত্যিকারের আভিজাত্য যার আছে, সে মুখ ফুটে কখনও কিছু চায় না। [কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন] কিন্তু আজ জ্যোৎস্না মনোহারিণী, তোমাকেও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, অভিজাত্যের আগলটা তাই একটু আলগা হয়ে গেল হঠাৎ।

বড় বউ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এইবার ক্যাম্প-চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন

বসলে যে ?

বড় বউ নির্নিমেষনেত্রে বড়বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না

বসলে যে, যাবে না ?

বড় বউ। [গাঢ় স্বরে] না। [একটু পরে] চল, আমরাও উষার মত একটা দোলনা টাঙিয়ে দুলি গিয়ে।

বড়বাবু। [হাসিয়া] সে আর হয় না বড় বউ। অপরাহ্ন হাজার চেষ্টা করলেও আর উষা হতে পারে না।

একটু চুপ করিয়া রহিলেন

কিন্তু অপরাহ্নেরও একটি সৌন্দর্য আছে। আমাদের স্থান এখন ভিড়ের মধ্যে নয়, নিভৃতে। একান্তে ব'সে রোমন্থন করাও কি কম বিলাস ? এখানে বসতে যদি চাও, চেয়ারটা আর একটু টেনে আন, আলোটা নিবিয়ে দাও।

বড় বউ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর আলোটা নিবাইয়া দিলেন। একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া উভয়ের কোলের উপর পড়িল। দুইজনে নীরবে পাশাপাশি বসিয়া রহিলেন।

দূরে বাঁশী বাজিতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলমিপুর মাঠের একটি অংশ। এই স্থানটি তাঁবুগুলি হইতে বেশ একটু দূরে, এখান হইতে ময়না নদী দেখা যায় না। যতদূর দেখা যায়, ধূ-ধূ করিতেছে মাঠ। কেবল খানিকটা দূরে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত বিরাট একটা বটগাছ অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই কাছে হাতী তিনটাও বাঁধা আছে। হাতীগুলি বটগাছের ডাল ভাঙিয়া ভাঙিয়া খাইতেছে, ডাল ভাঙার মট মট শব্দ পাওয়া যাইতেছে। জ্যোৎস্নালোকে বিরাটকায় দাঁতাল হাতীটার প্রকাণ্ড দাঁত দুইটা অদ্ভুদ দেখাইতেছে

এই অংশে একটি সুপরিসর শতরঞ্জি বিছানো., কয়েকখানা টিনের চেয়ারও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একটা চেয়ারে বসিয়া নীলু দত্ত তামাক খাইতেছেন। সম্মুখের একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর তিনি একটা পা তুলিয়া দিয়াছেন। নিকটেই অপর একটি চেয়ারে স্থূলকায় তিনু চাটুজ্জেও বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তেও হুঁকা। গোলগাল মুখমণ্ডল চিন্তাকুল। বাম জানুর উপর দক্ষিণ পদটি তুলিয়া দিয়া পায়ের পাতাটি তিনি ঘন ঘন নাড়িতেছেন। সুন্দর হাওয়া বহিতেছে, চতুর্দিকে জ্যোৎস্নাবিষ্ট

তিনু। দাও হে এবার কলকেটা।

নীলু। দাঁড়াও হে বাপু, সমস্ত দিনের মধ্যে কি আর তামাক খেতে পেয়েছি, না, পা মুড়ে বসতে পেয়েছি! এই তো একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি কেবল।

গোটা কয়েক টান দিলেন

তাও আবার উষা ঠাকরুণ দোলনা টাঙাবার এক ফরমাশ দিয়েছেন।

তিনু। দোলনা? দোলনা এনেছ নাকি?

নীলু। হাতীর হাওদা একটা টাঙিয়ে দিতে বলছে বটগাছে। বুদ্ধিও জোটে এদের মাথায়!

তিনু। [আঙুল দিয়া দেখাইয়া] ওই বটগাছটায়? ওখানে তো হাতী বাঁধা রয়েছে দেখছি।

নীলু। আরে না, না, ওখানে নয়, ওদিক পানে আর একটা ছোটগোছের বটগাছ আছে। কিন্তু কাকে বলি এখন বল তো! [কয়েকটা টান দিয়া] চাকর-বাকরগুলো সব মাদল নিয়ে মেতেছে, গোহম্না ছুঁড়ীটা নাচছে। এখন কাউকে বললে কি নড়বে সেখান থেকে কেউ!

বেশ জোরে আরও গোটা দুই টান দিলেন

ভিকুটা বোকাসোকা-গোছের আছে, দেখি, যদি সে ব্যাটাকে রাজী করাতে পারি। এই নাও।

তিনুকে কলিকাটা দিলেন এবং পা সরাইয়া হুঁকাটা পাথরের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিলেন

তিনু। [কলিকাটি হুঁকায় বসাইতে বসাইতে] আজকাল ছোট-লোকেরাই সুখেতে আছে ভাই, বোঝেছ? ভদ্দরলোকদের আর ভদ্রস্থ নেই।

যেন অত্যন্ত মূল্যবান একটি উক্তি করিয়াছেন—এইরূপ মুখভাব করিয়া তিনি হুঁকার একটি টান দিলেন

নীলু। ভদ্দরলোকই বা কটা আছে আজকাল? সব শালাই চামার। [হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া] ওই লাহিড়ীটাকে তুমি ভদ্দরলোক বল? তুই ব্যাটা যে বড়বাবুর সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে শ্যাম্পেন খেতে চাস, এর আগে শ্যাম্পেন দেখেছিলি কখনও বাপের জন্মে?

তিনুর হুঁকার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনু চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন

তিনু। অ্যাঁ, বল কি, শ্যম্পেন খেতে চাইছে?

নীলু। চেয়েছে নিশ্চয়ই, তা না হ'লে বড়বাবু দিতে বললেন কেন? কেউ কিছু চাইলে বড়বাবু 'না' বলতে পারেন না—এ কথা তো সবাই জানে। তাই ব'লে সব জিনিস চাইতে হবে?

তিনু পুনরায় হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন

নিজেরও তো আক্কেল থাকা উচিত একটা! তোর পেটে বোমা মারলে পান্তাভাত পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি বেরিয়ে পড়বে, তুই চাইলি শ্যাম্পেন খেতে!

তিনু চক্ষু বুজিয়া তন্ময় হইয়া তামাক টানিতেছিলেন, সংক্ষেপে উত্তর দিলেন

তিনু। বোঝ।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ

নীলু। আমাদের বড়বাবুর যে রকম দরাজ হাত, ছোটবাবুর হাতে জমিদারি না পড়লে উনি সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেন। অমন কাছাখোলা হ'লে জমিদারি থাকে!

তিনু চক্ষু খুলিলেন

তিনু। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করেছ ভাই। আমি এসে থেকে তক্কে তক্কে ঘুরছি, কিন্তু ছোটবাবুর নাগাল তো পাচ্ছি না। বড়বাবুকেই ধরব নাকি শেষ অবধি গিয়ে?

নীলু। সে পথও বন্ধ। বড়বাবু আজ রাত্রে কারও সঙ্গে দেখা করবেন না—হুকুম দিয়েছেন। তাঁর তাঁবুর সামনে নেহাল সিং কিরিচ-বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তিনু। বড় ফ্যাসাদে পড়লাম তো তা হ'লে হে। শেষ পর্যন্ত তা হ'লে কি লছমনিয়াটাকেই তোয়াজ করতে হবে নাকি? সে ছুঁড়ীরও তো কোন পাত্তা পেলাম না। এই একটু আগেই দেখলাম, সে বড়বাবুর তাঁবু থেকে বেরিয়ে জামাইবাবুর তাঁবুর দিকে গেল, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ছোটবাবুর তাঁবুর কাছে গিয়ে কি একটু ঘুজঘুজ করলে, তারপর এল এই দিক পানে। আমিও পিছু পিছু এলাম। কি করি, কাজের নাম বাবাঠাকুর! ভাবলাম, আড়ালে একটু আভাস দিয়ে রাখি কথাটার। কিন্তু এখানে এসে ফট ক'রে কোথায় যে গা-ঢাকা দিলে, ধরতে পারলাম না। ওই তো এক ফোঁটা ছেলেমানুষ মেয়ে, দিব্যি চোখে ধুলো দিয়ে স'রে পড়ল!

হুঁকায় টান দিলেন। ধোঁয়া বাহির হইল না। কলিকায় ফুঁ দিয়া পুনরায় টানিতে লাগিলেন

নীলু। [বিজ্ঞভাবে হাসিয়া] ছেলেমানুষ হ'লে কি হয় ভায়া, মেয়েমানুষ তো! সংস্কৃত শোলোকে আছে—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা। এই ধর না, এতকাল ধ'রে এই এস্টেটে চাকরি ক'রে চুল পাকিয়ে যে ধারণাটি পাকা-পোক্ত ক'রে রেখেছিলুম, আজ এখানে এসে সেটি বিসর্জন দিতে হ'ল। দেখলাম, সবই ভুয়ো।

তিনু। কি রকম?

নীলু। এতকাল ধারণা ছিল, বড়বাবু বড় বউকে লুকিয়ে মদ খান। বড় বউ

কড়া-মেজাজের লোক, ওসব পছন্দ করেন না। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, বড়বাবু বড় বউয়ের সামনেই মদ নিয়ে যেতে বললেন, বড় বউ ছাড়া আর সকলকে, এমন কি নীলমণিকে পর্যন্ত, তাঁবু থেকে বার ক'রে দিলেন এবং হুকুম দিলেন তাঁর তাঁবুর সামনে নেহাল সিংকে পাহারা দিতে, যেন আর কেউ না যায় সেখানে। অথচ বড়বাবু যাতে একটু গোপনে মদ খেতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে আমাকে কি কম নাকালটা হতে হয়েছে!

তিনু। [হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া] এর মানে কি?

নীলু। মানে আবার কি, বড় বউয়ের লীলা! ওই যে বললাম—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা। মেজবাবু-ছোটবাবুর সম্বন্ধেও ঠিক একই ধরনের ঘা খেতে হ'ল আমাকে।

তিনু। কি রকম?

হুঁকাতে গোটা দুই টান দিলেন, ধোঁয়া বাহির হইল না

নীলু। মেজবাবু রোজ সন্ধ্যেবেলা এক গেলাস ক'রে সিদ্ধি খান। বিশ্বম্ভরটা চিরকাল বৈঠকখানায় তৈরি করে; মেজবাবুও চিরকাল বৈঠকখানায় ব'সেই খান। আমার ধারণা ছিল, বুঝি মেজ মাকে লুকিয়েই খান। এখানেও সেই রকম ব্যবস্থাই রেখেছিলাম আমি। ওমা! এখানে এসে মেজ মা-ই সিদ্ধির সরঞ্জাম চেয়ে পাঠালেন। কাদম্বিনী এসে বললে, মেজ মা শিল নোড়া সিদ্ধি বাদাম পেস্তা গোলাপ-জল—সব চাইছেন, নিজের হাতেই আজ সিদ্ধি তৈরি করবেন তিনি। বোঝ একবারে কাণ্ডটা, নিজের হাতেই তৈরি ক'রে দেবেন!

তিনু ধোঁয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ দূরে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল

তিনু। কে যেন আসছে হে এদিকে!

নিলুও চাহিয়া দেখিলেন

নীলু। তালুকদার বোধ হয়।

তিনু। আর ছোটবাবু সম্বন্ধে কি জানলে?

নীলু। ছোটবাবুর তাঁবুর সামনাসামনি চাকরানীদের তাঁবুটা দিয়েছিলাম, কারণ আমার জানা ছিল—

তিনু। হ্যাঁ, সে তো জানি।

নীলু। ছোটবাবু এসেই আমাকে প্রকাণ্ড এক ধমক—আমার তাঁবুর সামনে চাকরানীদের তাঁবু কেন? ওদের অন্য তাঁবুতে দাও, ঠাকুরদা ঠানদি ওখানে

থাকবেন, আর ঠিক পাশের তাঁবুটায় থাকবেন বাদল ডাক্তার। [চোখ বড় বড় করিয়া] যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

তিনু। আসল ব্যাপারটা তা হ'লে কি? এ যে দেখি, সবই গোলমাল ক'রে দিলে তুমি!

খুব জোরে টান দিয়াও যখন আর ধোঁয়া বাহির করিতে পারিলেন না, তখন বিরক্ত মুখে হুঁকাটি নামাইয়া পাথরে ঠেসাইয়া রাখিলেন

নীলু। খুব সম্ভবত কিছু খিটির-মিটির হয়েছে ছুঁড়ীটার সঙ্গে। মেয়েমানুষের ব্যাপার—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা!

তিনু। ওর সঙ্গে খিটির-মিটির হ'লে আমি যে অকূল পাথারে পড়লাম হে! তা হ'লে—

এমন সময় উদ্‌ভ্রান্ত তালুকদার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে গাদা-বন্দুক, পরনে শিকারীর বেশ

নীলু। তুমি এখনও যাও নি যে?

তালুকদার ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া চতুর্দিকটা একবার দেখিয়া লইলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন

তালুকদার। না, যাই নি এখনও, মানে—[সহসা] আচ্ছা, লছমনিয়াটা এসেছে এদিকে, দেখেছ?

তিনু। তোমারও খাজনা বাকি নাকি?

তালুকদার। খাজনা বাকি মানে?

নীলু। কেন, লছমনিয়াকে কি দরকার তোমার?

তালুকদার। মানে, গরুর গাড়িতে আসবার সময় আমার বন্দুকের খোলটা প'ড়ে গেছল, সে নাকি কুড়িয়ে রেখেছে! একবার খোঁজ করলে হ'ত।

নীলু। সে কাল সকালে খোঁজ ক'রো। এখন বন্দুকের খোলের কি দরকার?

তালুকদার। না, মানে—

তালুকদার আবার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন

নীলু। শিকারে যেতে চাও তো এখুনি বেরিয়ে পড়।

তালুকদার। তাই যাই। কিন্তু—, আচ্ছা থাক্, পরে হবে।

ইতস্তত করিয়া অবশেষে তিনি চলিয়া গেলেন

তিনু। জামাই কি শিকারে বেরিয়ে গেছেন?

নীলু। বন্দুক কাঁধে ক'রে তো বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন ভগবানই জানেন।

তিনু। আর কে কে গেল?

নীলু। নিতাই আর হরু মণ্ডল আর বিলটা গেছে। তালুকদারও যাচ্ছে।

তিনু। বিলটা আবার কে?

নীলু। ও আমাদের এখানকারই একজন প্রজা, শিকারে ভারি ঝোঁক। ওকে একটা বন্দুক দিয়েছি, দেবদারুগাছে গিয়ে চড়েছে সে। [হাসিলেন] কিন্তু যেখানে 'কিল' হয়েছে, সেখানে বসে নি। ময়না নদীর চরের দিকে যে দেবদারুগাছটা আছে, সেইখানে বসেছে। ও বলছে, বাঘ আসবার ওইটেই রাস্তা!

তিনু। নিতাই বন্দুক পেলে কোথা? ওর নিজের তো এক মুখ ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। মুখেই রাজা-উজির বাঘ-গণ্ডার মারছে। কিন্তু সত্যিকার বাঘ তো আর মুখ দিয়ে মারা যাবে না!

নীলু। এস্টেটেরই বন্দুক দিলাম ওকেও একটা। অত উৎসাহ ক'রে এসেছে বেচারী। তবে নিতাইই বল, তালুকদারই বল, আর জামাইবাবুই বল, বাঘ মারতে পারবেন না কেউ। যদি কেউ পারে, ওই হরু মণ্ডলই পারবে। মাচান বন্দুক কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না সে। নিজের চকচকে বর্শাটি নিয়ে সোজা গিয়ে শিমুলগাছে উঠে বসেছে। বাঘও আবার একটা নয় শুনছি, এখানকার সাঁওতালগুলো বলছিল, এক জোড়া আছে। একটা বাঘ আর একটা বাঘিনী।

তিনু। ওরে বাবা! এ অঞ্চলে এসে পড়বে না তো হে একটা ছিটকে-মিটকে!

নীলু। [হাসিয়া] তোমার আর ভয় কি, সাতটা বাঘেও তোমার কিছু করতে পারবে না।

তিনু। কেন, আমি মোটা ব'লে বলছ? [একটু চুপ করিয়া রহিলেন] ছুটতে পার আমার সঙ্গে তুমি? এই কলমিপুরের মাঠটা আমি এক দমে এক ছুটে পার হয়ে যেতে পারি, তা জান?

নালু দত্ত কিছু বলিলেন না, স্মিত মুখে নিজের মাথার টাকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দূরে শোনা গেল, কুঞ্জলালের দল গান গাহিতে গাহিতে এই দিকে আসিতেছে।

তাহাদের গান ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল—

"জ্যোৎস্নাহসিত নীল গগনে বিহগ যখন গাহে
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে
তখন স্মরণে বাজে কাহার মৃদুল মধুর বাণী
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।"

নীলু। পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ।

তিনু। তা বটে।

কুঞ্জলালের দল নিকটবর্তী হইতেই তিনু চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িলেন এবং কাপড়ের কষিটা গুঁজিলেন

তিনু। আমি চললাম ভাই। ওসব ছেলেছোকরাদের কাজ থেকে স'রে থাকাই ভাল। নিজের মান নিজের কাছে।

নীলু। হ্যাঁ চল, আমিও যাই। আমাকে আবার দোলনাটা টাঙাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্যাসাদ কি এক রকম!

উভয়ে চলিয়া গেলেন। কুঞ্জলালের দল গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া পড়িল, এবং গান থামাইয়া কেহ চেয়ারে কেহ শতরঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। বঙ্কু শতরঞ্চির উপরই একটু দূরে গিয়া বসিল

হাবুল। আর গান নয় মাইরি। প্রচুর চেঁচানো হয়েছে।

বীরেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করলি?

কুঞ্জ। কি?

বীরেন। আমরা আসতেই তিনু চাটুজ্জে আর নীলু দত্ত উঠে গেল।

কুঞ্জ। ভারি ব'য়ে গেল আমাদের।

বীরেন। তা তো বটেই, সে কথা বলছি না। কিন্তু এই খোলা মাঠে এসেও সবাই মিলে-মিশে যে একটু ফূর্তি করবে, সে মেণ্টালিটি কারও নয়। এখানে সবাই নিজের নিজের গণ্ডি আঁকড়ে প'ড়ে আছেন। আমাদের ইচ্ছে করলে ডাক্তারবাবুটিও তাঁবুতে ঢুকেছেন।

পাঁচু। ইচ্ছে করলে আমরাও একটা তাঁবু পেতে পারতাম। চাকররা যে তাঁবুটা নিয়েছে, ছোটবাবুকে বললে, ওটা ঠিক আমাদেরই দিয়ে দিতেন!

বীরেন। ও-রকম তাঁবু পাওয়ার চেয়ে খোলা মাঠে প'ড়ে থাকা ঢের ভাল।

শতরঞ্চির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল

কুঞ্জ। নিশ্চয়।

হাবুল। আচ্ছা বীরেন, সূর্যের আলো গায়ে লাগলে সেদিন তুই বলছিলি কি যেন—

বীরেন। আলট্রা-ভায়োলেট রে।

হাবুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলট্রা-ভায়োলেট রে নাকি শরীরের খুব উপকার করে? চাঁদের আলোতে সে রকম কিছু নেই? যদি থাকে তো বল্, গেঞ্জিটা খুলে বসি।

বীরেন। তুই আলট্রা-ইডিয়ট, তাই এ কথা জিজ্ঞেস করলি। চাঁদের কি

নিজের কোন আলো আছে ?

হাবুল। ও, নেই নাকি ? থাক্, তা হ'লে গেঞ্জিটা আর খুলব না।

পাঁচু। চাঁদের নিজের আলো থাক্, আর নাই থাক্, ফিনিক ফুটিয়ে ছেড়েছে কিন্তু মাইরি।

হাবুল। কুঞ্জ, তুই তোর বাঁশীটা বার ক'রে সেই ভীমপলশ্রীখানা আলাপ কর্, বেড়ে জমবে এখন।

পাঁচু। হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, এখানেই সব জমায়েত হয়ে বসা যাক মাইরি, অন্য কোথাও আমাদের ঠিক খাপ খাচ্ছে না। চাকর-বাকরদের ভেতরও গিয়ে বসা যায় না, বাবুদের তাঁবুতেও ঢোকা যায় না, এইখানেই ভাল ? জায়গাটিও বেশ নিরিবিলি আছে।

হাবুল। বীরেন, রাজী হ'ল না, কিন্তু চাকরবাকরদের মধ্যে বসলে সময়টা কাটত ভাল। গোহুম্‌নাটা যা নাচছে—দারুণ।

বীরেন। বড় ভাল্‌গার টেস্ট হয়ে গেছে তোর হেব্‌লো।

হাবুল দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল

পাঁচু। দেখ্‌ দেখ্‌, বঙ্কা কেমন মুগ্ধ হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে !

কুঞ্জ। বেচারীর বউয়ের জন্যে মন-কেমন করছে বোধ হয়।

পাচু। [আবৃত্তির সুরে]

হে বঙ্কু, আকাশে চেয়ে ভাবিতেছ কি তাকে ?
পায়ে যার লাল আলতা, নোলক দোলে নাকে ?

বঙ্কু পাঁচুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল

হাবুল। এই পাঁচা, বিরক্ত করছিস কেন ওকে ? না না বঙ্কা,, তুই ভাব্‌। কুঞ্জ, তুই শুরু কর্।

পাঁচু মুখে কাপড় চাপা দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতে লাগিল। কুঞ্জ বাঁশীতে ফুঁ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীমপলশ্রী জমিয়া উঠিল, সকলেই তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল

হাবুল। [সহসা] ওটা কি বল্ তো—দেখ্‌ দেখ্‌।

পাঁচু। কই ?

হাবুল। এই যে রে, বটগাছের কাছটায়—ওই আবার ঢুকে পড়ল।

বীরেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি বল্ দেখি ওটা ?

কুঞ্জ মুখ হইতে বাঁশী নামাইল

কুঞ্জ। বটগাছটার ভেতর ঢুকে পড়ল, বলিস কি ?

হাবুল। মাইরি বলছি, কি যেন একটা সাদাগোছের।

কুঞ্জ। ভুত-টুত নয় তো? এই বঙ্কা, এদিকে স'রে এসে ব'স্। মাত্র সেদিন বিয়ে করেছিস তুই, তোর কিছু হ'লে মনস্তাপের সীমা থাকবে না আমাদের। এদিকে স'রে আয়।

হাবুল। ঠাট্টা নয় মাইরি, সত্যি আমি দেখলাম, কি যেন একটা ঢুকে পড়ল।

বীরেন। আমিও দেখেছি।

পাঁচু। আমি দেখতে পেলাম না মাইরি, গিয়ে দেখে আসব?

হাবুল [ভ্যাঙাইয়া] গিয়ে দেখে আসব! হুজুকে কোথাকার!

কুঞ্জ। যাক না, দেখে আসুক না, ব্যাপারটা কি।

পাঁচু। যাই। হাবুল, তুই সুদ্ধু চ ভাই।

হাবুল। আমাকে ঘাঁটিও না ব'লে দিচ্ছি।

বীরেন। তুই একাই যা না। তুই তো সব পারিস।

পাঁচু উঠিয়া পড়িল এবং যাইবার পথে বঙ্কুর মাথায় একটা ঠোকর দিয়া বটগাছটার দিকে আগাইয়া গেল। সকলে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। একটু পরেই পাঁচুকে আর দেখা গেল না, গাছটার নিকটে গিয়া অন্ধকারে সে অদৃশ্য হইয়া গেল

বীরেন। অদ্ভুত জ্যোৎস্না আজ!

কুঞ্জ। চমৎকার!

হাবুল। দেখছিস না, বঙ্কা পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে! বঙ্কুকে ঘায়েল করা একটু আধটু জ্যোৎস্নার কর্ম নয়।

বীরেন। কুঞ্জ, তুই বাজা, থামলি কেন?

কুঞ্জ। কি বাজাব, ফের ভীমপলশ্রী?

বীরেন। না। "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" বাজা।

কুঞ্জ "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" বাজাইতে শুরু করিল। একটু পরে এমন জমিয়া উঠিল যে, হাবুল মুখ সুচালো করিয়া শিস দিতে লাগিল, বঙ্কুর ঈষৎ-কুঞ্চিত ভ্রূ ও মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সেও গানটা মনে মনে গাহিতেছে। বীরেন গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে উন্মনাভাবে সুদূরপ্রসারী মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক স্বপ্নাতুর। পাঁচুর কথা সকলে যখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, এমন সময় দূরে পাঁচুকে দেখা গেল, সে বেশ দ্রুতপদেই আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে আসিয়া পড়িল

পাঁচু। ওরে, ও-গানটা নয়। "এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে ব'স" বাজা।

কুঞ্জ বাঁশী থামাইল

কুঞ্জ। কিছু দেখতে পেলি?

হাবুল। কি দেখলি?

পাঁচু। [হাবুলের প্রতি] এখন 'কি দেখলি', বলব কেন তোকে? তখন ডাকলাম, আসা হ'ল না।

হাবুল। দেখ্ পাঁচা, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

পাঁচু হঠাৎ বন্ধুকে আবেগভরে দুই হাতে জড়াইয়া শতরঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল

পাঁচু। উঃ, মাইরি মাইরি, বন্ধু রে, তুই যদি দেখতিস!

কুঞ্জ। কি দেখলি, বল্ না?

পাঁচু। বটগাছের ঝুরির ভেতর ফুলঝুরি।

কুঞ্জ। ভূত নয়?

পাঁচু। ভিকু আর লছমনিয়া।

হাবুল। বলিস কি?

পাঁচু। মাইরি বলছি।

এমন সময় ঝরঝরে বাইক করিয়া নিলু দত্ত হঠাৎ আসিয়া হাজির হইলেন

নীলু। ভিকু চাকরটা এদিকে এসেছে? দেখেছ তোমরা কেউ?

পাঁচু। আজ্ঞে না।

নীলু। কোথা গেল ব্যাটা তা হ'লে?

কুঞ্জ। এই খানিক আগে সে তো ছোটবাবুর তাঁবুর দিকে গেল দেখলাম।

নীলু। আরে, সেইখান থেকেই তো অসছি আমি।

কুঞ্জ। আমি কিন্তু দেখলাম, সে ওই দিকেই গেল।

নীলু। ঠিক দেখেছ তুমি?

কুঞ্জ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নীলু। পাগল ক'রে মারলে ব্যাটারা আমাকে! এই দিগন্ত মাঠে কে যে কোথায় স'রে পড়েছে, ধরতেই পারছি না কাউকে।

নীলু দত্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাইক করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি একটু দূরে গেলে সকলে সমস্বরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

তৃতীয় দৃশ্য

মেজবাবুর তাঁবু। এ তাঁবুটিও বড়বাবুর তাঁবুর মত দুই-কক্ষবিশিষ্ট। ইহার উন্মুক্ত দ্বার শুধু জ্যোৎস্নালোকিত ময়না-নদীটাই নয়, নদীর উপর পাল-তোলা ছোট একখানি নৌকাও দেখা যাইতেছে। চাকরেরা যেখানে জটলা করিতেছে, সে অংশটা অপেক্ষাকৃত নিকটতর হইলেও দেখা যাইতেছে না। কারণ সেদিকের বাতায়নগুলি সমস্ত বন্ধ। তথাপি নাচের, মাদলের এবং বাঁশীর

আওয়াজ বেশ শোনা যাইতেছে। শ্রোতাদের কলরবগুঞ্জনও কিছু কিছু ভাসিয়া আসিতেছে। তাঁবুর ভিতর মেজ মা একটি ছোট টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া একটি শ্বেতপাথরের গ্লাসে সিদ্ধি ঢালিতেছেন। টেবিলে একটি চকচকে পানের বাটা, একটি প্লেটে অনেকগুলি সন্দেশ এবং একটি গ্লাস-ঢাকা ছোট কুঁজা রহিয়াছে। অপর কক্ষের দ্বারে একটি পর্দা টাঙানো। পিছনের একটা দ্বার দিয়া তোয়ালেতে মাথা মুছিতে মুছিতে বড়বাবু প্রবেশ করিলেন। এইমাত্র তিনি স্নান সমাপন করিয়াছেন

মেজবাবু। কই, আমার গেঞ্জিটা দাও।

মেজ মা। [চেয়ারের হাতল হইতে গেঞ্জিটা লইয়া দিলেন] এই যে, নাও। দাঁড়াও দাঁড়াও, প'রো না এখন, পিঠময় যে জল, মুছিয়ে দিই।

মেজবাবুর হাত হইতে তোয়ালেটা লইয়া পিঠ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন এবং মেজবাবু পিঠ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

নাও এইবার।

মেজবাবু গেঞ্জিটা পরিলেন ও একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন

মেজবাবু। আঃ, চান করে বাঁচা-গেল। কি প্রচণ্ড গরমই ছিল আজ!

মেজ মা একটি অ্যাটাচি কেস হইতে চিরুনি বাহির করিলেন ও মেজবাবুর চিবুক ধরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন। মেজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন

মেজ মা। গরম ব'লে গরম, সমস্ত পৃথিবী যেন পুড়ে গেছে আজ! তার ওপর তুমি এসেছ হাতীতে!

মেজবাবু কোন উত্তর দিলেন না। মেজ মা পরিপাটীরূপে মাথাটি আঁচড়াইয়া দিয়া টেবিলের নিকটে গেলেন ও সিদ্ধির গ্লাসটি আনিয়া হাতে দিলেন

খেয়ে দেখ দিকি, তোমার বিশ্বম্ভরের মত পেরেছি কি না!

মেজবাবু। [এক চুমুক পান করিয়া] চমৎকার! ওর চেয়ে ঢের ভাল হয়েছে।

মেজ মা। [সহাস্যে] আর যাই কর, বুড়ো বয়েসে মিছে কথাটা আর ব'লো না।

মেজবাবু। না না, সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

ঢক ঢক করিয়া সমস্তটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন

মেজ মা। [তোয়ালেটা আগাইয়া দিয়া] মুখটা পোঁছ।

মেজবাবু মুখটা মুছিলেন, গোঁফজোড়াতে তা দিলেন এবং মেজ মার মুখপানে চাহিয়া হাসিলেন

নাও, এবার এগুলো খেয়ে ফেল।

সন্দেশের প্লেটটা আগাইয়া দিলেন

মেজবাবু। অতগুলো পারবো না। পাগল নাকি!

মেজ মা। খেতে কত রাত হবে তার ঠিক আছে! এখনও পোলাও চড়ে নি।

মেজবাবু। তা না চড়ুক, তবু অতগুলো পারব না।

মেজ মা। যা পার খাও না, কটাই বা আছে ওতে!

মেজবাবু আর প্রতিবাদ না করিয়া খাইতে শুরু করিলেন

ওরে কাদু!

পাশের ঘর হইতে পর্দা সরাইয়া কাদম্বিনী বাহির হইল

উষা, টোকন আর চাঁপাকে ডেকে নিয়ে আয়।

কাদম্বিনী চলিয়া গেল, মেজবাবু নীরবে আহার করিতে লাগিলেন, মেজ মা চুপ করিয়া রহিলেন। বাহিরের নাচের শব্দটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। গোহমনার পায়ের ঘুঙুর বাজিতেছে—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম, ঝমর ঝম। মাদল এবং বাঁশীও পুরাদমে চলিয়াছে

মেজ মা। উঃ, কি গুলতানিই করছে ওরা!

মেজবাবু স্মিতমুখে মেজ মার মুখের পানে চাহিলেন

মেজবাবু। চল, আমরাও কিছু একটা করি।

মেজ মা। কি করবে?

মেজবাবু একটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া দিয়া মেজমার মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, যেন মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগিয়াছে

মেজ মা। বলছ না যে?

মেজবাবু। চল দুজনে জমজমের পিঠে চ'ড়ে একটা চক্কর দিয়ে আসি।

মেজ মা। পাগল নাকি। আমি হাতীতে চড়তে পারব না।

মেজবাবু। হাতীতে চড়া কি আর এমন মুশকিল, সিঁড়ি দিয়ে তো হাওদায় চড়বে!

মেজ মা। না না, ছি, সে কি হয়! মা, বটঠাকুর—এঁরা সব রয়েছেন, জানতে পারলে কি বলবেন!

এইরূপ উত্তরই যে মেজবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, মুখভাবে তাহা প্রকাশ করিলেন ও আর একটি সন্দেশ মুখে ফেলিলেন। মেজ মা কুঁজা হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া মেজবাবুর নিকট রাখিলেন এবং পানের বাটা খুলিয়া পান সাজিতে লাগিলেন। বাহিরে আনন্দকলরব আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল

মেজ মা। হাতীতে যে চড়তে বলছ, মাহুতরা তো সব হুল্লোড় করছে, নিয়ে যাবে কে?

মেজবাবু। কেন! আমি। এ অঞ্চলে আমার চেয়ে ভাল মাহুত আর কেউ আছে নাকি? ভুলে গেলে সব?

মেজ মা। ভুলেছি বইকি!

তিনি সস্নেহে বিরাটকায় বলিষ্ঠদেহ মেজবাবুর দিকে হাসিমুখে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন

তোমার গোঁয়ারতুমির জন্যে কি কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আমাকে! কিন্তু এ বয়সে আর ওসব নয়।

মেজবাবু কিছু বলিলেন না, আর একটি সন্দেশ তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন

তা ছাড়া, ও পাগলা হাতীর পিঠে কে চড়বে বাপু?

মেজবাবু। পাগলা ব'লেই তো মজাটা আরও বেশী। ভাব তো একবার, বিরাট মাঠে বিরাট জ্যোৎস্নায় বিরাট জম্‌জমের পিঠে চ'ড়ে চলেছি দুজনে। তোমার সর্বদাই ভয় করছে, এই বুঝি ক্ষেপল! আমি নির্বিকার ব'সে আছি, কারণ আমি জানি—পাগলা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মেজ মা। পাগলা বুঝি আবার ঠাণ্ডা হয়?

মেজবাবু। হয় না? প্রমাণ পাও নি তুমি তার?

স্নিগ্ধ হাসিতে মেজ মার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল

মেজ মা। না, দরকার নেই। বড় ভয় করে আমার।

কাদম্বিনী আসিয়া প্রবেশ করিল

কাদম্বিনী। ওরা কেউ আসছে না মা। উষাদিদি আর হীরেনবাবু দোলনাতে দুলছেন, টোকন আর চাঁপা জগদেও পাঁড়ের কাঁধে চেপে কোথায় বেড়াতে গেল, কিছুতেই এল না।

মেজ মা। [সক্রোধে] পাঁড়েটার কি রকম আক্কেল, ওদের না খাইয়ে নিয়ে চ'লে গেল বেড়াতে! তুই আবার যা, উষাকে আর হীরেনকে ডেকে নিয়ে আয়, বল্‌গে—মেজ মা ভয়ানক রাগ করছেন।

কাদম্বিনী চলিয়া গেল

অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, না আছে লজ্জা, না আছে শরম। মা যা বলেন, তা ঠিকই। তরঙ্গিণীর ভাইটিও জুটেছে তেমনই।

মেজবাবু কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে একটির পর একটি সন্দেশ গম্ভীরভাবে আহার করিতে করিতে হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, প্লেটে আরও একটিও সন্দেশ নাই। গম্ভীর মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। প্লেটটি সরাইয়া দিয়া মেজ মার মুখের পানে চাহিলেন। প্লেট শূন্য দেখিয়া মেজ মার মুখখানিও প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

এই যে বললে, খেতে পারব না?

মেজবাবু। তোমাকে খুশী করবার জন্যে না পারি কি?

জলের গ্লাসটা তুলিয়া লইলেন। হঠাৎ বাহিরের কলরবটা বাড়িয়া উঠিল। ঘুঙুর বাঁশী এবং মাদলের শব্দ ছাপাইয়া একটা বিশ্রী গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মেজবাবু গ্লাস হাতেই উঠিয়া পড়িলেন ও জানালার পর্দাটা সরাইয়া দিলেন। দূরে জ্যোৎস্নালোকে নৃত্যপরা গোহমনাকে

দেখা গেল। এক হাত কোমরে এবং এক হাত মাথায় দিয়া নাচিতেছে। খোপার বেলফুলের মালাটা যে বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে খেয়াল নাই ; তাহার ডান দিকে ভিড়ের মধ্যে যে বিশ্বম্ভর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, সেদিকেও তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই। বিশ্বম্ভর কিন্তু খুব চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিতেছে এবং চার-পাঁচজন তাহাকে ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। মেজবাবু বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিলেন

এই বিশ্বম্ভর, এদিকে আয়।

পর্দাটা ফেলিয়া দিলেন ও এক নিশ্বাসে জলটা পান করিয়া ফেলিলেন। ওদিক দিয়া ঘুরিয়া বিশ্বম্ভর আসিয়া প্রবেশ করিল

এখানে কি করছিলি ?

বিশ্বম্ভর। গোহমনা ছুঁড়িটা হুজুর, আমাকে ভেংচে দিলে। মেরে ধুনে দোব ওকে আমি।

মেজবাবু। চুপ ক'রে ব'সে থাক্ বাইরে। সব জায়গায় গুণ্ডামি !

বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ নিরীহ ভালমানুষটির মত বাহিরের দরজার পাশে চুপ করিয়া বসিল

মেজ মা। এই নে, একটু সন্দেশ খা, কেন যে গোঁয়ারতুমি করিস !

খানিকটা সন্দেশ তাহাকে দিলেন, সে হাত পাতিয়া লইল ও কোণের দিকে মুখ ফিরাইয়া খাইতে লাগিল

মেজ মা। পর্দাটা ফেলে দিলে কেন ? তুলে দাও, দেখি ওদের নাচ। এই নাও পান।

বাটা হইতে পান বাহির করিয়া মেজবাবুকে দিলেন, মেজবাবু পানটা মুখে ফেলিয়া দিয়া পর্দাটা তুলিয়া দিলেন। গোহমনা আত্মহারা হইয়া নাচিতেছে। তাহার ঘুঙুরের ঝমর ঝম ঝমর ঝম ঝমর ঝম, মাদলের ধিতাং তিনা ধিতাং তিনা এবং বাঁশীর তুতুর তুয়া সমস্ত জ্যোৎস্নাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। মেজ মা চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মেজবাবু একটা ক্যাম্প-চেয়ার টানিয়া তাহাতে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। দ্বারপথে দেখা গেল, উষা ও হীরেন আসিতেছে, পিছনে কাদম্বিনী। হীরেন হাতের সিগারেটটায় গোটা দুই টান মারিয়া সেটা ফেলিয়া দিল। নাচ বাঁশী ও মাদলের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। একটু পরেই উষা, হীরেন, কাদম্বিনী আসিয়া প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী আসিয়াই পর্দা সরাইয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেল

উষা। মেজ মা, ডাকছ তুমি আমাদের ?

মেজ মা। [ফিরিয়া] হ্যাঁ, দয়া ক'রে খেয়ে আমাকে রেহাই দাও মা।

আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হীরেনকে দেখিয়া থামিয়া গেলেন

উষা। এখন খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

মেজ মা। না ইচ্ছে করলেও খাও, তোমার আবার কবে খেতে ইচ্ছে করে ! [হীরেনের প্রতি] তুমিও ভাই, খাও দুটো।

হীরেন। [স্মিত মুখে] দিন।

উষা। যখনই মেজ মা সন্দেশের হাঁড়ি এনেছেন তখনই জানি, না শেষ হওয়া পর্যন্ত কারও নিস্তার নেই।

মেজ মা। [সন্দেশ বাহির করিতে করিতে] বেশ বেশ, তোকে খেতে হবে না, তুই যা।

উষা। বাঃ রে, আমি খাব না বললাম বুঝি! আমি তো শুধু বললাম, খেতে ইচ্ছে করছে না।

উষা ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেজ মা তাহার পানে রোষকটাক্ষে একবার চাহিয়া এক প্লেট সন্দেশ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। হীরেনকেও এক প্লেট দিলেন। উষা গপ গপ করিয়া নিমেষে শেষ করিয়া ফেলিল এবং হীরেনকে তাড়া দিল

শিগগির খেয়ে নিন। দোলনা খালি গেলে কেউ না কেউ দখল ক'রে বসবে। ছোট মা একবার খবর পেলে হয়!

মেজ মা। কাদু!

কাদম্বিনী বাহির হইয়া আসিল

ছোটবাবুর তাঁবুতে দিয়ে আয় কিছু মিষ্টি, এই নে।

একটি প্লেটে করিয়া মিষ্টি দিলেন, কাদম্বিনী তাহা লইয়া চলিয়া গেল

হীরেন। [প্লেটটা নামাইয়া দিয়া] এ দুটো আর পারব না মেজদি, অনেক দিয়েছিলেন।

মেজ মা। সুরেন কি শিকারে বেরিয়ে গেছে?

হীরেন। এখনও ঠিক মাচানে গিয়ে ওঠে নি বোধ হয়। ওই যে, ওই নৌকোটায় বেড়াচ্ছে এরা।

নদীবক্ষে যে পাল-তোলা পানসিটা আসিতেছিল, সেইটা দেখাইয়া দিল

মেজ মা। ওরা মানে, কে কে?

হীরেন। মীনাও আছে। সুরেন তো উষাকেও নিতে চাইলে, কিন্তু উষা কিছুতেই গেল না।

উষা। নৌকোয় চুপচাপ ব'সে থাকতে ভাল লাগে বুঝি? তার চেয়ে দোলনা ঢের ভাল।

হীরেন। মীনাকে একটু ঘুরিয়ে নামিয়ে দিয়ে তার পর সুরেন মাচানে গিয়ে বসবে বোধ হয়। ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা তো সব চ'লে গেছে। এখুনি একটু আগে তালুকদার মশাইও গেলেন।

মেজ মা। তুমি যাবে না?

হীরেন। আমার শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। দেখি, এক কাপ কফি খেয়ে যদি ভাল লাগে, যাব। বাঃ, এখানে এরা বেশ জমিয়েছে তো!

খোলা জানালাটার কাছে আগাইয়া গিয়া নাচ দেখিতে লাগিল। মেজ মাও তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন

উষা। [মেজবাবুর গায়ে হাত দিয়া] মেজকা ঘুমোচ্ছ?

মেজবাবু। [চোখ খুলিয়া স্মিতহাস্য সহকারে] না।

উষা। চমৎকার দোলনা টাঙিয়েছি আমরা।

মেজবাবু আর একটু হাসিলেন। উষা হীরেনের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিতে লাগিল

কই আপনি চলুন, এখানেই যে দাঁড়িয়ে পড়লেন!

হীরেন। দাঁড়াও না, একটু দেখে নিই।

উষা। তবে আপনি থাকুন, আমি যাই।

রাগে গরগর করিতে করিতে উষা চলিয়া গেল। উষা চলিয়া গেলে একটু হাসিয়া হীরেনও তাহার অনুসরণ করিল। মেজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া চেয়ারে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। মেজ মা তাঁহার দিকে চকিতে একবার চাহিয়া আবার জানালায় দাঁড়াইয়া গোহমনার নাচ দেখিতে লাগিলেন। নাচ বাঁশী এবং মাদল উদ্দাম ছন্দে চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মেজ মা আর একবার মেজবাবুর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন। মেজবাবু ঠিক তেমনই ভাবে শুইয়া আছেন

মেজ মা। কই, হাতীতে বেড়াতে যাবে বললে যে?

মেজবাবু নীরব

ঘুমোচ্ছ নাকি?

মেজবাবু। না ঘুমোই নি।

মেজ মা। হাতীতে বেড়াতে যাবে বললে যে?

মেজবাবু। তোমার যখন ইচ্ছে নেই, তখন থাক্।

মেজ মা। বেশ তো, চল না, যাই।

মেজবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সমস্ত মুখ প্রশান্ত হাসিতে ভরিয়া গেল

মেজবাবু। এই বিশ্বম্ভর, জম্‌জমের পিঠে হাওদা দিয়ে নিয়ে আসতে বল্। সিঁড়ি আনতে বলিস, আর ঝাংরুকে বল্ তার ডাঙশটা আমাকে দিয়ে যেতে! আমিই চালাব। তুইও লাঠিটা নিয়ে সঙ্গে চল্।

বিশ্বম্ভর। যে আজ্ঞে।

সোৎসাহে উঠিয়া চলিয়া গেল

মেজবাবু। আমি জানতাম, তুমি ঠিক রাজী হবে।

আদুরে আবদেরে ছেলের অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিয়া জননী যেমন প্রসন্ন মুখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, মেজ মা ঠিক তেমনই করিয়া মেজবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

ময়না নদীর তীরে প্রস্তরাকীর্ণ একটা অংশ। ছোট বড় নানা আকারের কালো কালো পাথর ইতস্তত ছড়ানো আছে। প্রকাণ্ড চ্যাটালো চওড়া একখানা পাথর ঠিক ময়না নদীর উপরই রহিয়াছে। ময়না নদীর স্রোত ছলাৎ ছলাৎ করিয়া তাহাতে লাগিতেছে। হরিশ খুড়ো একাকী নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। নদীর বাঁকের মুখে জ্যোৎস্নাকিরণ অপূর্ব স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছে। সেই দিকেই চাহিয়া খুড়ো তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। বন্ধু তালুকদার শিকারে চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার গল্প শুনিবার লোক কেহ নাই। তাই তিনি আপন মনে একা নদীর তীরে বসিয়া কল্পনার জাল বুনিতেছেন। এমন সময় জগদেও পাঁড়েকে দেখা গেল। তাহার এক কাঁধে টোকন এবং আর এক কাঁধে চাঁপা। পাঁড়ে উচ্চৈঃস্বরে ভজন গাহিতে গাহিতে আসিতেছে

হরি দরশনকি পিয়াসী (আঁখিয়া)
দেখন চাহত কমল নয়ন
নিশরাতদিন উদাসী—(আঁখিয়া)
কেশর তিলক মোতিয়নকি মালা
বৃন্দাবনকে বাসী (আঁখিয়া)
সুর শ্যাম প্রভু আশ চরণকি
লইহো করবট কাশী (আঁখিয়া)
কেউ কা মন হায় কেউ না জানতু
লোগনকে মন হাসি (আঁখিয়া)

পাঁড়ে হরিশ খুড়োকে দেখিয়া থামিল এবং চাঁপা ও টোকনকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া নিকটবর্তী একটি পাথরে উপবেশন করিল

পাঁড়ে। খুড়াজী, এখানে এস্কারা কি হোচ্ছে ?

হরিশ। চুপচাপ ব'সে আছি ভাই।

চাঁপা। [টোকনকে জনান্তিকে] দাদু খুব ভাল গপ্পো বলতে পারে। তুই গিয়ে বল্ না, তুই বললে ঠিক বলবে, আমি বললে ধমক দেবে।

টোকন। একটা গপ্পো বল না দাদু।

চাঁপা। [আগাইয়া আসিয়া] দাদুকে বিরক্ত করছিস কেন ? দেখেছ দাদু, টোকনের স্বভাব ?

পাঁড়ে। হাঁ হাঁ, ছোড়েন একঠো মজেদার গপ্সপ্।

চাঁপা। দাদুর যদি ইচ্ছে হয়, তবে দাদু বলবে, কি বল দাদু ?

আঙুলে কাপড়ের আঁচলটা জড়াইতে জড়াইতে আড়চোখে দাদুর দিকে চাহিতে লাগিল

হরিশ। [স্মিত মুখে] গল্প ? কিসের গল্প ?

পাঁড়ে। বাঘ, ভাল, রাছস—আপনি তো কেতো জানেন, ছোড়েন কোই একঠো।

হরিশ জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীর পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন

হরিশ। আচ্ছা, শোন তবে। ভাল ক'রে ব'স সব।

সকলে হরিশ খুড়োকে ঘিরিয়া উদ্গ্রীব হইয়া বসিল

হরিশ। অনেক অনে—ক দিন আগে এক দেশে এক রাজকন্যে ছিল। রাজকন্যে তো রাজকন্যে! কি তার রূপ! টুকটুকে রঙ, কুচকুচ কালো একমাথা চুল, ছোট ছোট সাদা মুক্তোর মত দাঁত, পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা টানা চোখ—

চাঁপা। কি নাম ছিল তার ?

হরিশ। তবেই তো বিপদে ফেললে দিদি, নাম তো ঠিক মনে নেই।

টোকন। নাম নিয়ে কি হবে, রাজকন্যে নামই তো বেশ নাম।

চাঁপা। [হাসিয়া উঠিল] রাজকন্যে বুঝি আবার নাম হয় কারও! কিচ্ছু বুদ্ধি নেই টোকনটার, দেখছেন দাদু ?

হরিশ। তা তো দেখছি, নাম তার ছিলও একটা, দাঁড়াও ভাবি ; [ভাবিয়া] মনে পড়েছে, নাম ছিল তার চম্পাবতী।

টোকন। তারপর ?

হরিশ। তারপর—দাঁড়াও, বিড়িটা ধরাই আগে।

বিড়ি ধরাইলেন

পাঁড়ে। দিন হামাকে ভি একঠো।

হরিশ খুড়ো জগদেওকে একটা বিড়ি দিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরাইয়া দিলেন

চাঁপা। তারপর ?

হরিশ। তারপর একদিন হ'ল এক কাণ্ড।

টোকন। কি ?

হরিশ। রাজকন্যে চম্পাবতী ভোরবেলা উঠে নিজের বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, আর ঠিক সেই সময় পুব দিক রাঙা ক'রে সূর্যদেব উঠছেন। দুজনে চোখাচোখি হয়ে গেল। সূর্যদেব অবাক হয়ে গেলেন। তিনি

ভাবলেন, কি আশ্চর্য, মানুষেরও এমন রূপ হয়, এমন দুধে-আলতায় গোলা রঙ, এমন টুকটুকে, এমন ফুটফুটে—চমৎকার তো! ভাব করতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন ডিউটির সময়, আকাশ থেকে নেবে আসা মুশকিল।

হরিশ খুড়ো খুব চিন্তিত মুখে বিড়িতে টান দিলেন

টোকন। সূর্যদেব আকাশ থেকে নাববে কি ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে?

চাঁপা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

চাঁপা। টোকনটার বুদ্ধি দেখেছেন দাদু, আকাশ থেকে নাবতে দেবতাদের বুঝি সিঁড়ির দরকার হয়!

টোকন। না হ'লে নাববে কি ক'রে?

পাঁড়ে। দেওতারা সোব কিছু পারে ভাই।

টোকন। তারপর?

হরিশ। তারপর সেদিন সমস্ত দিন তো কেটে গেল, সূর্যদেব আকাশ থেকে নাবতে পারলেন না। কিন্তু মনটি প'ড়ে রইল তার পৃথিবীর দিকে। রাত্তিরে করলেন এক মজার কাণ্ড।

চাঁপা। কি?

হরিশ বিড়িতে আবার একটি টান দিলেন

হরিশ। রাত্তিরে রাজকন্যে চম্পাবতী দুধের মত সাদা ধবধবে বিছানাটিতে শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে ছিল। সেদিন ঠিক এই আজকের মত জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় দশ দিক ভেসে যাচ্ছে। বাগানের প্রকাণ্ড পুকুরটায় অসংখ্য কুমুদফুল ফুটেছে, জানলার নীচে জুঁইফুলের ঝাড়টায় ফুলের সে কি ভিড়। হঠাৎ চম্পাবতীর মনে হ'ল, ভয়ানক গরম লাগছে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় এত গরম কেন? ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল চম্পাবতী।

টোকন। [রুদ্ধশ্বাসে] কেন?

চাঁপা। আঃ, চুপ কর্ না তুই।

পাঁড়ে। হাল্লা মৎ মাচাও ভাই, শুনো না!

হরিশ খুড়ো চিন্তিত মুখে বিড়িতে টান দিলেন

হরিশ। ঘরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল চম্পাবতী। পশ্চিম দিকের জানলাটায় টাঙানো ছিল নীল রেশমের একটা পর্দা, আর ঠিক সেইখানটাতেই জ্বলছিল সোনার পিলসুজে স্ফটিকের একটা প্রদীপ।

চম্পাবতী দেখলে, প্রদীপের লম্বা শিখাটা হয়ে গেছে পয়সার মত গোল, আর তার থেকে বেরুচ্ছে টকটকে লাল জ্যোতি—ঠিক যেন নীল পর্দাটার গায়ে ছোট্ট একটা সূর্য উঠেছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল চম্পাবতী।

চাঁপা। তারপর?

হরিশ। তারপর সূর্যদেব কথা কইলেন। বললেন, ভয় পেও না রাজকন্যে চম্পাবতী, আমি আকাশের সূর্য, তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি। চম্পাবতী বললে, তুমি সূর্য! তা হ'লে অতটুক কেন? সূর্য তো অনেক বড়। সূর্য বললে—

ছোট্ট তুমি চম্পাবতী রাজকন্যে লো
ছোট্ট হয়ে তাই এসেছি তোর জন্যে লো।

এস, দুজনে ভাব করি। আমিও টুকটুকে, তুমিও টুকটুকে। চম্পাবতী বললে, তোমার সঙ্গে ভাব করব না। সূর্য বললে, কেন? চম্পাবতী বললে, তুমি এলেই জ্যোৎস্না চ'লে যায়, জ্যোৎস্না আমার ভারি ভাল লাগে। এখন কেমন বাইরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। তুমি এলেই তো সব ফুরিয়ে যাবে। তুমি এস না, এখন তুমি যাও!

টোকন। রাজকন্যেটা তো ভারি দুষ্টু!

চাঁপা। বাঃ রে, দুষ্টু কেন হতে যাবে? ওর যদি ওর সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে না হয়, জোর ক'রে ভাব করতে হবে তবু? কি বলেন দাদু?

পাঁড়ে। আরে শুনো না ভাই চুপসে সব। খালি কলর বলর কলর বলর!

হরিশ। সূর্যও বললে, ও-কথা বলতে নেই রাজকন্যে চম্পাবতী, অতিথিকে অমন ক'রে তাড়িয়ে দিতে আছে! ছি! চম্পাবতী একটু ভাবলে, তার পর বললে, বেশ, তা হ'লে আমাদের অতিথিশালায় চল তুমি, অতিথিরা সেইখানে থাকেন। সূর্য বললে, তোমার পুতুলরা যেখানে আছে, সেইখানে নিয়ে চল না আমায়। চম্পাবতী বললে, তা হ'লেই হয়েছে, তুমি গেলেই তো সব উঠে পড়বে, যা কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি ওদের। সূর্য তখন বললে, বেশ, তা হ'লে অন্য কোন নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে চল আমাকে। তোমাদের অতিথিশালায় যাব না, সেখানে কত দেশের রাজা-রাজড়া অতিথি রয়েছেন, হোমরা-চোমরা লোক দেখলে বড্ড ভয় করে আমার।

টোকন। তারপর?

হরিশ বিড়িতে একটা টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন

হরিশ। তারপর চম্পাবতীর মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। বললে, বেশ, খুব নিরিবিলি জায়গাতেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, চল। এই না ব'লে রাজকন্যে চম্পাবতী স্ফটিকের প্রদীপটি তুলে নিয়ে নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলের আড়ালে ঢেকে এক চোর-কুঠরিতে গিয়ে ঢুকল। চোর-কুঠরির কোণে প্রদীপটি রেখে বললে, তুমি এইখানে থাক, আমি আসছি এক্ষুনি। এই ব'লে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে শেকল তুলে চোর-কুঠরিটি বন্ধ ক'রে দিলে। সূর্যদেব হয়ে রইলেন বন্দী।

চাঁপা। তারপর?

হরিশ। রাত আর পোয়ায় না। রাজকন্যে চম্পাবতী তার ধপধপে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

টোকন। তারপর?

হরিশ। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

পাঁড়ে। উস্‌কা বাদ কি হোলো?

হরিশ। তারপরও ওই—মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না। ওই যে, দেখ না!

হরিশ খুড়ো আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন—দূরে ময়না নদীর বুকে জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে

চাঁপা। রাজকন্যে চম্পাবতী কই?

হরিশ। চোখ বুজে ফেল, তা হ'লেই দেখতে পাবে।

হরিশ খুড়ো চোখ বুজিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

রাজকন্যে চম্পাবতী তার ধপধপে বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

টোকন, চাঁপা, জগদেও তিনজনেই চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল

পঞ্চম দৃশ্য

ছোটবাবুর তাঁবু। এ তাঁবুটিও অন্য তাঁবুগুলির মত। গোহমনাদের নাচের আসর এ তাঁবুটির আরও কাছে। এখন নাচ-গান থামাইয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছে। মৃদু কলরব ছাড়া আর কিছু শোনা যাইতেছে না। সমস্ত জানালাগুলি, এমন কি তাঁবুর দ্বার পর্যন্ত বন্ধ বলিয়া বাহিরের কিছু দেখাও যাইতেছে না। এ তাঁবুতেও আসবাবপত্র অন্য তাঁবুগুলির মত—প্রচুর নয়, তবে প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলি আছে। টেবিলের উপর বাতিটা জ্বলিতেছে, বেশ একটু জোরেই জ্বলিতেছে। তরঙ্গিণী একটা টিনের চেয়ারের উপর পা দুইটি তুলিয়া একটা ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখে মুখে চাপা হাসি। ছোটবাবু মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছেন। বলা বাহুল্য, ঘরে আর কেহ নাই

তরঙ্গিণী। পায়ে হাত দিচ্ছ, পাপ হবে আমার কিন্তু!

ছোটবাবু। হোকগে, কিছু কিছু পাপ হওয়া ভাল।

তরঙ্গিণী। কেন?

ছোটবাবু। আমি তো নির্ঘাত নরকে যাব জানি। নরকে গিয়ে মহা ফাঁপরে প'ড়ে যাব, তোমাকে যদি না পাই সেখানে। গোড়ালিটা তোল।

তরঙ্গিণী গোড়ালি তুলিলেন

তোমার নীলাম্বরী শাড়িখানা এনেছ তো?

তরঙ্গিণী। এনেছি। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি?

ছোটবাবু। আজ নিজের হাতে তোমাকে সাজাব।

তরঙ্গিণী। তার পর?

ছোটবাবু। দেখব।

তরঙ্গিণী। তার পর।

মুখ টিপিয়া হাসিলেন, গালে টোল পড়িল

ছোটবাবু। [তাঁহার দিকে এক নজর চাহিয়া] তারপর কি করব আর ভাবতে পারছি না। গোড়ালিটা তোল না ভাল ক'রে।

তরঙ্গিণী। আর কত তুলব! এই তো তুলেছি!

গোড়ালিটা আর একটু তুলিলেন, ছোটবাবু ঘাড়টা আরও নীচু করিয়া গোড়ালিতে আলতা পরাইয়া দিতে লাগিলেন

ছোটবাবু। এর পর কি করব, সত্যিই সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

তরঙ্গিণী। চল না, বেড়াইগে দুজনে।

ছোটবাবু। পায়ে হেঁটে?

তরঙ্গিণী। সবাই তো বেড়াচ্ছে।

ছোটবাবু। তুমি কি আর সবাইয়ের মত ?

তরঙ্গিণী। আহা !

ছোটবাবু। বেড়াতে হ'লে ঘোড়া নিয়ে বেরোতে হয়। ধু-ধু মাঠে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে পাশাপাশি ছুজনে ছুটো ঘোড়ায় উধ্বর্শ্বাসে ছুটে চলেছি—

তরঙ্গিণী। ঘোড়ায় চড়তে যে জানি না।

ছোটবাবু। তবে আর বেড়াবার শখ কেন ? পায়ে হেঁটে হোঁচট খেতে খেতে বেড়ানোর কোন মানে হয় এমন রাতে ? এমন রাতে বেড়াতে হ'লে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে হয়। কানের পাশ দিয়ে হু-হু ক'রে হাওয়া ব'য়ে যাবে—

তরঙ্গিণী হঠাৎ পা তুইটা গুটাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন

ও কি ?

তরঙ্গিণী। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

ছোটবাবু। কি ?

তরঙ্গিণী। বাদল ডাক্তারের মটর-বাইকটা নিয়ে চল যাই। ওর তো সাইড-কারও আছে।

ছোটবাবু। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কিন্তু ওর যা ফটফট আওয়াজ, গাঁ শুদ্ধু লোকে জেনে যাবে—ছোটবাবু ছোট বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে !

তরঙ্গিণী। জানলেই বা।

ছোটবাবু। তোমার মত স্ত্রীকে নিয়ে ঢাক পিটিয়ে রাস্তায় বেরুনোটা উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রশংসা করারই সামিল তো ! সেটা ভদ্রতায় বাধে।

তরঙ্গিণী। তা হ'লে আর একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

ছোটবাবু। কি ?

তরঙ্গিণী। ব্যাটাছেলের পোশাক প'রে নিলে কি হয়—ধুতি পাঞ্জাবি আর মাথায় পাগড়ি ? কেউ চিনতে পারবে না।

ছোটবাবু। বাঃ, চমৎকার হয় তা হ'লে। তাই চল, যাওয়া যাক। আমার পাঞ্জাবি কি তোমার গায়ে হবে ?

তরঙ্গিণী। পাঞ্জাবি একটু ঢিলে হ'লে কিছু আসে-যায় না। তা ছাড়া একটু ঢিলেও দরকার।

মুচকি হাসিলেন, গালে টোল পড়িল

ছোটবাবু। কই, বার কর তো দেখি একটা পাঞ্জাবি।

তরঙ্গিণী। ওমা, আমাদের সুটকেসটা আবার মায়ের তাঁবুতে দিয়ে দিয়েছে

ভুল ক'রে। আনতে বলব বলব ক'রে ভুলে গেলাম। তুমি তো কালীর মা ভিকু সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলে, এখন আনে কে গিয়ে ?

ছোটবাবু। আমি না হয় নিয়ে আসি।

তরঙ্গিণী। আহা!

মুচকি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তরঙ্গিণী চলিয়া গেলে ছোটবাবু তাঁবুর দরজাটা ফাঁক করিয়া বাদল ডাক্তারকে ডাকিলেন। পাশেই তাঁহার তাঁবু

ছোটবাবু। ওহে ডাক্তার!

নেপথ্যে বাদল। কি বলছেন ?

ছোটবাবু। তোমার মটর-বাইকটা নিয়ে একবার বেরুতে চাই।

নেপথ্যে বাদল। স্বচ্ছন্দে।

ছোটবাবু। তেল আছে তো ?

নেপথ্যে বাদল। প্রচুর।

ছোটবাবু। কি করছ ? মনে হচ্ছে যেন—

নেপথ্যে বাদল। হ্যাঁ, লিখছি।

ছোটবাবু। সেম থীম ?

নেপথ্যে বাদল। হ্যাঁ, মিক্স্ড উইথ মুন-লাইট।

ছোটবাবু। মুন-লাইট না মুন-শাইন ?

নেপথ্যে বাদল। দুইই।

ছোটবাবু। সাবাস! লেখ লেখ, বিরক্ত করব না তা হ'লে। এ কি, ঠানদি-যে! আসুন আসুন।

ঠানদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পরনে চওড়া লাল আঁশ-পেড়ে একখানি ঢাকাই

ঠানদি। তোমার ঠাকুরদা এখানে এসেছিলেন ?

ছোটবাবু। কই, না।

ঠানদি। কোথায় গেলেন তা হ'লে।

ছোটবাবু। এ সময় আপনাকে ছেড়ে যাওয়া তো অন্যায়।

ঠানদি। দেখ তো ভাই।

ছোটবাবু। কতক্ষণ ধ'রে পাচ্ছেন না ?

ঠানদি। অনেকক্ষণ থেকে।

ছোটবাবু। তা হ'লে তো চিন্তার কথা। কলমিপুরের মাঠে ময়না নদীর ধারে-ধারে পরীরা নাবে শুনেছি। কেউ উড়িয়ে-টুড়িয়ে নিয়ে গেল না তো!

ঠানদি। শুধু পরী নয়, কিন্নরও নাবে শুনেছি। তোমার পরীটি গেলেন কোথা, দেখতে পাচ্ছি না যে?

ছোটবাবু। মায়ের তাঁবুতে গেছে।

ঠানদি। দেখো, উড়ে না যায়, তোমাদেরই ভয় বেশী। আমাদের বুড়ো-হাবড়াকে কে আর পছন্দ করবে বল? এখানে আসেন নি তা হ'লে?

ছোটবাবু। না।

ঠানদি চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ফিরিলেন

ঠানদি। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল, আমাদের তিনু চাটুজ্জে একটু আগে এসে ধরেছিল আমাকে, তার খাজনা নাকি সুদে আসলে দাঁড়িয়েছে অনেক, তোমাকে ব'লে-ক'য়ে মাপ করিয়ে দিতে হবে।

ছোটবাবু। আপনি যদি হুকুম করেন, আমার সাধ্য আছে অমান্য করি?

ঠানদি। [হাসিয়া] হুকুম করব কেন ভাই, তোমাদের জমিদারিব্যাপারে আমাদের কথা কইতে যাওয়াই অন্যায়। তবে তিনু চাটুজ্জে ছাপোষা মানুষ, প্রথম পক্ষেরই চারিটি মেয়ে, পাঁচটি ছেলে, তার উপর দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, আবার বিয়ে ক'রে মরেছে, এ বউটারও নাকি ছেলে হবে আসছে মাসে।

ছোটবাবু। তা হ'লে তো করিতকর্মা লোক।

ঠানদি। তোমরা সবাই এক জাতের, দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে।

ছোটবাবু। আপনার মুখে এ কথা সাজে না ঠানদি। ঠাকুরদার তো আপনিই ধ্যান-জ্ঞান।

ঠানদি। সব জানি গো, সব জানি। এখন তিনুকে কি বলব, বল?

ছোটবাবু। আপনি যখন ওর পক্ষ অবলম্বন করেছেন, তখন মাপ করতেই হবে। ব'লে দোব আমি চৌধুরীকে।

ঠানদি। আহা, বড় উপকার হয তা হ'লে ব্রাহ্মণের। এবার তা হ'লে যাই ভাই, দেখি, আমার কিন্নরটি কার পাল্লায় গিয়ে পড়লেন!

ঠানদি চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর একটি জানলার পর্দা একটু সরিয়া গেল এবং তাহার ফাঁক দিয়া ঠাকুরদা সন্তর্পণে বাহির হইতে মুণ্ড বাড়াইলেন

ছোটবাবু। [সবিস্ময়ে] এ কি, ঠাকুরদা যে।

ঠাকুরদা। [চুপি চুপি] তোমার ঠানদির গলার আওয়াজ পেলাম ব'লে মনে হ'ল!

ছোটবাবু। হ্যাঁ, তিনি আপনাকেই তো খুঁজছেন। ওখানে কি করছেন আপনি?

ঠাকুরদা। তোমার তাঁবুর আড়ালে আত্মগোপন ক'রে একটু নাচ দেখছি। ফাঁস ক'রে দিও না যেন। তোমাদের গোপন পরামর্শটিও শুনে ফেলেছি।

হাসিলেন

ছোটবাবু। ফাঁস ক'রে দিও না যেন।

ঠাকুরদা। পাগল! ওই, আবার কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি!

ঠাকুরদা মুণ্ড টানিয়া লইলেন। পাঞ্জাবি প্রভৃতি লইয়া তরঙ্গিণী প্রবেশ করিলেন

তরঙ্গিণী। ভারি একটা মজার জিনিস দেখে এলাম।

ছোটবাবু। [চুপি চুপি] যা বলবে, আস্তে বল। ঠিক পাশেই ঠাকুরদা আড়ি পেতে ব'সে আছেন।

তরঙ্গিণী। [নিম্নকণ্ঠে] তাই নাকি? গিয়ে দেখি, জিতুর মা অঘোরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মা তাঁবুর জানলাটি খুলে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রয়েছেন আর মালা ঘোরাচ্ছেন। আমি গিয়ে সুটকেস খুলে এই সব বার করলাম, টেরও পেলেন না। পা টিপে টিপে কাছে গেলাম, কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না, একেবারে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন জ্যোৎস্নার দিকে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, যে মালাটা ঘোরাচ্ছেন, সেটা হরিনামের মালা নয়, একটা শুকনো ফুলের মালা।

ছোটবাবু। সে কি?

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ, টোকন আসবার সময় যে মালাটা প'রে এসেছিল সকাল-বেলায়, সেইটে বোধ হয় মায়ের তাঁবুতে ফেলে এসেছে। মা হরিনামের মালার বদলে সেইটে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন ব'সে ব'সে।

বাহিরে গোহমূনা গান গাহিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী এবং মাদলও শুরু হইয়া গেল

ছোটবাবু। এস, ওগুলো পরিয়ে দিই তোমায়।

তরঙ্গিণী। থাম, আগে একটু দেখি।

ছোটবাবু। ও-জানলাটা খুলো না, ঠিক ওর তলাতেই ঠাকুরদা ব'সে আছেন।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরঙ্গিণী আর একটি জানালার পর্দা একটু ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিলেন

তরঙ্গিণী। কোমরে হাত দিয়ে গা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচের কি বাহার মেয়ের— দেখ দেখ!

ছোটবাবুও উঠিয়া আসিয়া ফাঁক দিয়া উঁকি দিলেন

আ ম'ল, বিরিঞ্চিটাও এসে ওখানে বসেছে দেখছি যে! মুখ ফুলে তো ঢোল হয়েছে। ওমা, দেখ দেখ, গোহমূনা নাচতে নাচতে ওর থুতনিতে

হাত দিয়ে দিয়ে আদর করছে ! আচ্ছা, কি বেহায়া বাপু মেয়েটা !

ছোটবাবু। ওসব থাক্ এখন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। চল, তোমাকে ওগুলো আগে পরিয়ে দিই।

তরঙ্গিণী। ইস, তোমাকে পরাতে দোব বই কি, আমি নিজে পরব।

পর্দা সরাইয়া পাশের কক্ষে চলিয়া গেলেন। ছোটবাবু মুচকি হাসিয়া ক্যাম্প-চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন। বাহিরে বাঁশী ও মাদল খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গোহমনার গান স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল—

একা নাহি যাব যমুনায় লো—
যাইতে যমুনা-জলে
শ্রীরাধা সখীরে বলে
কদমতলায়
কালিয়া দাঁড়ায় লো,
একা নাহি যাব যমুনায় লো।

বাদল ডাক্তার। [নেপথ্য হইতে] আসতে পারি ?

ছোটবাবু। এস, এস।

পর্দা ঠেলিয়া বাদল ডাক্তার প্রবেশ করিলেন। গায়ে ধপধপে ফরসা একটি গেঞ্জি, বাঁ হাতের কব্জিতে একটি সাদা রুমাল বাঁধা, কাপড় ঢিলা ধরনে মালকোঁচা মারিয়া পরা। সর্বদাই বাইকে চড়িতে হয় বলিয়া এই ভাবে তিনি কাপড় পরিয়া থাকেন। পায়ে কাবুলী স্যাণ্ডাল। ভারী মুখখানাতে বুদ্ধিদীপ্ত স্মিত হাসি

বাদল। আপনি কি একাই বেরুবেন ?

ছোটবাবু। না, ঠিক একা নয়।

বাদল। আর কে ?

ছোটবাবু। আমার একটি গুজরাটী বন্ধু এসে হাজির হয়েছে কলকাতা থেকে। হিরণপুরে এসে আমাকে না পেয়ে একটা বাইক ক'রে এইখানেই এসে পড়েছে। তাকে নিয়েই ঘুরব একটু।

বাদল। ও।

ছোটবাবু। কবিতা লেখা হয়ে গেল ?

বাদল। [সহাস্যে] একটা সনেট হ'ল।

ছোটবাবু। সেই একই ধরনের ইংরেজী-বাংলা মেশানো ?

বাদল। হ্যাঁ।

ছোটবাবু। কই, দেখি।

বাদল। শুনবেন ?

ছোটবাবু। নিশ্চয়ই।

বাদল। নিয়ে আসি তা হ'লে।

বাদল ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পাশের ঘর হইতে পর্দা সরাইয়া তরঙ্গিণী উঁকি দিলেন। চোখ-মুখ হইতে হাসি যেন উপচাইয়া পড়িতেছে

তরঙ্গিণী। গুজরাটী বন্ধু !

ছোটবাবু। তা ছাড়া আর উপায় কি ?

তরঙ্গিণী। আমি বুঝি গুজরাটীর মত দেখতে ?

ছোটবাবু। চুপ চুপ, ডাক্তার আসছে।

তরঙ্গিণী পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। বাদল ডাক্তার কবিতা লইয়া প্রবেশ করিলেন

বাদল। মহা মুশকিলে পড়া গেছে !

ছোটবাবু। কি ?

বাদল। লাহিড়ীটা শ্যাম্পেন খেয়ে আমার বিছানায় এসে চিত হয়ে পড়েছে।

ছোটবাবু। থাক্ না, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি এসে আমার তাঁবুটায় থাক ততক্ষণ।

বাদল। আপনার স্ত্রী ?

ছোটবাবু। তার শরীরটা খারাপ হয়েছে, তাকে মায়ের তাঁবুতে চালান ক'রে দিয়েছি।

বাদল। কি হ'ল তাঁর ?

ছোটবাবু। পেট ব্যথা করছে।

বাদল। তাই নাকি ? ওষুধ দোব নাকি এক ডোজ ? আমার ব্যাগে ওষুধ আছে।

ছোটবাবু। থাক্, তার দরকার নেই। কবিতাটা পড় শুনি।

বাদল ডাক্তার কাবুলী স্যাণ্ডেল সুদ্ধ বলিষ্ঠ একখানা পা টিনের চেয়ারের উপর রাখিয়া টেবিলে ভর দিয়া বসিলেন এবং একটু গলা-খাঁকারি দিয়া পড়িতে শুরু করিলেন

নির্জন প্রান্তরে বসি তব রূপ হেরি নির্নিমেষে,
কল্পনার কারাগারে করিয়াছি তোমারে বন্দিনী,
অলীক আলেয়া তুমি ? মরীচিকা সম নাকি—they say,
যুগে যুগে মানবেরে ভুলায়েছ হে ইভা-নন্দিনী ?

Granted—কিন্তু তুমি বন্দী মম মস্তিষ্কের খোপে,
যখন যতটা খুশী নেহারিব তোমার মাধুরী,
অনুভব করি যথা প্রতিদিন মোর Stethoscope-এ
পঞ্জর-পিঞ্জরে বন্দী হৃদয়ের চাপল্য চাতুরী।

হে বন্দিনী, তোল মুখ, খোল আঁখি, কথা বল বল,
ক্ষমা কর হই যদি অনিবার্য, ক্ষিপ্ত নিরঙ্কুশ ;
সুনীল আকাশ-পাত্রে জ্যোৎস্না-বিষ করে টলমল,
তাহারই প্রভাবে সখি, হয়তো হয়েছি কিছু loose !

কিন্তু হায়, ক্ষোভ শুধু, যেই জ্যোৎস্না বিষবৎ to me,
হয়তো সে জ্যোৎস্নালোকে অতীব আনন্দে আছ তুমি।

বাদল ডাক্তার চুপ করিলেন। ছোটবাবুও কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নীরব রহিলেন। বাহিরে বাজিতে লাগিল—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম, ঝমর ঝম

ছোটবাবু। চমৎকার হয়েছে !

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

বাদল। আমি তা হ'লে বাইকটা ঠিক করি গিয়ে ?

ছোটবাবু। হ্যাঁ।

বাদল ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পর্দা সরাইয়া তরঙ্গিণী বাহির হইয়া আসিলেন। পাঞ্জাবি পরিয়াছেন, পাগড়িটা অর্ধেক বাঁধা হইয়াছে, বাকি অর্ধেকটা কাঁধ হইতে ঝুলিতেছে। কাপড়টাও ঠিকমত পরা হয় নাই

তরঙ্গিণী। ঠিক হচ্ছে না আমার, কাছা কোঁচা ঠিক করতে পারছি না।

ছোটবাবু। [হাসিয়া] বললাম, তুমি পারবে না। চল, ঠিক ক'রে দিই।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন। অস্ফুটভাবে শোনা গেল, তরঙ্গিণী বলিতেছেন—আঃ, আঃ, ও কি হচ্ছে ! বাহিরে গোহম্‌নার নৃত্য উদ্দাম হইতে উদ্দামতর হইয়া উঠিল

ষষ্ঠ দৃশ্য

ময়না নদীর ওপারে জঙ্গলের একটি অংশ। সারি সারি তিনটি মাচা দেখা যাইতেছে, দুইটি খালি। তৃতীয়টিতে তালুকদার ও রোগা নিতাই বন্দুক হস্তে বসিয়া আছে। তালুকদার ঢুলিতেছে। অদূরে একটি প্রকাণ্ড শিমুলগাছের উপর বলিষ্ঠ হরু মণ্ডল বর্শা হস্তে বসিয়া আছে। ভোর হইতেছে। দূরে বনানী-শীর্ষে চন্দ্র অস্তোন্মুখ। চন্দ্রের কিরণ হরু মণ্ডলের, বর্শাফলকে পড়িয়া চকচক করিতেছে

নিতাই। [তালুকদারকে ঠেলা দিয়া] ক্রমাগত ঢুলছ যে হে!

তালুকদার। [হাসিয়া] কি আর করি!

নিতাই। জামাইবাবু, হীরেনবাবু কেউ তো এল না হে!

তালুকদার। [হাই তুলিয়া] বাঘও তো এল না!

নিতাই। আশ্চর্য! অথচ মাঝরাত্রে বাঘের ডাকও শোনা গেল। শোন নি তুমি?

তালুকদার। শুনেছি বইকি।

নিতাই। অথচ এল না কেন বল তো?

তালুকদার। কি জানি!

নিতাই। এদিকে ফরসাও তো হয়ে এল, শুকতারা উঠছে। সারারাত মশার কামড় ভোগ করাই সার হ'ল আমাদের।

তালুকদার। আমি কিন্তু ঢুলতে ঢুলতে বেশ মজার একটা স্বপ্ন দেখলাম। আচ্ছা, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়—বলে না লোকে?

নিতাই। স্বপ্নটাই কি, শুনি না!

তালুকদার। স্বপ্ন দেখলাম, ছিপছিপে গড়নের একটা বাঘ ঠিক আমার মাচার সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেই বন্দুক তুলে গুলি করতে যাব, অমনই সে ফিক ক'রে হেসে বললে, চোখের মাথা খেয়েছ তুমি, দেখতে পাচ্ছ না, আমি যে লছমনিয়া। এ স্বপ্নের মানে কি ভাই?

নিতাই। [সবিস্ময়ে] নেশা-ভাঙ করেছ নাকি কিছু?

তালুকদার। আরে না না, নেশা-ভাঙ করতে যাব কেন?

নিতাই। [নীচের দিকে চাহিয়া] বিলটাও নেমে আসছে দেখছি।

বন্দুক ঘাড়ে বিলটা আসিয়া প্রবেশ করিল

তালুকদার। কি হে, তুমি নেবে এল যে?

বিলটা। [সহাস্য মুখে] আপনারাও নাবুন।

তালুকদার। কেন?

বিলটা। আজ বাঘ আর আসবে না।

নিতাই। কি ক'রে জানলে তুমি ?

বিলটা। বাঘিনী এসেছে যে একটা। বাঘ আর বাঘিনীটা চর পেরিয়ে চ'লে গেল দেখলাম হু-ই দিক পানে।

নিতাই। সে কি ?

বিলটা। আজ্ঞে হ্যাঁ। দেবদারুগাছের মগডালে ব'সে সব দেখেছি আমি। প্রথমে এল বাঘটা, নদীর চরের ওপর বসল, এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখল খানিক, তারপর দিলে এক হাঁকাড়। শোনেন নি আপনারা ?

তালুকদার। শুনেছি বইকি। তারপর ?

বিলটা। তারপর এল বাঘিনীটা। ইয়া লম্বা-চওড়া ঢুলঢুলে এক বাঘিনী ! সেও এসে বসল বাঘটার কাছে, ব'সে তার গা চটতে লাগল। বাঘটা ঘোরাতে লাগল তার ল্যাজটা পাক দিয়ে দিয়ে—সে এক কাণ্ড !

নিতাই। তারপর ?

বিলটা। তারপর দুজনে খানিক চাটাচাটি ক'রে উঠে পড়ল, চাঁদের আলোয় হেলতে দুলতে চ'লে গেল চর পেরিয়ে। নিজের চক্ষে দেখলাম।

তালুকদার। সত্যি ?

বিলটা। সত্যি নয় তো কি মিছে বলছি আমি ?

নিতাই। [সক্ষোভে] বাঘটা দেখলে তুমি, অথচ গুলি করলে না ?

বিলটা। কি বিপদ ! আমার রেঞ্জের মধ্যে থাকলে কি আমি ছেড়ে দিই ? তারা ছিল হু-ই চরের মাঝে, আমার নাগালের বাইরে।

নিতাই ! আশ্চর্য কাণ্ড !

অস্তোন্মুখ চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবিচলিত হরু মণ্ডল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল

॥ যবনিকা ॥